كتاب العلم

কিতাবুল ইলম

মুহাম্মদ ইবনে ছলীহ আল উসাইমীন

كتاب العلم

কিতাবুল ‘ইল্‌ম (জ্ঞান)

المؤلف: محمد بن صالح العثيمين

মূল: মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল-উছাইমীন (রহিমাহুল্লাহ)

ترجمة: عبد الرزاق بن عبد الرشيد، مظفر بن مقسط

অনুবাদক: আব্দুর রায্‌যাক্ব বিন আব্দুর রশীদ ও মোজাফফার বিন মুকসেদ

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় কিতাব, ফাতাওয়া এবং আনুষঙ্গিক বিষয়

পঞ্চম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে তিনটি বার্তা রয়েছে

প্রথম অধ্যায়

‘ইল্‌ম -এর পরিচয়, তার ফযীলত (মর্যাদা) ও তা অর্জনের বিধান প্রসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ: ‘ইল্‌ম (জ্ঞান) -এর পরিচয়

‘ইল্‌ম (জ্ঞান) -এর পরিচয়: শাব্দিক অর্থ: ‘ইল্‌ম (জ্ঞান) হচ্ছে জাহ্‌ল (অজ্ঞতা) এর বিপরীত। আর ‘ইল্‌ম এর অর্থ হলো: “কোন কিছুকে তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে জানতে পারা”। পারিভাষিক সংজ্ঞা: কিছু বিদ্বান বলেছেন, ‘ইল্‌ম হলো (কোন কিছুর) প্রকৃত অবস্থা জানা। আর এটি অজানা ও অজ্ঞতার বিপরীত”। অন্যান্য আলিম বলেছেন, “নিশ্চয় ‘ইল্‌ম (কোন কিছুর) প্রকৃত অবস্থা জানার চেয়েও অধিকতর সুস্পষ্ট”। আর এখানে ‘ইল্‌ম (জ্ঞান) দ্বারা আমাদের যেটি উদ্দেশ্য সেটি হলো ‘ইল্‌মে শারঈ (ইসলামী জ্ঞান)। আর ‘ইল্‌মে শারঈ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: “আল্লাহ তা‘আলা তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যেসব সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোর ‘ইল্‌ম (জ্ঞান)।”

সুতরাং যে ‘ইল্‌মের মাঝে গুণকীর্তন ও প্রশংসা রয়েছে, সেটিই (অহীর জ্ঞান) এবং শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ‘ইল্‌ম (জ্ঞান)। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

“আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দীনের সঠিক ‘ইল্‌ম (জ্ঞান) দান করেন”।[১]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا – إِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ – فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

“নিশ্চয় নাবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) কাউকে দিনার ও দিরহামের (দুনিয়াবী কোন জিনিসের) উত্তরাধিকারী বানাননি। প্রকৃতপক্ষে, তারা (মানুষকে) ‘ইল্‌ম (জ্ঞান) এর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি ‘ইল্‌ম অর্জন করে, তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই নাবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) এর উত্তরাধিকার থেকে পূর্ণ অংশ অর্জন করতে পারবে”।[২]

---

[১] মুত্তাফাকুন আলাইহি: বুখারী হা/৭১, মুসলিম, হা/১৩৩৭।
[২] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২৬৮২, আবূ দাঊদ হা/৩৬৪১, ইবনু মাজাহ, হা/২২৩।

আর এটি জানা বিষয় যে, নাবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) (মানুষকে) যে ‘ইল্‌মের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহর শরী‘আত (বিধান) সংক্রান্ত ‘ইল্‌ম। সেটা অন্য কোন ‘ইল্‌ম না। নাবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) মানুষকে কারিগরিবিদ্যা, শিল্পকর্মবিদ্যা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ্যার উত্তরাধিকারী বানাননি।

তবে যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করলেন, তখন তিনি কিছু মানুষকে খেজুর গাছে পরাগায়ন করতে দেখলেন। (আর) যখন তিনি তাদেরকে পরাগায়ন করতে দেখলেন, তখন তিনি একটি কথা বললেন অর্থাৎ (তিনি বললেন যে) এটি (পরাগায়ন) করার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর তারা কথাটি মেনে নিল এবং পরাগায়ন করা ছেড়ে দিল। কিন্তু গাছের খেজুর নষ্ট হয়ে গেল। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“তোমাদের দুনিয়াবী বিষয়ে তোমরাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী”।[৩]

আর যদি এটি (পরাগায়ন করার ‘ইল্‌মটি) ঐ ‘ইল্‌ম হতো, যার মাঝে প্রশংসা রয়েছে, তাহলে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে অবশ্যই সর্বাধিক জ্ঞানী হতেন। কেননা ‘ইল্‌ম ও আমলের কারণে যার সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করা হয়, তিনি হলেন নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতএব, ‘ইল্‌মে শার‘ঈ (ইসলামী জ্ঞান) সেটিই, যেটির মাঝে প্রশংসা রয়েছে। আর প্রশংসাটি ইল্‌মে শার‘ঈ অন্বেষণকারীর জন্যই নির্দিষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য ‘ইল্‌মগুলোর উপকারিতা অস্বীকার করছি না। যদি অন্যান্য ‘ইল্‌মগুলো আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে ও আল্লাহর দীনকে সমর্থনের ব্যাপারে সহযোগিতা করে এবং যদি ঐসকল ‘ইল্‌মের দ্বারা আল্লাহর বান্দারা উপকৃত হয়; তাহলে ঐসকল ‘ইল্‌ম উত্তম ও কল্যাণকর হবে। আর কিছু এলাকায় কখনো কখনো ঐগুলো শিক্ষা করা ওয়াজিব (আবশ্যক) হয়ে যায়; যখন ঐসকল ‘ইল্‌ম (জ্ঞান) আল্লাহ তা‘আলার এ বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়,

﴿وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾

[৩] ছ্বহীহ মুসলিম; হা/২৩৬৩।

“(হে মুসলমান সম্প্রদায়!) তোমরা তাদের (তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলার) জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি এবং সুসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো”। সূরা আল-আন্‌ফাল ৮:৬০।

অধিকাংশ আলিম উল্লেখ করেছেন যে, কারিগরিবিদ্যা/শিল্পকর্মবিদ্যা শিক্ষা করা ‘ফর্‌যে কেফায়াহ’ (যৌথভাবে পালনীয় ফর্‌য)। কেননা মানুষের জন্য কিছু পাত্র অপরিহার্য, যেগুলোর সাহায্যে তারা রান্না করে, পানি পান করে এবং অন্যান্য কাজগুলো করে, যে কাজগুলোর দ্বারা তারা উপকৃত হয়। অতএব, যখন এমন কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে না, যে ব্যক্তি ঐ শিল্পকর্মগুলোর দায়িত্ব গ্রহন করবে এবং (ঐগুলোর জন্য) কারখানা তৈরি করবে; তখন ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা করা ‘ফর্‌যে কেফায়াহ’ (যৌথভাবে পালনীয় ফর্‌য) হবে। (আলিমগণ আরও বলেছেন যে) আর এটিই (ফরযে কেফায়াহ) আলিমগণের মাঝে বিতর্কের ক্ষেত্র। সর্বাবস্থায় এটি বলতে পছন্দ করি,

إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِىْ هُوَ مَحَلُّ الثَّنَاءِ، هُوَ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِىْ هُوَ فِقْهُ كِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ رَسُوْلِهِ

“নিশ্চয় ঐ ‘ইল্‌ম (জ্ঞান), যেটি প্রশংসার ক্ষেত্র ও স্থান; সেটিই ‘ইল্‌মে শারঈ (ইসলামী জ্ঞান)। যা আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর বুঝ/উপলব্ধি।”

আর এটি (‘ইল্‌মে শার‘ঈ) ছাড়া অন্যান্য ‘ইল্‌ম, হয় ভাল কাজের জন্য মাধ্যম হবে, না হয় খারাপ কাজের জন্য মাধ্যম হবে। সুতরাং ঐ ‘ইল্‌ম যে কাজের জন্য মাধ্যম হবে, সে কাজ অনুসারে ঐ ‘ইল্‌মের বিধান নির্ধারিত হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ‘ইল্‌ম (জ্ঞান) এর ফযীলত (فضائل العلم)

অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা ‘ইল্‌ম এবং তার ধারক-বাহক (জ্ঞানী / বিদ্বান ব্যক্তি) এর প্রশংসা করেছেন। আর অবশ্যই তিনি তার বান্দাদেরকে ‘ইল্‌ম অর্জন (জ্ঞানার্জন) এবং তা থেকে পাথেয় সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করেছেন। ‘ইল্‌ম অর্জন করা সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ আমলের অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ নফল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ‘ইল্‌ম অর্জন করা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের একটি প্রকার। মহান আল্লাহর দীন কেবলমাত্র দু’টি বিষয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম বিষয়: 'ইল্‌ম অর্জন এবং দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা (**العلم والبرهان**)।

দ্বিতীয় বিষয়: যুদ্ধ ও সমরাস্ত্র (**القتال والسنان**)।

সুতরাং এ দু'টি বিষয় অপরিহার্য। শুধুমাত্র এ দু'টি বিষয়ের মাধ্যমেই আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী হওয়া সম্ভব।

আর এ দু'টির মধ্য থেকে প্রথম বিষয় ('ইল্‌ম অর্জন এবং দলীল প্রমাণ) -কে দ্বিতীয় বিষয় (যুদ্ধ ও সমরাস্ত্র) এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন গোত্রের উপর আক্রমণ করতেন না, যতক্ষণ না তাদের নিকটে আল্লাহর দীনের দা'ওয়াত পোঁছে। অতএব যুদ্ধের পূর্বে 'ইল্‌ম অর্জন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে ছ্বলাতে সিজ্‌দাবনত অবস্থায় এবং দাঁড়ানো অবস্থায় আনুগত্য প্রকাশ করে, পরকালের (শাস্তিকে) ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে (সে ব্যক্তি কি তার সমান, যে ব্যক্তি তা করে না)?" সূরা আয-যুমার ৩৯:৯।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজ্‌দাবনত অবস্থায় অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় 'আনুগত্য প্রকাশ করে, পরকালের (শাস্তিকে) ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকে; তারা উভয়েই কি সমান?

উত্তর: না! তারা উভয়ে সমান নয়।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি আনুগত্য প্রকাশ করে, আল্লাহর দেয়া ছাওয়াবের আশা করে এবং পরকালের (শাস্তিকে) ভয় করে; তার এ কর্মগুলো কি 'ইল্‌ম থাকার কারণে (সংঘটিত হয়েছে) না-কি 'ইল্‌ম না থাকার কারণে (সংঘটিত হয়েছে)?

উত্তর: (তার এ কর্মগুলো) 'ইল্‌ম থাকার কারণে (সংঘটিত হয়েছে)। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

“(হে নবী!) আপনি বলুন, যারা (তাদের প্রতিপালক এবং সত্য দীন সম্পর্কে) জানে এবং যারা এগুলোর কিছুই জানে না, তারা কি সমান? কেবলমাত্র জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ করে”। সূরা আয্-যুমার ৩৯:৯।

যেমনভাবে জীবিত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তি, শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ও শ্রবণশক্তিহীন ব্যক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ও দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তি সমান নয়; ঠিক তেমনভাবে যে ব্যক্তি (তার প্রতিপালক এবং সত্য দীন সম্পর্কে) জানে আর যে ব্যক্তি তা জানে না, তারা উভয়ে সমান নয়।

‘ইল্‌ম হচ্ছে আলো, যার মাধ্যমে মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পায় এবং অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে বের হয়ে আসে। আল্লাহ তা‘আলা ‘ইল্‌মের কারণেই তার সৃষ্ট জীবের মধ্য থেকে যাকে চান (উচ্চ মর্যাদায়) উন্নীত করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾

“তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে (ইহকালে সম্মান ও পরকালে ছাওয়াব দানের মাধ্যমে) বহু মর্যাদায় উন্নীত করেন”। সূরা আল-মুজাদালা ৫৮:১১।

একারণেই আমরা দেখতে পাই যে, জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই প্রশংসার পাত্র। যখনই তাদের আলোচনা করা হয়, তখনই মানুষ তাদের প্রশংসা করে। আর এটি তাদের ইহকালীন মর্যাদা।

পক্ষান্তরে আল্লাহর দিকে যারা দা’ওয়াত দিয়েছেন এবং যা জানেন তা অনুযায়ী যে আমল করেছেন; তার ভিত্তিতে তারা পরকালে বহু মর্যাদায় উন্নীত হবেন। প্রকৃত ইবাদতকারী (বান্দা) সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট শার‘ঈ দলীলের ভিত্তিতে তার প্রতিপালকের ‘ইবাদত করে এবং যার নিকটে সত্য প্রকাশিত হয়। আর এটিই নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ/রাস্তা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

“(হে মুহাম্মাদ!) আপনি (মুশরিকদেরকে) বলুন, এটিই (আল্লাহর একত্বের দিকে আহ্বান করা) আমার পথ। (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সুস্পষ্ট (শার‘ঈ) দলীলের ভিত্তিতে (একমাত্র) আল্লাহর (‘ইবাদতের) দিকে (মানুষকে) আহ্বান

করি এবং যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করে। আর (অংশীদারদের থেকে) আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি, এমতাবস্থায় আমি মুশরিকদের (অংশীদার সাব্যস্তকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নই”। সূরা ইউসুফ; ১২:১০৮।

প্রশ্ন: যিনি পবিত্রতা অর্জন করেন এটা জেনে যে, তিনি শারঈ পদ্ধতির উপর রয়েছেন, তিনি কি ঐ ব্যক্তির মত; যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে একারণে যে, সে তার পিতা অথবা মাতাকে পবিত্রতা অর্জন করতে দেখেছে? ইবাদত বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে দু’জনের মধ্যে কে অধিকতর শ্রেষ্ঠ? যিনি পবিত্রতা অর্জন করেন এ কারণে যে, তিনি জানেন আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্রতা। অতএব তিনি আল্লাহর আদেশকে মেনে চলার জন্য এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতকে অনুসরণ করার জন্য পবিত্রতা অর্জন করেন, ঐ ব্যক্তি (অধিকতর শ্রেষ্ঠ)? নাকি অপর যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে একারণে যে, এটি তার নিকটে অভ্যাস?

উত্তর: নিঃসন্দেহে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিনি, যিনি সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদত করেন। তাহলে, এ ব্যক্তি আর ঐ ব্যক্তি কি সমান? (কখনোই সমান নয়) যদিও দুজনের মধ্য থেকে প্রত্যেকের কাজ (বাহ্যিক দিক দিয়ে) একই ছিল। কিন্তু এ ব্যক্তি ‘ইল্ম এবং সুস্পষ্ট দলীলের কারণে আল্লাহর (জান্নাতের) প্রত্যাশা করেন, পরকালের (শাস্তিকে) ভয় করেন এবং তিনি জানেন যে, তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর (সুন্নাতের) অনুসারী। আর আমি এই স্থানেই থেমে যাব এবং কিছু প্রশ্ন করব।

প্রশ্ন: আমরা কি উযূ করার সময় এটি উপলব্ধি করি যে, আমরা আল্লাহর এই বাণীতে উল্লেখিত তার আদেশ মেনে চলছি?

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

“হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছ্বলাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে (দাঁড়ানোর ইচ্ছা করবে, এমতাবস্থায় তোমরা উযূবিহীন অবস্থায় রয়েছ), তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু’হাত কুনুইসহ ধৌত করো, তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো এবং তোমাদের পা টাখনুসহ (ধৌত করো)”। সূরা আল-মায়িদা ৫:৬।

মানুষ কি তার অযূর সময় উক্ত আয়াতটি স্মরণ করে? অথচ সে আল্লাহর আদেশ মেনে চলার জন্যই উযূ করে? আর সে কি উপলব্ধি করে যে, এটি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উযূ? অথচ সে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করার জন্যই উযূ করে?

উত্তর: হ্যাঁ! বাস্তবতা হচ্ছে যে, আমাদের মধ্য থেকে কেউ এটি স্মরণ করে (আর কেউ এটি স্মরণ করে না)। আর একারণেই সকল প্রকার ইবাদত সম্পাদন করার সময়ে ঐ সকল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ আমাদের মেনে চলা ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক), যেন এটির মাধ্যমে আমাদের মাঝে ইখলাছ (একনিষ্ঠতা) বাস্তবায়িত হয় এবং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের অনুসরণ করা ওয়াজিব।

আমরা জানি যে, নিয়্যাত করা উযূর শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কখনো কখনো এর দ্বারা আমলের নিয়্যাতকে উদ্দেশ্য করা হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের উপর বাধ্যতামূলক। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, ইবাদত সম্পন্ন করা অবস্থায় আমাদের এটি স্মরণ করা যে, ইখলাছ (একনিষ্ঠতা) বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে ইবাদতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর আদেশ মেনে চলছি। আর ইবাদত সম্পন্ন করা অবস্থায় আমাদের এটিও স্মরণ করা যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ইবাদতটি করেছেন। আমরা এ ইবাদতের ক্ষেত্রে অনুসরণ বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে তার অনুসরণ করি। কেননা ইখলাস এবং অনুসরণ হচ্ছে আমল বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে দু'টির মাধ্যমেই এ সাক্ষ্য প্রদান বাস্তবায়িত হয় যে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

“আল্লাহ ছাড়া (প্রকৃত) কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল”।

আমরা এ পরিচ্ছেদের শুরুতে ‘ইল্‌ম অর্জনের ফযীলতসমূহ নিয়ে যে আলোচনা করেছিলাম, (এখন) সে দিকে ফিরে যাচ্ছি। কারণ ‘ইল্‌ম অর্জনের মাধ্যমে মানুষ (কুরআন-সুন্নাহ্‌'র) সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে তার প্রতিপালকের ‘ইবাদত করে। ফলে তার অন্তর ‘ইবাদতের সাথে ঝুলে থাকে এবং তার অন্তর ‘ইবাদতের কারণে আলোকিত হয়। আর সে ব্যক্তি ‘ইবাদত করে এ ভিত্তিতে যে, এটি একটি ‘ইবাদত। এ ভিত্তিতে নয় যে, এটি একটি অভ্যাস। আর এ কারণেই যখন মানুষ এ দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে ছ্বলাত আদায় করে, তখন তার জন্য ঐ বিষয়টি নিশ্চিত

হয়ে যায়, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, ছ্বলাত অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

'ইল্‌ম (জ্ঞান) এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত

১. 'ইল্‌ম নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) এর উত্তরাধিকার (أنه إرث الأنبياء):

নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) (কাউকে) দিরহাম এবং দিনারের (দুনিয়াবী কোন জিনিসের) উত্তরাধিকারী বানাননি। কেবলমাত্র তারা (মানুষকে) 'ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি 'ইল্‌ম অর্জন করে, তাহলে সে ব্যক্তি নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) এর উত্তরাধিকার থেকে পূর্ণ অংশ অর্জন করতে পারবে।

অতএব এ পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন তুমি জ্ঞানবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন তুমি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তরাধিকারী হবে। আর এটি ('ইল্‌ম অর্জনের) সবচেয়ে বড় ফযীলত।

২. 'ইল্‌ম স্থায়ী হয়, আর সম্পদ ফুরিয়ে যায় (أنه يبقى والمال يفنى):

আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দরিদ্র ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এমনকি তিনি ক্ষুধার কারণে অজ্ঞান হয়ে (মাটিতে) পড়ে যেতেন। আমি আল্লাহর কসম করে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আমাদের যুগে মানুষের মাঝে আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীছ চলে, নাকি চলে না? হ্যাঁ! তার বর্ণিত হাদীছ অনেক চলে। সুতরাং আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ ছাওয়াব হয়, যে ব্যক্তি তার বর্ণিত হাদীছগুলো দ্বারা উপকৃত হয়। তাহলে বুঝা গেল যে, 'ইল্‌ম টিকে থাকে, আর সম্পদ ফুরিয়ে যায়। অতএব, হে 'ইল্‌ম অন্বেষণকারী! 'ইল্‌মকে আঁকড়ে ধরা তোমার উপর অপরিহার্য।

হাদীছে প্রমাণিত আছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"যখন মানুষ মারা যায়, তখন তিনটি আমল ছাড়া তার সকল আমল (সকল আমলের ছাওয়াব তার থেকে) ছিন্ন হয়ে যায়। ছদাক্বায়ে জারিয়াহ, এমন 'ইল্‌ম

(জ্ঞান), যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সৎ সন্তান, যে সন্তান (তার মৃত্যুর পর) তার জন্য দু‘আ করে”।[8]

৩. ‘ইল্‌ম অর্জনকারী (জ্ঞানবান ব্যক্তি) ‘ইল্‌ম (সংরক্ষণের ক্ষেত্রে) কোন কষ্ট অনুভব করে না (أنه لا يُتعب صاحبه في الحراسة):

কেননা যখন আল্লাহ তোমাকে কোন ‘ইল্‌ম দান করেন, তখন তিনি তা (তোমার) অন্তরে সংরক্ষণ করেন। ‘ইল্‌ম (সংরক্ষণের ক্ষেত্রে) কোন সিন্দুক বা চাবিকাঠি অথবা অন্যান্য কোন জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করেন না। এটি (মানুষের) অন্তরে ও হৃদয়ে সংরক্ষিত থাকে। আর যথাসময়ে ‘ইল্‌মই (জ্ঞানই) তোমার অভিভাবক হয়ে যায়। কেননা এটি আল্লাহর অনুমতিক্রমে তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। অতএব, ‘ইল্‌মই তোমাকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে সম্পদকে তুমি নিজেই বড় দরজার অন্তরালে সিন্দুকের মধ্যে রেখে সংরক্ষণ কর। আর তা সত্ত্বেও তুমি সম্পদের ব্যাপারে আস্থাশীল হও না।

৪. মানুষ সত্যের সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ‘ইল্‌মকে মাধ্যম বানায় (أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق):

এর দলীল (প্রমাণ) হচ্ছে আল্লাহর এই বাণী,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

“ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই”। সূরা আলে ইমরান; ৩:১৮।

(এখানে) আল্লাহ কি “ধনী ব্যক্তিগণ” (أُوْلُوْ الْمَالِ) বলেছেন? না! বরং তিনি বলেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ (أُوْلُوْ الْعِلْمِ)। সুতরাং হে ‘ইল্‌ম অন্বেষণকারী! আল্লাহর একত্বের উপর সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতাগণের সাথে যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে এ সাক্ষ্যদান করে যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সে ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়া তোমার সম্মানের জন্য যথেষ্ট।

[8] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৩১, সুনান আবূ দাউদ হা/২৮৮০, সুনান আত-তিরমিযী হা/১৩৭৬।

৫. "উলাতুল আম্‌র" (কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ) এর দু'শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী হলেন আহলুল ইলম (আলিমগণ) (أن أهل العلم هو أحد صنفي ولاة الأمر):

আল্লাহ তা'আলা যাদের আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে أُوْلُوْ الْأَمْرِ "উলুল আম্‌র" (কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ) এর (আনুগত্য করো)"। সূরা আন-নিসা ৪:৫৯।

অতএব, এখানে "উলাতুল উমূর" (পদটি) "শাসকবর্গ ও বিচারকবর্গ" এবং "জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ (উলামায়ে কিরাম) ও 'ইল্‌ম অন্বেষণকারী (শিক্ষার্থীবৃন্দ)" শব্দগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তিগণের (আলিমগণের) কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর বিধি-বিধান (শরী'আত) বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এবং জনগণকে তার দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে। আর শাসকবর্গের কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর বিধি-বিধান (রাষ্ট্রে) বাস্তবায়িত করা এবং সে বিধি-বিধান পালনের জন্য জনগণকে বাধ্য করা।

৬. আহলুল ইলম (আলিমগণ) কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার আদেশের উপর আটল থাকবেন (أن أهل العلم هو القائمون على أمر الله تعالى حتى تقوم الساعة): আর এর পক্ষে দলীল (প্রমাণ) গ্রহণ করা হয় মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর (বর্ণিত) হাদীছ দ্বারা। তিনি বলেন, আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ

"আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দীনের সঠিক 'ইল্‌ম (জ্ঞান) দান করেন"।[৫]

প্রকৃতপক্ষে আমি (আল্লাহর আদেশক্রমে তোমাদের সকলের মাঝে ওহীর জ্ঞান) বন্টন করি এবং আল্লাহ (তার ইচ্ছানুযায়ী তোমাদের সকলকে দীনের 'ইল্‌ম) দান করেন। আর এ উম্মাহ (আলিম জাতি) আল্লাহর সত্য দীনের উপর অটল থাকবেন। যারা তাদের বিরোধিতা করে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে

[৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৩৭, ছ্বহীহ ইবনু হিব্বান হা/৮৯

পারবে না। এমনকি আল্লাহর আদেশ (কিয়ামত) সংঘটিত হবে, (অথচ তারা এমনই থাকবে)। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এ দল সম্পর্কে বলেন,

إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا أَهْلَ الْحَدِيْثِ فَلَا أَدْرِيْ مَنْ هُمْ

"যদি তারা 'আহ্‌লুল হাদীছ' না হন, তাহলে আমি জানি না তারা কারা"।[৬] আর ক্বাযী 'ইয়াদ্ব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَ مَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) "আহলুস সুন্নাহ"কে এবং যারা আহলুল হাদীছ মতাদর্শকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন।[৭]

৭. আল্লাহ (তার বান্দাগণকে) যেগুলো নি'আমত দান করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোন নি'আমতের ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে কারও প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দেননি। তবে দু'টি নি'আমতের ব্যাপারে (একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দিয়েছেন)।

ক. 'ইল্‌ম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা এবং তা অনুযায়ী আমল করা।

খ. এমন ব্যবসায়ী, যে তার সম্পদ ইসলামের কাজে প্রদান করে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِه فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

"(শুধুমাত্র) দু'টি ক্ষেত্রে ছাড়া (অন্য কোন ক্ষেত্রে) ঈর্ষা করা বৈধ নয়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তিনি তাকে মহৎ কাজগুলোর ক্ষেত্রে তা খরচ করার ব্যাপারে ক্ষমতা দিয়েছেন। আর এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আল্লাহ যাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে ব্যক্তি তা অনুযায়ী আমল করে এবং তা মানুষকে (ছাওয়াবের আশায়) শিক্ষা দেয়"।[৮]

---

[৬] ফাতহুল বারী ১/১৬৪, শারহুন নাওয়াবী; ১৩/৬৭।
[৭] প্রাগুক্ত।
[৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮১৬, ছ্বহীহ ইবনু হিব্বান হা/৯০, সুনান ইবনু মাজাহ হা/৪২০৮, আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী হা/২০১৬৪।

৮. ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণিত হাদীছে (‘ইল্‌ম সম্পর্কে বর্ণনা) এসেছেঃ

আবূ মূসা আল-আশ‘আরী (রযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

“আল্লাহ যে দিক-নির্দেশনা এবং (শারঈ দলীলসমূহের) ‘ইল্‌মসহ আমাকে (দুনিয়াতে) পাঠিয়েছেন, তা (অর্জনকারীর) দৃষ্টান্ত হচ্ছে জমিনের (এক অংশে) পতিত পর্যাপ্ত বৃষ্টির মত। (প্রথম প্রকার জমিন) ভাল উর্বর কিছু ভূমি রয়েছে, যেগুলো ভূমি পানি শুষে নেয়, অতঃপর প্রচুর তাজা ও শুকনা তৃণলতা এবং তাজা ঘাস উৎপন্ন করে। (দ্বিতীয় প্রকার জমিন) আর শক্ত কিছু ভূমি রয়েছে, যেগুলো ভূমি পানি আটকে রাখে। অতঃপর আল্লাহ ঐ পানির দ্বারা সকল মানুষের উপকার করেন। ফলে তারা (নিজেরা তা) পান করে, (তাদের পশুপাখিকে) পান করায় এবং (তা দ্বারা) চাষাবাদ করে। (তৃতীয় প্রকার জমিন:) জমিনের অপর কিছু অংশে বৃষ্টি পতিত হয়, যে অংশগুলো কেবলমাত্র সমতল। সেগুলো ভূমি পানি আটকে রাখে না এবং তাজা ও শুকনা তৃণলতাও উৎপন্ন করে না।[৯]

সুতরাং ঐ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার) জমিন হলো এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের ব্যাপারে ‘ইল্‌ম অর্জন করে এবং আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা তার উপকারে আসে। ফলে সে ‘ইল্‌ম অর্জন করে এবং তা শিক্ষা দেয়। আর ঐ (তৃতীয় প্রকার) জমিন হলো এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহর যে দিক-নির্দেশনা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, সেটিও গ্রহণ করে না”।[১০]

---

[৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৯, শার্‌হুস সুন্নাহ হা/১৩৫।

[১০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৯৯, তিরমিযী হা/২৯৪৫, ইবনু মাজাহ হা/২২৫।

৯. ‘ইল্‌ম (অন্বেষণের পথ) জান্নাতের পথ (أنه طريق الجنة):

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীছ তার প্রমাণ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

আর যদি কোন ব্যক্তি ‘ইল্‌ম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয়, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দিকে রাস্তা সহজ করে দেন।[১১]

১০. মু‘আবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে ‘ইল্‌ম সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

“আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দীনের ব্যাপারে জ্ঞান দান করেন”।[১২]

অর্থাৎ আল্লাহ তার দীনের ব্যাপারে তাকে ফকীহ/বিশেষজ্ঞ বানিয়ে দেন। ফিকাহশাস্ত্রে পারদর্শীদের নিকটে اَلْفِقْهُ فِي الدِّيْنِ (দীনের ব্যাপারে জ্ঞান) দ্বারা শুধুমাত্র فِقْهُ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَخْصُوْصَةِ (বিশেষ আমল সংক্রান্ত বিধি-বিধানের জ্ঞান) উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা عِلْمُ التَّوْحِيْدِ (আল্লাহর একত্বের জ্ঞান), عِلْمُ أُصُوْلِ الدِّيْنِ (দীনের মূলনীতিসমূহের জ্ঞান) এবং আল্লাহর শরী‘আতের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদির জ্ঞান উদ্দেশ্য। আর যদি ‘ইল্‌ম অর্জনের ফযীলতের ক্ষেত্রে এ হাদীছটি ব্যতিত কুরআন এবং হাদীছের কোন দলীল না থাকে, তবুও অবশ্যই এ হাদীছটি শরী‘আতের ‘ইল্‌ম অন্বেষণ ও অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।

১১. ‘ইল্‌ম হচ্ছে আলো, যার দ্বারা বান্দা আলোকিত হয়:

বান্দা জানে সে কিভাবে তার প্রতিপালকের ‘ইবাদত করবে এবং সে কিভাবে তার বান্দাদের সাথে পারস্পারিক লেনদেন করবে। অতএব, এসব ব্যাপারে ‘ইল্‌ম এবং (কুরআন ও হাদীছের) সুস্পষ্ট দলীল অনুযায়ী তার চলার পথ হয়।

[১১. ছ্বহীহঃ মুসলিম হা/২৬৯৯, তিরমিযী হা/২৬৪৬, ইবনে মাজাহ হা/২২৫।

[১২. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৩৭।

১২. নিশ্চয় আলিম (জ্ঞানী) ব্যক্তি হলেন আলো, যার দ্বারা লোকেরা তাদের দীন ও দুনিয়ার বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সঠিক পথ পায়:

আর বানী ইসরাঈলের (১০০ জন মানুষকে হত্যাকারী) লোকটির ঘটনা আমাদের অধিকাংশের নিকটে গোপনীয় নয়। যখন ঐ লোকটি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করল, তখন সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একজন আলিম সম্পর্কে (মানুষকে) জিজ্ঞেস করল। অতঃপর তাকে একজন ধার্মিক লোকের ব্যাপারে বলা হলো। তারপর সে (তার নিকটে গিয়ে) তাকে জিজ্ঞেস করল: তার জন্য কি কোন তাও্বাহ রয়েছে? তখন ধার্মিক লোকটি যেন বিষয়টিকে বড় মনে করলেন। তারপর তিনি বললেন: না! (কোন তাওবা নেই)। ফলে সে তাকে হত্যা করে তার দ্বারা (হত্যাকৃত ব্যক্তির সংখ্যা) ১০০ জন পূর্ণ করল। অতঃপর সে একজন আলিমের নিকটে গেল। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করল: (তার জন্য কি কোন তাও্বাহ রয়েছে?) তখন তিনি তাকে সংবাদ দিলেন যে, তার জন্য তাও্বাহ রয়েছে। (তিনি তাকে আরও সংবাদ দিলেন যে,) এমন কিছু নেই, যা তার মাঝে এবং তার তাওবাহ্'র মাঝে প্রতিবন্ধক হবে। অতঃপর তিনি তাকে এক দেশের ব্যাপারে বললেন, সে দেশের উদ্দেশ্যে তার বের হওয়ার জন্য, যার অধিবাসীগণ সৎ। ফলে সে বের হলো। অতঃপর রাস্তার মাঝে তার মৃত্যু সংঘটিত হলো। ঘটনাটি প্রসিদ্ধ।[১৩] সুতরাং তুমি 'আলিম (জ্ঞানী) এবং জাহিল (মূর্খ) এর মাঝে পার্থক্য লক্ষ্য করো।

১৩. নিশ্চয় আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে (আলিমগণকে) উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন: তারা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের যে দায়িত্ব পালন করেন, তার ভিত্তিতে এবং তারা যা জানেন তা অনুযায়ী আমল করার ভিত্তিতে, দুনিয়াতে আল্লাহ তাদেরকে তার সমস্ত বান্দাদের মাঝে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। পক্ষান্তরে, পরকালেও তিনি তাদেরকে এসবের ভিত্তিতে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে (ইহকালে সম্মান ও পরকালে ছাওয়াব দানের মধ্যমে) বহু মর্যাদায় উন্নীত করবেন"। সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮:১১।

---

[১৩] ঘটনাটি ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিম এ বর্ণিত হয়েছে। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: 'ইল্‌ম (জ্ঞান) অন্বেষণের বিধান (حكم طلب العلم)

শারঈ 'ইল্‌ম অন্বেষণ করা ফরযে কিফায়াহ। যখন কোন ব্যক্তি শারঈ 'ইল্‌ম অর্জনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তা সংরক্ষণ করবে; তখন অন্যদের জন্য তা অন্বেষণ করা "সুন্নাহ" হয়ে যাবে। আর কখনো কখনো শারঈ 'ইল্‌ম অন্বেষণ করা "ফরযে 'আইন" (ব্যক্তিগতভাবে পালনীয় ফরয) হয়ে যায়।

আর এর মূলনীতি হলো: "মানুষ যে 'ইবাদত করার ইচ্ছা করে এবং যে লেনদেন সম্পন্ন করার ইচ্ছা করে, সে বিষয়ে জ্ঞানার্জন মানুষের উপর নির্ভর করে"। কেননা এ অবস্থায় তার উপর জানা আবশ্যক কিভাবে সে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য এ 'ইবাদতটি করবে এবং কিভাবে এ লেনদেনটি সম্পন্ন করবে। এছাড়া অন্যান্য 'ইল্‌ম (অন্বেষণ করা) "ফরযে কেফায়া"। আর 'ইল্‌ম অন্বেষণকারীর জন্য স্বয়ং নিজে উপলব্ধি করা উচিত যে, 'ইল্‌ম অর্জনের সাথে সাথে "ফরযে কেফায়া" আদায়কারীর যে ছাওয়াব, সে ছাওয়াব তার অর্জিত হওয়ার জন্য সে 'ইল্‌ম অন্বেষণের মুহূর্তেই "ফরযে কেফায়াহ" আদায় করছে।

কোন সন্দেহ নেই যে, 'ইল্‌ম অন্বেষণ করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমলের অন্তর্ভুক্ত। বরং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে আমাদের এ যুগে ইসলামী সমাজে প্রকাশিত হয় ও অধিক হারে ছড়িয়ে পড়ে এমন বিদ'আতসমূহ যখন আরম্ভ হলো, 'ইল্‌ম ছাড়া ফাতাওয়া প্রদানের জন্য প্রত্যাশী লোকদের দ্বারা অধিক মূর্খতা আরম্ভ হলো এবং অধিকাংশ লোকের মাঝে বিতর্ক আরম্ভ হলো; তখন এ তিনটি বিষয়ই 'ইল্‌ম অন্বেষণের ব্যাপারে তরুণ সমাজকে বাধ্য করল।

সুতরাং এ কারণেই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা এমন জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের (আলিমগণের) নিকটে যাব, যাদের পর্যাপ্ত গবেষণার যোগ্যতা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার দীনের ব্যাপারে (সঠিক) বুঝ/জ্ঞান রয়েছে, আল্লাহর বান্দাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা রয়েছে। কেননা সম্প্রতিকালে অধিকাংশ লোক বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য থেকে কোন এক বিষয়ে তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন করে, অথচ সে তত্ত্ব মানুষকে সংশোধন করার জন্য, শিক্ষাদানের জন্য তাদেরকে চিন্তিত করে না। আর তারা এমন এমন ফাত্‌ওয়া দেয়, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতির জন্য মাধ্যম হয়ে যায়। যে ক্ষতির সীমারেখা আল্লাহ ব্যতিত কেউ জানেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘ইল্‌ম (জ্ঞান) অন্বেষণকারীর/শিক্ষার্থীর আদব-কায়দা এবং তা অর্জনের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সূত্র প্রসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ: ‘ইল্‌ম অন্বেষণকারীর আদব-কায়দা (آداب طالب العلم)

একজন শিক্ষার্থীর আদব-কায়দা/শিষ্টাচারসমূহ মেনে চলা অপরিহার্য। তন্মধ্যে কিছু শিষ্টাচার নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

প্রথম আদেশ: আল্লাহ তা‘আলার জন্য নিয়্যাতকে খাঁটি করা (إخلاص النية لله عز وجل): এমনভাবে নিয়্যাতকে খাঁটি করতে হবে যে, ‘ইল্‌ম অন্বেষণের দ্বারা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি (অর্জন) এবং জান্নাত (পাওয়া)। কেননা আল্লাহ ‘ইল্‌ম অন্বেষণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে ও উৎসাহ প্রদান করে বলেন,

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: ١٩]

“(হে নবী!) আপনি এ ‘ইল্‌ম অর্জন করুন যে, তিনি ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই, আর আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন”। সূরা মুহাম্মাদ; ৪৭:১৯।

কুরআনে আলিমগণের ব্যাপারে প্রশংসার বিষয়টি জ্ঞাত। আর যখন আল্লাহ কোন বিষয়ের ব্যাপারে বা কোন কাজের ব্যাপারে প্রশংসা করেন, তখন তা ‘ইবাদত হয়। আর যদি মানুষ মর্যাদার মাধ্যম বানানোর জন্য শারঈ ‘ইল্‌ম অন্বেষণের দ্বারা প্রশংসাপত্র পাওয়ার নিয়্যাত করে, তাহলে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَعْنِي رِيْحَهَا

“যে ‘ইল্‌মের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা যায়, যদি কোন ব্যক্তি সে ‘ইল্‌মের দ্বারা কেবলমাত্র দুনিয়ার সামগ্রী পাওয়ার জন্যই তা শিক্ষা করে, তাহলে সে

ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধ পাবে না। (রাবী বলেন) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের ঘ্রাণ উদ্দেশ্য করেছেন”।[১৪]

আর এটি কঠিন হুমকি। কিন্তু যদি ছাত্র/শিক্ষার্থী বলে, আমি দুনিয়ার প্রাচুর্যের জন্য সনদপত্র পেতে চাই না, বরং এজন্য যে, বিভিন্ন নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে সনদপত্রের কারণে একজন আলিমের মান (যোগ্যতা) সুস্পষ্ট হয়। সুতরাং আমরা বলবো, যখন শিক্ষাদান বা পরিচালনা করা অথবা অন্য কিছু করার মাধ্যমে মানুষের উপকার করার জন্যে কোন ব্যক্তির নিয়্যাত হবে সনদপত্র পাওয়া, তখন এটি হবে খাঁটি নিয়্যাত। কোনকিছু এর ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা এটি প্রকৃত নিয়্যাত।

আর প্রকৃতপক্ষে, আমি একজন শিক্ষার্থীর (জন্য অপরিহার্য) শিষ্টাচারগুলোর প্রথমেই ‘ইখ্‌লাছ্ব’ কে উল্লেখ করলাম। কেননা ‘ইখ্‌লাছ্ব’ হলো মূলভিত্তি। সুতরাং ‘ইল্‌ম অন্বেষণের দ্বারা আল্লাহর আদেশ মেনে চলার নিয়্যাত করা একজন শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য।

কেননা আল্লাহ তা‘আলা ‘ইল্‌ম অর্জনের ব্যাপারে আদেশ করে বলেছেন,

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: ١٩]

(হে নাবী!) আপনি এ ‘ইল্‌ম অর্জন করুন যে, তিনি ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই, আর আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯।

সুতরাং যদি তুমি ‘ইল্‌ম অর্জন কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি আল্লাহর আদেশ মান্যকারী হবে।

দ্বিতীয় আদেশ: নিজের এবং অন্যের থেকে অজ্ঞতা দূর করা (رفع الجهل عن نفسه وعن غيره): ‘ইল্‌ম অন্বেষণের দ্বারা নিজের থেকে এবং অন্যের থেকে অজ্ঞতা/মূর্খতা দূর হওয়ার নিয়্যাত করা। কেননা মানুষের মাঝে মূল (সমস্যা) হলো অজ্ঞতা। আর এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

[১৪] ছ্বহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৮, সুনান আবূ দাউদ হা/৩৬৬৪, সুনান ইবনু মাজাহ হা/২৫২, মুসনাদ আহমাদ হা/৮৪৫৭, মুছ্বন্নাফ ইবনু আবী শাইবা হা/২৬১২৭।

“আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন, এমন অবস্থায় তোমরা কিছুই জানতে না! আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর”। সূরা আন-নাহল ১৬:৭৮।

আর বাস্তবতা এরই সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং তুমি ‘ইল্‌ম অন্বেষণের দ্বারা তোমার নিজের থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করো এবং এর দ্বারা আল্লাহভীতি অর্জনের নিয়্যাত করো। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

“কেবলমাত্র আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে আলিমগণই আল্লাহকে ভয় করে”। সূরা ফাতির ৩৫:২৮।

অতএব তুমি তোমার নিজের থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করো। কেননা তোমার মাঝে মূল (সমস্যা) হলো অজ্ঞতা/মূর্খতা। সুতরাং যখন তুমি ‘ইল্‌ম অর্জন করবে এবং আলিমগণের অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন তোমার থেকে অজ্ঞতা বিতাড়িত হবে। অনুরূপভাবে উম্মাহর (জাতির) নিকট থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করো। আর এটি (সম্ভব) হবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে (‘ইল্‌ম) শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে, যেন তোমার ‘ইল্‌ম দ্বারা তুমি লোকজনের উপকার করতে পার।

প্রশ্ন: (১) ‘ইল্‌ম উপকারে আসার জন্য মসজিদে তোমার গোল হয়ে বসা কি **শর্ত?** (২) নাকি সর্বাবস্থায় তোমার ‘ইল্‌ম দ্বারা মানুষের উপকার করা সম্ভব**?**

উত্তর: ২য় টির দ্বারা (মানুষের উপকার করা) সম্ভব। কেননা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

“আমার থেকে একটি বাণী/কথা হলেও (মানুষের নিকটে) পৌঁছে দাও”।[১৫]

কেননা যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে ‘ইল্‌ম শিক্ষা দিবে, আর সে ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তা শিক্ষা দিবে; তখন তোমার জন্য দু’জন ব্যক্তির সম-পরিমাণ ছাওয়াব নিধারিত হবে। আর যদি সে ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তিকে (তা) শিক্ষা দেয়, তাহলে তোমার জন্য তিনজন লোকের (সম-পরিমাণ) ছাওয়াব নির্ধারিত হবে। এভাবে

[১৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৬১।

(চলতেই থাকবে)। আর একারণেই যখন মানুষ কোন 'ইবাদত করে, তখন বলেন,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَهَا لِرَسُوْلِ اللهِ

"হে আল্লাহ! ইবাদতটির (সমান) ছাওয়াব রসূলুল্লাহর জন্য নির্ধারণ করুন"।

কেননা যে রাসূল তোমাকে ইবাদতটি শিক্ষা দিয়েছেন, সে রসূলই ইবাদতের ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সুতরাং, তার জন্য তোমার ছাওয়াবের সম-পরিমাণ (ছাওয়াব) রয়েছে। ইমাম আ'হ্‌মাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

اَلْعِلْمُ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ لِمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ

যে ব্যক্তির নিয়্যাত বিশুদ্ধ, সে ব্যক্তির 'ইল্‌মের সম-পরিমাণ কোন কিছুই হতে পারে না।

ঐ ব্যক্তি নিজের থেকে এবং অন্যের থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করবে।

(লেখক বললেন), কেননা তাদের মাঝে মূল (সমস্যা) ছিল অজ্ঞতা, যেমন তোমার মাঝে এটিই মূল (সমস্যা)। সুতরাং যখন তুমি এই উম্মাহ (জাতি) থেকে অজ্ঞতা দূর করার জন্য ('ইল্‌ম) শিক্ষা করবে, তখন তুমি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদকারী) এমন মুজাহিদগণের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা আল্লাহর দীনকে উজ্জীবিত করেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন।

তৃতীয় আদেশ: শরী'আত (ইসলামী বিধি-বিধান) রক্ষা করা (الدفاع عن الشريعة):

'ইল্‌ম অন্বেষণের দ্বারা (ইসলামী) শরী'আত রক্ষা করার নিয়্যাত করা। কেননা (ইসলামী) গ্রন্থাবলী শরী'আত রক্ষা করতে সক্ষম নয়। আর শরী'আতের ধারকবাহক ছাড়া শরী'আত কেউ রক্ষা করতে পারে না। সুতরাং যদি বিদ'আতপন্থীদের মধ্য থেকে কোন লোক (ইসলামী) বিধি-বিধান সংবলিত গ্রন্থাবলীতে পরিপূর্ণ কোন পাঠাগারে আসে, যেখানে সেসব গ্রন্থাবলী গণনা করে শেষ করা যায় না। তারপর কোন বিদ'আত নিয়ে কথা বলে ও তা সাবস্ত করে, তাহলে আমি মনে করি না যে, একটি কিতাব হলেও তার জবাব দিবে। কিন্তু সে যখন জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির নিকটে তার বিদ'আত নিয়ে কথা বলবে তা সাব্যস্থ করার জন্য, তখন নিশ্চয় ঐ 'ইল্‌ম অন্বেষণকারী তার জবাব দিবে এবং আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ দ্বারা তা খণ্ডন করবে।

অতএব, একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক হলো ‘ইল্‌ম অন্বেষণের দ্বারা (ইসলামী) শরী‘আহ রক্ষা করার নিয়্যাত করা। কেননা পূর্ণ অস্ত্রের ন্যায় শরী‘আতের ধারক-বাহকের মাধ্যম ব্যতীত (ইসলামী) শরী‘আত রক্ষা করা যায় না। যদি আমাদের নিকটে অনেক অস্ত্র থাকে, তাহলে অস্ত্রের ভান্ডার পূর্ণ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: ক্ষেপনাস্ত্রগুলো অর্জন করার জন্য এ সকল অস্ত্র কি শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম, নাকি (অস্ত্রগুলোর) ধারক-বাহকের মাধ্যম ব্যতিত এটি (সম্ভব) হবে না?

উত্তর: (অস্ত্রগুলোর) ধারক-বাহকের মাধ্যম ব্যতিত এটি (সম্ভব) হবে না। আর ‘ইল্‌মের বিষয়টিও এরূপ। এই কারণেই আমি বলি: একজন ছাত্রের জন্য যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক, তা হলো (ইসলামী) শরী‘আত রক্ষা করা। তাহলে লোকেরা জরুরী প্রয়োজনে আলিমগণের নিকটে যেতে পারবে। একারণে যে, তাঁরা বিদ‘আতপন্থীদের ষড়যন্ত্রের এবং আল্লাহর অন্যান্য শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জবাব দিতে পারেন। আর এটি ‘ইল্‌ম অর্জন ছাড়া (সম্ভব) হবে না।

চতুর্থ আদেশ: মতভেদপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে অন্তর প্রসারিত করা (رحابة الصدر في مسائل الخلاف): এমন মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তর প্রসারিত হওয়া/উদার হওয়া, যার উৎস হলো ইজ্‌তিহাদ। কেননা আলিমগণের মাঝে মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলো হয় এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যার ক্ষেত্রে ইজ্‌তিহাদের কোন অবকাশ নেই এবং মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে বিষয়টি সুস্পষ্ট; তখন কেউ মাসআলাগুলোর মতভেদের ব্যাপারে ওযর গ্রহণ করবে না। অথবা মাসআলাগুলো এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যেগুলোর ক্ষেত্রে ইজ্‌তিহাদের অবকাশ রয়েছে। সুতরাং এই মাসআলাগুলোর ব্যাপারে যারা মতভেদ করেছেন, তারা এগুলোর ক্ষেত্রে ওযর গ্রহণ করেন। আর তোমার উক্তি তার বিরুদ্ধে দলীল হবে না, যিনি মাসআলার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেন। কেননা আমরা যদি এটি গ্রহণ করি, তাহলে অবশ্যই আমরা এর বিপরীতে বলব, তার উক্তি তোমার বিরুদ্ধে দলীল। আর যে ক্ষেত্রে নিজস্ব রায়/মতামতের অবকাশ রয়েছে এবং যে ক্ষেত্রে মানুষ মতভেদ পোষণ করে, সে ক্ষেত্রে আমি এটিই চাই।

পক্ষান্তরে, যদি কোন ব্যক্তি ‘আক্বীদার মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে সালাফগণের পদ্ধতির বিরোধিতা করে, তাহলে সালাফে ছ্বলিহীন যে পদ্ধতির উপর রয়েছেন, সে পদ্ধতির বিরোধিতা কারও পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু যে মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে (নিজস্ব) রায়/মতামতের অবকাশ রয়েছে, সে

মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে মতানৈক্যের কারণে অন্যদের ব্যাপারে কটুক্তি করা উচিত নয়। অথবা মতভেদের কারণে শত্রুতার এবং হিংসার পথ গ্রহণ করা উচিত নয়।

ছাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম অনেক বিষয়ে মতভেদ করেছেন। আর যে ব্যক্তি তাদের মতভেদের ব্যাপারে অবগত হতে চায়, সে ব্যক্তি যেন তাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছারগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করে (অর্থাৎ লক্ষ্য করে)। তাহলে সে ব্যক্তি অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে মতভেদ দেখতে পাবে। সম্প্রতিকালে মতভেদের কারণে মানুষ অভ্যাসগতভাবে যে মাসআলাহ গ্রহণ করেছে, এটিই সবচেয়ে বড় মাসআলাহ। এমনকি মানুষ এখান থেকেই এমনভাবে দলবদ্ধতা গ্রহণ করেছে যে, তারা বলেঃ আমরা অমুকের সাথে আছি (অর্থাৎ আমরা অমুক দলের)। একটি মাসআলাহ নির্দিষ্ট দলের মাসআলাহ হয়ে যায়। আর এটি ভুল।

উদাহরণ স্বরূপঃ কোন এক ব্যক্তির উক্তি, যখন তুমি রুকু থেকে (মাথা) উঠাবে, তখন তোমার ডান হাত বাম হতের উপর রেখো না, বরং তা তোমার দুই উরুর পার্শ্ব পর্যন্ত ছেড়ে দাও। অতএব যদি তুমি তা না কর, তাহলে তুমি বিদ‘আতকারী। কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বিদ‘আতকারী শব্দটি (ব্যবহার করা এত) সহজ নয়। যখন আমার নিকটে কেউ এধরনের কথা বলে, তখনই আমার অন্তরে অপছন্দের একটি বিষয় সৃষ্টি হয়। অথচ আমরা বলব, এ মাসআলার ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে। হয় ব্যক্তি তা পালন করবে অথবা তা ছেড়ে দিবে। আর একারণেই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) দলীল গ্রহণ করেছেন যে,

يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَّضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَ بَيْنَ الْإِرْسَالِ

“কোন ব্যক্তির ডান হাত তার বাম হাতের উপর রাখা এবং (উভয় হাত) ছেড়ে দেওয়ার মাঝে স্বাধীনতা রয়েছে”। কেননা এক্ষেত্রে বিষয়টি প্রশস্ত।

প্রশ্নঃ কিন্তু এই মাসআলাটির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সুন্নাহ কি?

উত্তরঃ সুন্নাহ হলোঃ যখন তুমি রুকু থেকে (মাথা) উঠাবে, তখন তোমার ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখবে, যেমনভাবে তুমি ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখ, যখন তুমি দাঁড়িয়ে থাক। আর এর দলীল রয়েছে ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক সাহ্‌ল ইবনু সা‘দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছে। তিনি বলেছেন,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

“(রসূলের যুগে) লোকদেরকে আদেশ দেওয়া হতো যে, ব্যক্তি ছ্বলাতে তার ডান হাত তার বাম হাতের যিরা’র উপর রাখবে।[১৬]

সুতরাং, তুমি লক্ষ্য করো তিনি ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদার অবস্থায় এটি চেয়েছেন, নাকি রুকুর অবস্থায় এটি চেয়েছেন, নাকি বসা অবস্থায় এটি চেয়েছেন? না! বরং তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় এটি চেয়েছেন। আর এটি রুকুর পূর্বে এবং রুকুর পরে দাঁড়ানোকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং আলিমগণের মাঝে এ মতভেদের কারণে আমাদের দ্বন্দ্ব ও বির্তকের পথ গ্রহণ না করা আবশ্যক। কেননা আমরা সকলেই হক্ব চাই। বিদ্বানগণের মাঝে মতভেদের কারণে আমাদের শত্রুতা ও দলাদলির পথ গ্রহণ করা বৈধ হবে না। কেননা আলিমগণ মতভেদ করতেই থাকবেন। এমনকি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগেও (এটি হয়েছে)।

সুতরাং সকল শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক হলো, তারা সকলেই মিলে এক হাত হবে এবং তারা এই মতভেদের মত পারস্পারিক বিচ্ছন্নতা ও শত্রুতার পথ বানাবে না। বরং ওয়াজীব হলো: যখন তুমি দলীলের দাবিতে তোমার সঙ্গীর সাথে মতভেদ করবে এবং সে (তার) দলীলের দাবিতে তোমার সাথে মতভেদ করবে, তখন তোমাদের নিজেদেরকে একই পথের উপর রাখা এবং তোমাদের দু’জনের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি করা।

আর একারণেই আমি এমন যুবকদেরকে ভালবাসি এবং সাহায্য করি, বর্তমানে যাদের রয়েছে দলীলসমূহ সহকারে মাসআলাগুলো একত্রিত করার প্রতি কঠিন ঝোঁক এবং যাদের রয়েছে তাদের ‘ইল্‌মকে আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ অনুযায়ী গঠন করার প্রতি কঠিন ঝোঁক। আমরা লক্ষ্য করে দেখি এটিই উত্তম। আর আমরা তাদের থেকে এটি কামনা করি না যে, তারা ‘ইল্‌মকে দলবদ্ধতা এবং শত্রুতার পথ বানাবে। আল্লাহ তার নাবী মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾

“নিশ্চয় যারা তাদের দীনের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, কোন ব্যাপারেই আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন”। সূরা আল-আন‘আম ৬:১৬৯।

[১৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪০, মুয়াত্তা মালিক হা/৩৭৬।

সুতরাং যারা তাদের নিজেদেরকে বিভিন্ন দলে নিয়োজিত করে এবং বিভিন্ন দলে দলভুক্ত হয়, এ ব্যাপারে আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না। কেননা আল্লাহর দল একটিই। আর আমরা মনে করি যে, বুঝের ভিন্নতা মানুষের একে অপরকে ঘৃণা করাকে এবং তাদের কেউ তার ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করবে, এটিকে অপরিহার্য করে না। অতএব, সকল শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য হলো পরস্পর ভাই হয়ে যাওয়া। এমনকি যদিও তারা কিছু শাখাগত মাসআলাহর ক্ষেত্রে মতভেদ করে। আর প্রত্যেকের উপর দায়িত্ব হলো একে অপরকে এমন বিতর্কে আহ্বান করা, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় এবং 'ইলম বিস্তৃত হয়। আর এর মাধ্যমে ভালোবাসা/বন্ধুত্ব অর্জিত হয় এবং ভুল-ভ্রান্তি ও এমন কঠোরতা দূর হয়ে যায়, যা কিছু মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি কখনো কখনো তাদের মাঝে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। আর কোন সন্দেহ নেই যে, এতে মুসলিমদের শত্রুরা খুশি হয়। আর (মুসলিম) উম্মাহর মাঝে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَطِيْعُوْا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"আর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব করো না, (যদি কর) তাহলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি দূর হয়ে যাবে। অতএব, তোমরা (শত্রুদের মুকাবেলায়) ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহর (সাহায্য) ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছে"। সূরা আল-আনফাল ৮:৪৬।

ছাহাবাহগণ এ ধরনের মাসআলায় মতানৈক্য করতেন। কিন্তু তারা এক হৃদয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ভালোবাসা ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। বরং আমি সুস্পষ্টভাবে বলব,

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَالَفَكَ بِمُقْتَضِى الدَّلِيْلِ عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ مُوَافِقٌ لَكَ فِي الْحَقِيْقَةِ. لِأَنَّ كُلاًّ مِنْكُمَا طَالِبٌ لِلْحَقِيْقَةِ.

"যখন কোনো ব্যক্তি তার নিকটে বিদ্যমান দলীলের দাবিতে তোমার সাথে মতানৈক্য করে, তখন বাস্তবে সে ব্যক্তি তোমার সাথে একমত হয়। কেননা বাস্তবিকভাবে তোমাদের দু'জনের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই ('ইল্‌ম) অন্বেষণকারী।"

তাই, উদ্দেশ্য একটিই। আর তা হলো দলীলের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া। অতএব, যতক্ষণ তুমি দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ সে ব্যক্তি তোমার সাথে মতানৈক্য করবে না। কেবলমাত্র সে ব্যক্তি তার নিকটে বিদ্যমান দলীলের দাবিতে তোমার সাথে মতানৈক্য করে। তাহলে মতবিরোধ কোথায়? আর এই পদ্ধতিতেই (মুসলিম) উম্মাহ এক থাকে। যদিও মুসলিম উম্মাহর নিকট বিদ্যমান দলীল প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে কিছু মাসআলাহর ক্ষেত্রে তারা মতানৈক্য করে। পক্ষান্তরে, যদি কেউ সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর পরস্পর বিরোধিতা করে ও অহংকার করে, তাহলে নিঃসন্দেহে পারস্পারিক বিরোধিতার পর তার সাথে উপযুক্ত আচরণ করা অপরিহার্য।

পঞ্চম আদেশ: ‘ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা (العمل بالعلم):

একজন শিক্ষার্থী ‘আক্বীদা, ইবাদত, চরিত্র, শিষ্টাচার এবং মু‘আমালাত (লেনদেন) এর ক্ষেত্রে তার ‘ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করবে। কেননা আমলই ‘ইল্‌মের প্রতিফল ও ফলাফল। আর ‘ইল্‌মের অধিকারী ব্যক্তি অস্ত্র বহনকারী ব্যক্তির ন্যায়। হয় এটি ঐ ব্যক্তির পক্ষে যাবে অথবা বিপক্ষে যাবে। আর এ কারণেই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

اَلْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ

“আল-কুরআন তোমার পক্ষে দলীল হবে অথবা তোমার বিপক্ষে দলীল হবে”।[১৭]

যদি তুমি আল-কুরআন অনুযায়ী আমল কর, তাহলে তা তোমার পক্ষে দলীল হবে। আর যদি তুমি আল-কুরআন অনুযায়ী আমল না কর, তাহলে তা তোমার বিপক্ষে দলীল হবে। অনুরূপভাবে আমল হবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা অনুযায়ী হাদীছগুলোকে স্বীকার করার মাধ্যমে এবং (ইসলামী) বিধানাবলী মেনে চলার মাধ্যমে। যখন আল্লাহ ও তার রসূল থেকে কোন সংবাদ আসবে, তখন তা স্বীকার করো এবং গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তা আঁকড়ে ধরো। আর (এ কথা) বলো না কেন? এবং কিভাবে? এটি কাফিরদের পন্থা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[১৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৩।

﴿وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

“যখন আল্লাহ এবং তার রসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ এবং কোন মুমিনাহ নারীর তাদের সেই বিষয়ে কোন স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না। আর যদি কেউ আল্লাহ এবং তার রসূলের অবাধ্য হয়, তাহলে সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে”। সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৬।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবাগণের নিকট কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কখনো কখনো সে বিষয়গুলো বিস্ময়কর হতো এবং ছাহাবাগণের “বুঝ” থেকে দূরবর্তী হতো। কিন্তু তারা তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতেন। তারা বলতেন না, কেন? এবং কিভাবে? এটি এই উম্মাহর পরবর্তী লোকেরা যে মতের উপর রয়েছে তার বিপরীত। (এই উম্মাহর) পরবর্তী লোকদের মধ্য থেকে আমরা কোন এক ব্যক্তিকে দেখতে পায়, হাদীছ সম্পর্কে যার বোধশক্তি কম। যখন তার নিকট রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন একটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়, তখন তাকে আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর বিরুদ্ধে এমন কিছু কথা উল্লেখ করতে দেখতে পায়, যে কথাগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, সে ব্যক্তি প্রতিবাদ করার ইচ্ছা করে, সঠিক পথ পাওয়ার ইচ্ছা করে না। আর এই কারণেই তার মাঝে এবং সঠিক দিক-নির্দেশনার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এমনকি সে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীছ প্রত্যাখ্যান করে। কেননা সে ব্যক্তি হাদীছটি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেনি এবং মেনে নেয়নি। আর আমি এ কারণেই একটি উদাহরণ পেশ করছি:

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

“আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ) প্রত্যেক রাত্রে দুনিয়াবী আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর বলেন, কে আমাকে ডাকবে, তার ডাকে আমি সাড়া দিব? কে আমার নিকট (কিছু) চাইবে,

আমি তাকে (তা) দান করব? কে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব?”[১৮]

এই হাদীছ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন। এটি প্রসিদ্ধ হাদীছ। বরং এটি মুতাওয়াতির হাদীছ। আর ছাহাবাগণের মধ্য থেকে কেউ তার জবান উঁচু করেননি এ কথা বলার জন্য যে, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে আল্লাহ অবতরণ করেন? আর তার থেকে কি ‘আরশ খালি হয়ে যায়, নাকি ‘আরশ খালি হয়ে যায় না? এবং এর সাথে যে প্রশ্নগুলো সাদৃশ্য রাখে (সেগুলো প্রশ্নও করেননি)।

কিন্তু আমরা কিছু মানুষকে দেখতে পায়, যারা এ ধরনের কথা বলে। আর বলে কিভাবে আল্লাহ ‘আরশের উপর থাকেন এবং কিভাবে দুনিয়াবী আসমানে অবতরণ করেন? আর যে কথাগুলো তারা উল্লেখ করে, সেগুলোর মধ্য থেকে যা এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। যদিও তারা এই হাদীছটি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে। আর ছাহাবাগণ বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তার ‘আরশের উপর সমুন্নত। আর সমুন্নত হওয়া তার সত্তাগত বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন, যেন তাদের থেকে এই সন্দেহ দূর হয়ে যায়। আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতিপালক সম্পর্কে তাদেরকে যে সংবাদ দেন, সে ব্যাপারে তারা হতভম্ব হন না।

অতএব, আমাদের উপর আবশ্যক হলো আল্লাহ তার সম্পর্কে এবং তার রাসূল সম্পর্কে অদৃশ্যের যে বিষয়গুলোর সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলো আমাদের দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়া এবং আমাদের স্মরণশক্তিতে যে অনুভবযোগ্য ও সুস্পষ্ট বিষয় রয়েছে, তার কারণে সেগুলোর বিরোধিতা না করা। কেননা অদৃশ্যের বিষয় অনুভূতি এবং সুস্পষ্টতার ঊর্ধ্বতম বিষয়। এ ব্যাপারে অনেকগুলো উদাহরণ রয়েছে। আমি সেগুলোর আলোচনা দীর্ঘ করা পছন্দ করছি না। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের বর্ণনাগুলো থেকে বুঝা যায় মুমিনের নীতি হলো: এমনভাবে গ্রহণ করা এবং মেনে নেওয়া যে, একজন মুমিন ব্যক্তি বলবেন, আল্লাহ এবং তার রসূল সত্য বলেছেন। যেমন এ সম্পর্কে আল্লাহ তার বাণীতে সংবাদ দিয়ে বলেন,

[১৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৩৩১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৫৯।

“রসূলের নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার প্রতি রসূল বিশ্বাস স্থাপন করেছেন”। *সূরা আল-বাক্বারা ২:২৮৫*

আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) ও তার রাসূলের সুন্নাহর ব্যাপারে ‘আক্বীদা ভিত্তিশীল হওয়া অপরিহার্য এবং মানুষের এটি জানা অপরিহার্য যে, ‘আক্বীদার ক্ষেত্রে বিবেকের জন্য (নতুন কিছু অনুধাবন করার) কোন অবকাশ নেই। আমি বলব না ‘আক্বীদার ক্ষেত্রে বিবেকের জন্য কোন প্রবেশস্থল নেই। কেবলমাত্র আমি বলব ‘আক্বীদার ক্ষেত্রে বিবেকের জন্য (নতুন কিছু অনুধাবন করার) কোন অবকাশ নেই। কেননা আল্লাহর পূর্ণতার ক্ষেত্রে যে দলীলগুলো বর্ণিত হয়েছে, বিবেক (শুধুমাত্র) সেগুলোর সাক্ষ্য প্রদান করে। যদিও আল্লাহর জন্য যে পরিপূর্ণতা অপরিহার্য, বিবেক তার বিস্তারিত বর্ণনা বুঝতে পারে না। কিন্তু এটি বুঝতে পারে যে, অবশ্যই আল্লাহ তার নিজের জন্য প্রত্যেক পরিপূর্ণ গুণ প্রমাণিত করেছেন। ‘আক্বীদার দিক থেকে আল্লাহ প্রদত্ত এই ‘ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। অনুরূপভাবে ইবাদতের দিক থেকে আল্লাহর ইবাদত করা অপরিহার্য। যেমন আমাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোক জানে যে, ইবাদত দু’টি মূল বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল।

ক. আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়া।
খ. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করা।

অতএব, আল্লাহ তা‘আলা এবং তার রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা অনুযায়ী মানুষ তার ইবাদত প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহর দীনের মাঝে মানুষ বিদ‘আত সৃষ্টি করবে না, যা ইবাদতের মূল ভিত্তির ক্ষেত্রে এবং ইবাদতের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এই কারণে আমরা বলব: ইবাদতের অস্তিত্ব, স্থান, সময়, নিয়মনীতি, পরিমাণ এবং ধরনের ক্ষেত্রে ইবাদতটি শরী‘আত (ইসলামী বিধি-বিধান) দ্বারা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।

সুতরাং যদি কেউ আল্লাহর ইবাদতের জন্য (আল-কুরআন ও হাদীছের) দলীল ছাড়াই নিয়মসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি নিয়ম সাব্যস্ত করে, তাহলে এ ব্যাপারে আমরা তার প্রতিবাদ করব এবং বলব: নিশ্চয় এটি অগ্রহণযোগ্য। কেননা এটি এভাবে সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক যে, এটি অমুক ইবাদতের নিয়ম। নতুবা এটি তার পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি কেউ কোন একটি ইবাদতের নিয়ম চালু করে, যে নিয়ম শরী‘আত নিয়ে আসেনি; তাহলে আমরা বলব: নিশ্চয় এটি তোমার জন্য প্রত্যাখ্যাত। কেননা (ইসলামী) শরী‘আত যা নিয়ে এসেছে, ইবাদত তার উপর ভিত্তিশীল হওয়া আবশ্যক। কেননা আল্লাহ

তা‘আলা তোমাকে যে ‘ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছেন তার দাবি এটিই যে, যা বিধান হিসেবে দেওয়া হয়েছে তা অনুযায়ী তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে। আর এ কারণেই আলিমগণ বলেছেন:

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ الْحَظْرُ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيْلٌ عَلَى الْمَشْرُوْعِيَّةِ

“নিশ্চয় ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো তা (ইবাদত করা) নিষেধ, যতক্ষণ না (ইবাদতটির) বৈধতার ব্যাপারে একটি দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়”।

আর তারা এই ব্যাপারে আল্লাহর বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾

“বরং তাদের (মক্কার কাফিরদের) কি এমন কতিপয় অংশীদার (উপাস্য) আছে, যারা তাদের জন্য এমন (বাতিল) ধর্মের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?” সূরা আশ-শূরা ৪২:২১।

এবং তারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন, যা আয়িশা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর বর্ণিত হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ মুসলিমে প্রমাণিত হয়েছে,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“যদি কেউ আমাদের এই দীনের মধ্যে বিদ‘আত সৃষ্টি, যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়; তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।”[১৯]

যদিও তুমি একনিষ্ঠ বান্দা হও এবং আল্লাহর নিকটে পৌঁছার ইচ্ছা কর (অতঃপর বিদ‘আত কর, তবুও এটি দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়)। কেননা এটি তোমার জন্য প্রত্যাখ্যাত। আর যদি তুমি এমন পথে আল্লাহর নিকটে পৌঁছার ইচ্ছা কর, আল্লাহ যে পথকে তার নিকটে পৌঁছার পথ হিসেবে নির্ধারণ করেননি, তাহলে এটিও তোমার জন্য প্রত্যাখ্যাত। অতএব শরী‘আতের (ইসলামী বিধি-বিধানের) জ্ঞানানুপাতে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য ইবাদতকারী হওয়া একজন শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক। আর শরী‘আতের জ্ঞান বাড়েও না, কমেও না। একজন শিক্ষার্থী (এই কথা) বলবে না, নিশ্চয় আমি এমন বিষয়ের কারণেই আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য ইবাদত করার ইচ্ছা পোষণ করছি, যার প্রতি আমার অন্তর আস্থা রাখে, প্রশান্তি

[১৯] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

লাভ করে এবং যার দ্বারা আমার বক্ষ প্রসারিত হয়। যদিও এটি তার অর্জিত হয়। সে যেন এটিকে শরী‘আতের মানদন্ডে যাচাই করে। পক্ষান্তরে, কখনো কখনো তার নিকটে তার মন্দ কর্মকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾

“অতঃপর যার নিকটে তার মন্দ কর্মকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপর সে এটিকে উত্তম মনে করেছে (এই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির সমান, যাকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখিয়েছেন?)। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন।” সূরা ফাতির ৩৫:৮।

অনুরূপভাবে আখলাক (চরিত্র) এবং মু‘আমালাত (লেনদেন) এর ক্ষেত্রে একজন ছাত্রের তার ‘ইল্‌ম অনুযায়ী আমলকারী হওয়া আবশ্যিক। আর শার‘ঈ ‘ইল্‌ম (ইসলামী বিধিসম্মত জ্ঞান) মুমিনগণের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং উত্তম ভালোবাসা সংবলিত প্রত্যেক উৎকৃষ্ট চরিত্রের দিকে আহ্বান করে। এমনকি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।”[২০]

তিনি ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

“যদি কেউ নিজেকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা এবং জান্নাতে প্রবেশ করানোকে পছন্দ করে, তাহলে তার নিকটে যেন তার মৃত্যু আসে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে। আর সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে, যে আচরণ সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।”[২১]

---

[২০] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩।

[২১] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৪।

আর অধিকাংশ মানুষের উপকারের আগ্রহ এবং ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের চরিত্রের কারণে তাতে সক্ষম হয় না। আমরা দেখতে পায় তাদের মধ্যে কঠোরতা রয়েছে। এমনকি আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে কঠোরতা করতে দেখতে পায়। আর এটি ঐ চরিত্রসমূহের বিপরীত, যে চরিত্রসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। আরও জেনে রাখো যে, যা আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়, উত্তম চরিত্র তার অন্তর্ভুক্ত। আর সর্বোত্তম মানুষ হলেন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মর্যাদার দিক দিয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবচেয়ে নিকটতম মানুষ হলেন চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি। যেমন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَ إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَ أَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَ المُتَشَدِّقُونَ وَ المُتَفَيْهِقُونَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَ المُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ

নিশ্চয় আমার নিকটে তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে পছন্দনীয় এবং কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নৈকট্যশীল ব্যক্তি হলেন তোমাদের মধ্য থেকে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি। আর আমার নিকটে তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন স্থানের দিক দিয়ে সবচেয়ে দূরবর্তী ব্যক্তি হলো বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং ‘আল-মুতাফাইহিকূন’। ছাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহর রসূল, অবশ্যই আমরা বাচাল এবং ধৃষ্ট-নির্লজ্জ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তাহলে ‘আল-মুতাফাইহিকূন’ কারা? তিনি বললেন: ‘অহংকারীরা’।[২২]

ষষ্ঠ আদেশ: আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া (الدعوة إلى الله):

একজন শিক্ষার্থী তার ‘ইল্‌ম অনুযায়ী (মানুষকে) আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী (দাঈ) হবে। সে প্রতিটি সুযোগেই মসজিদে, বিভিন্ন মজলিসে এবং হাটে-বাজারে (দীনের) দাওয়াত দিবে। আল্লাহ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবুওয়াত এবং রিসালাত প্রদানের পরে তিনি তার বাড়িতে বসে থাকতেন না। বরং প্রতিটি সুযোগেই তিনি লোকদেরকে (দীনের) দাওয়াত দিতেন এবং পদক্ষেপ দিতেন। আর আমি সকল শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে এটি চাই না যে, তারা কিতাবসমূহের প্রতিলিপি হবে। বরং আমি তাদের পক্ষ থেকে এটি চাই যে, তারা কর্মঠ আলিম হবে।

---

[২২] সুনান আত-তিরমিযী হা/২০১৮।

সপ্তম আদেশ: প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা (الحكمة):

একজন শিক্ষার্থী প্রজ্ঞার সাজে সজ্জিত হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

“তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়”। সূরা আল-বাক্বরা ২:২৬৯।

যে চরিত্রের দ্বারা চরিত্রবান হওয়া যায়, তা অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী অন্যের শিক্ষক হবে। যেন সে প্রত্যেক মানুষকে যোগ্যতা অনুযায়ী (দীনের পথে) আহ্বান করতে পারে। আর যখন আমরা এই পথে চলব, তখন আমাদের জন্য অনেক কল্যাণ অর্জিত হবে। যেমন আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ তা‘আলা) বলেন,

﴿وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

“আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়।” সূরা আল-বাক্বরা ২:২৬৯।

আর হাকীম এর পরিচয়: “হাকীম হলেন তিনি, যিনি বিভিন্ন জিনিসকে সেগুলোর নিজ নিজ অবস্থানে নামিয়ে দেন।”

কেননা “হাকীম” শব্দটি (اَلْإِحْكَامُ) মাছ্দার থেকে গৃহীত এবং তার অর্থ হলো: দক্ষতা। আর কোনকিছুর দক্ষতা হলো: তাকে তার অবস্থানে নামিয়ে দেওয়া। অতএব, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য উচিত হলো, বরং অপরিহার্য হলো সে তার দাওয়াতের ক্ষেত্রে হাকীম/প্রজ্ঞাবান হবে। আর আল্লাহ তার বাণীতে দাওয়াত প্রদানের স্তরসমূহ উল্লেখ করেছেন।

﴿اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ﴾

“(হে রসূল!) আপনি (মানুষকে) আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে হিকমাহ/প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে বিতর্ক করুন।” সূরা আন-নাহল; ১৬:১২৫।

আল্লাহ তা‘আলা গ্রন্থধারী (ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান) দের সাথে বিতর্ক করার ক্ষেত্রে ৪র্থ স্তর উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾

"তোমরা গ্রন্থধারী (ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান) দের সাথে উত্তমভাবে বিতর্ক করো। তবে তাদের মধ্য থেকে যারা সীমালঙ্ঘন করে (তাদের সাথে কোন বিতর্ক নেই)।" সূরা আল-'আনকাবূত ২৯:৪৬।

অতএব, একজন শিক্ষার্থী দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতিসমূহের মধ্য থেকে গ্রহণীয়তার অধিক নিকটবর্তী পদ্ধতিকে বেছে নিবে।

আর এর দৃষ্টান্ত নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **এর দাওয়াত প্রদানের মধ্যেই রয়েছেঃ**

এক বেদুঈন (আরবের এক গ্রাম্য) লোক আসল। তারপর মসজিদের এক কোণে পেশাব করল। অতঃপর তার নিকটে ছ্বা'হাবাহ্গণ আসলেন তাকে ধমক দেওয়ার জন্য। তারপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে (ধমক দিতে) নিষেধ করলেন। আর যখন সে লোক পেশাব শেষ করল, তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا تُبْنَى لِذِكْرِ اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ، وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

"নিশ্চয় এসব মসজিদ এই পেশাব এবং ময়লা জিনিসের কারণে পবিত্র থাকে না। কেবলমাত্র এসব মসজিদ আল্লাহর যিক্‌র করা, ছ্বলাত আদায় করা এবং আল-কুর্‌আন তিলাওয়াত করার জন্য তৈরি করা হয়।"[২৩]

অথবা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি মনে কর এই হিকমার চেয়ে অধিকতর উত্তম কিছু আছে? তারপর এই বেদুঈন লোকের বক্ষ প্রসারিত হলো এবং পরিতৃপ্ত হলো। এমনকি সে বলল,

﴿اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَ مُحَمَّداً، وَ لَا تَرحَمْ مَعَنَا أَحَداً﴾

"হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতি এবং মুহাম্মাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আর আমাদের সাথে কাউকে অনুগ্রহ করবেন না।"[২৪]

---

[২৩] ছ্বহীহঃ মুসলিম হা/২৮৫, মুনাদে আহমাদ ৩/১৯১।
[২৪] ছ্বহীহঃ সুনান আবূ দাউদ হা/৩৮০।

আরেকটি ঘটনা হলো: মু‘আবিয়াহ বিন হাকাম আস-সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ، مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَ التَّكْبِيرُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

“একদা আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছ্বলাত আদায় করলাম। যখন জামা‘আতের এক লোক হাঁচি দিল, তখন আমি বললাম: **يَرْحَمُكَ اللهُ** (আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন)। অতঃপর জামা‘আতের লোকেরা আমার দিকে রুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তারপর আমি বললাম: হায়! আমার মা সন্তান হারানোর শোক অনুভব করুক। তোমাদের কি অবস্থা? তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে আছো? তখন তারা তাদের উরুর উপর তাদের হাত চাপড়াতে শুরু করল। অতঃপর (আমার রাগ হওয়া সত্ত্বেও) যখন আমি তাদেরকে দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চায়, তখন আমি চুপ করলাম। অবশেষে যখন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বলাত আদায় (শেষ) করলেন, (তখন আমি তাকে সব কিছু বললাম)। আমার পিতা ও মাতা তার জন্য কুরবান হোক! আমি তার পূর্বে ও পরে এমন কোন শিক্ষককে দেখিনি, যিনি তার চেয়ে শিক্ষাদানের দিক দিয়ে উত্তম। অতএব, আল্লাহর কসম! (আমার কথা শুনে) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ধমক দেননি, প্রহার করেননি এবং তিরস্কার করেননি। বরং তিনি বলেছেন: নিশ্চয় ছ্বলাতে মানুষের কোন কথা বলা উচিত নয়। কেবলমাত্র ছ্বলাতে তাসবীহ পাঠ করা, তাকবীর দেওয়া এবং আল-কুরআন তিলাওয়াত করা চলবে।”[২৫]

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রদান হিকমার (প্রজ্ঞার) সাথে হওয়া অপরিহার্য; যেমনভাবে আল্লাহ তা‘আলা আদেশ দিয়েছেন।

---

[২৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩৭।

আর একটি দৃষ্টান্ত হলো: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন। এমতাবস্থায় তার হাতে স্বর্ণের আংটি ছিল। আর স্বর্ণের আংটি পুরুষদের জন্য হারাম। তাই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত থেকে আংটি খুলে ফেললেন এবং তা নিক্ষেপ করলেন। আর তিনি বললেন,

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ

“তোমাদের কেউ কেউ আগুনের টুকরার কাছে যায়। তারপর সে ব্যক্তি তার হাতে তা রাখে।[২৬]

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে যাওয়ার পর তাকে বলা হলো: তুমি তোমার আংটি তুলে নাও এবং তা দ্বারা উপকার গ্রহণ করো। লোকটি বলল: না, আল্লাহর কসম! আমি তা কক্ষনোই তুলে নিব না। (কেননা) অবশ্যই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিক্ষেপ করেছেন”।

এখানে নির্দেশের ধরণ হলো কঠিন। আল্লাহর দিকে প্রত্যেক দাওয়াত প্রদানকারীর জন্য উচিত হলো সকল বিষয়কে সেগুলোর নিজস্ব স্থানে স্থান দেওয়া এবং সকল মানুষকে সমান মনে না করা। আর বর্তমানে অধিকাংশ দাঈ যে অবস্থার উপর রয়েছেন, সে সম্পর্কে যখন আমরা চিন্তা করি; তখন আমরা বুঝতে পারি যে, তাদের কাউকে আবেগ পাকড়াও করেছে। এমনকি মানুষ তার দাওয়াত থেকে দূরে সরে যায়। যদি কোন ব্যক্তি কাউকে তার আবেগের কারণে কোন হারাম কাজ করতে দেখতে পায়, তাহলে সে ব্যক্তি তার কঠিন ও চরম নিন্দা করে এবং বলে, তুমি আল্লাহকে ভয় কর না এবং এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আরও অনেক কথা বলে। এমনকি লোকটি তার থেকে দূরে চলে যায়। আর এটি ঠিক নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: মানুষ যখন এ ধরনের লোকদের দিকে লক্ষ্য করে, তখন তাদেরকে বাচাল মনে করে। তাদের উপর হতবুদ্ধিতা কর্তৃত্ব করে এবং শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়। কেননা শয়তান তাদের প্রতি বিনয়ী হয়, তাদেরকে অনুগ্রহ করে এবং যা দ্বারা লোকদেরকে বিপদে ফেলা যায়, শয়তানকে তা দান করার কারণে শয়তান আল্লাহর প্রশংসা করে। ঐ লোকদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তরশক্তি রয়েছে। কিন্তু তাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তরশক্তি তাদের কোন উপকারে আসে না। হে ভাইয়েরা! পাপীদের দিকে দু’টি দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা আমাদের উচিত। (১) শার‘ঈ দৃষ্টিতে। (২) ভাগ্যের দৃষ্টিতে

[২৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৯১, ইবনে হিব্বান হা/১৫।

শার'ঈ দৃষ্টিতে বলতে বোঝায়: আল্লাহর দীনের ব্যাপারে কোন নিন্দাকারীর নিন্দা যেন আমাদেরকে পাকড়াও না করে। যেমন ব্যভিচারিণী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

"ব্যভিচারিণী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষের মধ্য থেকে প্রত্যেককে একশতটি বেত্রাঘাত করো এবং আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে তাদের দু'জনের প্রতি কোন দয়া তোমাদেরকে যেন পাকড়াও না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর"। সূরা আন-নূর ২৪:২।

আর পাপীদের দিকে আমরা শারঈ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করব। অতঃপর তাদের প্রতি আমরা অনুগ্রহ করব, তাদের প্রতি সদয় হব এবং তাদের সাথে ভাল আচরণ করব। আর এটি হলো একজন 'ইল্‌ম অন্বেষণকারীর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য থেকে একটি বৈশিষ্ট্য। যা একজন মূর্খ লোকের বৈশিষ্টের বিপরীত, যার আবেগ রয়েছে, কিন্তু 'ইল্‌ম নেই। অতএব, আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রদানকারী একজন শিক্ষার্থীর 'হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ব্যবহার করা অপরিহার্য।

অষ্টম আদেশ: 'ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর ধৈর্যশীল হওয়া (أن يكون الطالب صابراً على العلم): একজন ছাত্র 'ইল্‌ম অর্জন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং বিরক্ত হবে না। বরং সক্ষমতা অনুযায়ী 'ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে অটল থাকবে। আর সে যেন 'ইল্‌ম অজনের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে এবং বিরক্ত না হয়। কেননা যখন কোন লোক বিরক্ত হয়, তখন সে লোক ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কাজ ছেড়ে দেয়। কিন্তু যখন সে 'ইল্‌ম অজনের ব্যাপারে অধ্যবসায়ী হবে,তখন সে একদিক থেকে ধৈর্যশীলগণের মত ছাওয়াব পাবে, অপরদিক থেকে ভাল ফল হবে। অতএব, তুমি আল্লাহর বাণী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো, যা তার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্বোধন করে বলেছেন,

﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾

"এটি অদৃশ্যের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আপনার নিকটে প্রত্যাদেশ পাঠাচ্ছি, যা এর পূর্বে আপনি এবং আপনার সম্প্রদায় জানত না। অতএব, আপনি

ধৈর্যধারণ ধারণ করুন। নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য”। সূরা হুদ ১১:৪৯।

নবম আদেশ: ‘আলিমগণকে সম্মান এবং মূল্যায়ন করা (احترام العلماء وتقديرهم):

নিশ্চয় ‘আলিমগণকে সম্মান করা এবং মূল্যায়ন করা সকল শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য। ‘আলিমগণ এবং সাধারণ জনগণের মাঝে যে মতানৈক্য হয়, সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অন্তর প্রসারিত হওয়া আবশ্যিক। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা কিছু লোক অন্যদের ভুলগুলোর অনুসরণ করে, যেন ভুলগুলো থেকে এমন কিছু গ্রহণ করতে পারে, যা তাদের ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। আর মানুষের সাথে গণ্ডগোল করে। এটি সবচেয়ে বড় ভুলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর যখন একজন সাধারণ মানুষের ‘গিবত করা কাবীরাহ (বড়) গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, তখন একজন ‘আলিমের ‘গিবত করা সবচেয়ে বড় গুনাহ। একজন ‘আলিমের বিরুদ্ধে অপর একজন ‘আলিমের ‘গিবত করার ক্ষতি কম নয়। আর মানুষ যখন কোন ‘আলিমের ব্যাপারে উদাসীন হয় অথবা কোন ‘আলিম মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যান, তখন তার বাণী ও বাতিল হয়ে যায়। আর যখন কোন ‘আলিম হক্ব কথা বলেন এবং হক্বের দিকে দাওয়াত দেন, তখন এই ‘আলিমের ব্যাপারে কোন লোকের ‘গিবত মানুষের মাঝে এবং তার শারঈ ‘ইল্‌মের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আর এর ভয়াবহতা অনেক বড় এবং কঠিন।

আমি বলব: নিশ্চয় এসকল যুবকদের উপর অপরিহার্য হলো যে, ভাল নিয়্যাতে এবং ইজতিহাদের কারণে ‘আলিমগণের মাঝে যে মতানৈক্য চলে তা মেনে নেওয়া। আর ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ‘আলিমগণ যে ভুল করেন, সে ক্ষেত্রে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া। কোন প্রতিবন্ধকতা নেই যে, ‘আলিমগণ যা বিশ্বাস করেন সে ব্যাপারে যুবকরা তাদেরকে বলবে, আপনাদের বিশ্বাসটি ভুল। যেন ‘আলিমগণের নিকটে এটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভুলটি কি তাদের পক্ষ থেকে; নাকি যারা বলেছে: ‘আলিমগণ ভুল করেছেন, তাদের পক্ষ থেকে? কেননা মানুষ কখনো কখনো কল্পনা করে যে, ‘আলিমের কথাটি ভুল। অতঃপর বির্তকের পর ‘আলিমের নিকটে তার মতের সঠিকতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর মানুষ সর্ম্পকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

"প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর সর্বোত্তম ভুলকারী হলো তাওবাকারী"।[২৭]

একজন 'আলিমের ভুলের কারণে এবং মানুষের মাঝে ভুলটি ছড়িয়ে পড়ার কারণে খুশি হওয়া, তারপর বিভিন্ন দল সৃষ্টি হওয়া সালাফগণের পন্থা নয়। অনুরূপভাবে নেতাবর্গের পক্ষ থেকে যে ভুলগুলো হয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে নিন্দা করা থেকে মুক্ত থাকার জন্য সে ভুলগুলো ধরা এবং তাদের ভাল কাজগুলো উপেক্ষা করা আমাদের জন্য ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তার কিতাব (আল-কুরআন) এ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হক্বের উপর) প্রতিষ্ঠিত থাকো (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্য প্রদান করো। আর (কাফির) সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ যেন সুবিচার না করার ব্যাপারে তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে"। সূরা আল-মায়িদা ৫:৮।

অর্থাৎ (কাফির) সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন অন্যায়ভাবে কিছু করতে প্ররোচিত না করে। অতএব ন্যায়পরায়ণতা হলো অপরিহার্য বিষয়। আর নেতাবর্গের মধ্য থেকে অথবা 'আলিমগণের মধ্য থেকে কারও দোষ-ক্রুটি ধরা মানুষের জন্য বৈধ নয়। (যদি দোষ-ক্রুটি ধরা হয়) তাহলে সেগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। তারপর মানুষ নেতাবর্গের এবং 'আলিমগণের ভাল কাজ ও ভাল উপদেশ থেকেও বিরত থাকবে। সুতরাং, এটি ন্যায়পরায়ণতা নয়। আর এই বিষয়টিকে তোমার নিজের সাথে তুলনা করো। যদি কোন ব্যক্তি তোমার নিজের উপর কর্তৃত্ব করে; আর তোমার নিন্দা ও খারাপ কর্মসমূহ ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমার ভাল কর্মসমূহ গোপন থাকে; তাহলে তুমি এটিকে তার পক্ষ থেকে তোমার নিজের বিরুদ্ধে অপরাধ মনে করবে। অতএব, যখন তুমি তোমার নিজের ক্ষেত্রে এটিকে অপরাধ মনে করলে, তখন তোমার উপর অপরিহার্য হলো যে, অন্যের ক্ষেত্রেও তুমি এটিকে অপরাধ মনে করবে। সুতরাং, কত মানুষ বিতর্কের পর তার নিজের মত থেকে যার মত সঠিক, তার মতের দিকে ফিরে আসে। অথচ আমরা মনে করি, এটি ভুল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[২৭] সুনান আত-তিরমিযী; হা/২৪৯৯।

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“নিশ্চয় একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের জন্য প্রসাদস্বরূপ। যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।”[২৮]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

“যদি কেউ নিজেকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা এবং জান্নাতে প্রবেশ করানোকে পছন্দ করে, তাহলে তার নিকটে যেন তার মৃত্যু আসে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে। আর সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে, যে আচরণ সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।”[২৯] আর এটিই হলো ন্যায়পরায়ণতা এবং সততা।

দশম আদেশ: কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা (التمسك بالكتاب والسنة):

‘ইল্‌ম অর্জনের ব্যাপারে এবং এমন কিছু মূলনীতি আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে পূর্ণ আকাঙ্খা থাকা সকল শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। যদি একজন শিক্ষার্থী সেসব মূলনীতি দ্বারা আরম্ভ না করে, তাহলে তার কোনই সফলতা নেই। আর সে মূলনীতিগুলো হচ্ছে:

ক. আল-কুরআনুল কারীম (القران الكريم):

(কুরআন) তিলাওয়াত করা, মুখস্থ করা, বুঝা এবং এর প্রতি আমল করার দিক দিয়ে এর সাথে লেগে থাকা একজন শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য। কেননা আল-কুর্‌আন আল্লাহর মজবুত রশি, সকল জ্ঞানের মূলভিত্তি। সালাফগণ আল-কুরআনের সাথে চূড়ান্তভাবে লেগে থাকতেন। সুতরাং আল-কুর্‌আনের সাথে তাদের লেগে থাকার কারণে তাদের সম্পর্কে আশ্চর্যজনক বিষয় বর্ণনা করা হয়। অতএব তুমি তাদের কাউকে সাত বছর বয়স অবস্থায় এবং তাদের কাউকে এক মাসের কম সময়ে আল-কুর্‌আন মুখস্থ করতে দেখতে পাবে। আর এর মাঝে আল-কুর্‌আনের সাথে সালাফগণের আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে দলীল রয়েছে।

[২৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৮১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৮৫।
[২৯] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৪।

সুতরাং আল-কুর্আনের সাথে আঁকড়ে থাকা এবং একজন শিক্ষকের সাহায্যে তা মুখস্থ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক। কেননা শিক্ষা করার মাধ্যমেই তা অর্জন করা যায়। আর দুঃখজনক বিষয় হলো যে, আল-কুর্আন মুখস্থ করে না এমন কতিপয় শিক্ষার্থীকে তুমি দেখতে পাবে, এমনকি কতিপয় শিক্ষার্থী সুন্দরভাবে আল-কুর্আন তিলাওয়াত করে না। আর এটি 'ইল্ম অন্বেষণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি বড় ক্রটি। এ কারণে আমি পুনরাবৃত্তি করছি যে, আল-কুরআন মুখস্থ করা, এর প্রতি আমল করা, এর দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং 'সালাফে-ছ্বলেহগণের "বুঝ" অনুযায়ী তা বুঝা সকল শিক্ষার্থীর উপর অপরিহার্য।

খ. ছ্বহীহ সুন্নাহ (السنة الصحيحة):

এটি ইসলামী শরী'আতের দু'টি উৎসের দ্বিতীয়তম (উৎস)। আর এটি আল-কুর্আনুল কারীমকে ব্যাখ্যা করে। সুতরাং আল-কুরআনুলকারীম এবং ছ্বহীহ সুন্নাহর মাঝে সমন্বয় করা, এ দু'টির সাথে আঁকড়ে থাকা এবং সুন্নাহ সংরক্ষণ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক। হয় মূল হাদীছগুলো মুখস্থ করার মাধ্যমে অথবা হাদীছগুলোর সানাদ ও মতন (মূলভাষ্য) সম্পর্কে গবেষণা করার মাধ্যমে এবং য'ঈফ (দুর্বল) হাদীছ থেকে ছ্বহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীছকে পৃথক করার মাধ্যমে (সুন্নাহকে সংরক্ষণ করবে)। অনুরূপভাবে সুন্নাহর পক্ষ সমর্থন করার মাধ্যমে এবং সুন্নাহর ক্ষেত্রে বিদ'আতপন্থীদের সংশয়গুলোর জওয়াব দেওয়ার মাধ্যমেও সুন্নাহর সংরক্ষণ হয়। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক আল-কুর্আন ও ছ্বহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকা। আর এই দু'টি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য পাখির দু'টি ডানার মত। যখন এ দু'টি ডানা ভেঙ্গে যাবে, তখন পাখিটি উড়তে পারে না। এ কারণেই তুমি আল-কুর্আন থেকে অন্যমনস্ক হয়ে (শুধুমাত্র) আস-সুন্নাহকে রক্ষা করো না। অথবা তুমি আস-সুন্নাহ থেকে অন্যমনস্ক হয়ে (শুধুমাত্র) আল-কুরআনকে রক্ষা করো না। অধিকাংশ শিক্ষার্থী সুন্নাহ, এর ব্যাখ্যাসমূহ, এর রাবীগণ (বর্ণনাকারীগণ) এবং এর পরিভাষাগুলোর প্রতি পূর্ণ মনযোগ দেয়। কিন্তু তুমি যদি তাকে আল্লাহর কুর্আন থেকে কোন একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তাহলে অবশ্যই তুমি তাকে আয়াতটি সম্পর্কে অজ্ঞ দেখতে পাবে। আর এটি একটি বড় ক্রটি/ভুল। অতএব হে শিক্ষার্থী! আল-কুরআন এবং আস-সুন্নাহ তোমার জন্য দু'টি ডানা হওয়া অপরিহার্য।

গ. আলিমগণের বক্তব্য (كلام العلماء):

এটি তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব আলিমগণের বক্তব্যকে অবহেলা করো না এবং তা উপেক্ষা করো না। কেননা আলিমগণ ‘ইল্‌মের ক্ষেত্রে দক্ষতার দিক দিয়ে তোমার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। আর তাদের নিকটে (ইসলামী) শরী‘আতের নিয়ম-নীতি, তাৎপর্য এবং মূলনীতিসমূহ রয়েছে; যা তোমার নিকটে নেই। আর একারণেই যখন গবেষণাকারী সম্মানিত আলিমগণের নিকটে কোন ১টি মত অগ্রাধিকার পেত, তখন তারা বলতেন: যদি কেউ এরূপ বলে, তবুও আমরা এরূপ বলি না।

এজন্য আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং আলিমগণের বক্তব্যের সাহায্য নেওয়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যিক। আর আল-কুর্‌আন মুখস্ত করা, গবেষণা করা এবং আল-কুর্‌আন যা (বিধি-বিধান) নিয়ে এসেছে তার উপর আমল করার মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন (সম্পন্ন) হয়। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

“আমি এই কল্যাণময় গ্রন্থ আপনার নিকটে অবতীর্ণ করেছি, যেন তারা (লোকেরা) এর আয়াতসমূহ গবেষণা করে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ উপদেশ গ্রহণ করে”। সূরা ছ্বদ ৩৮:২৯।

{اَلتَّدَبُّرُ} শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে (আয়াতসমূহের) অর্থ বুঝা। আর {اَلتَّذَكُّرُ} শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আল-কুর্‌আনের প্রতি আমল করা। এই তাৎপর্যের কারণেই এই আল-কুর্‌আনটি নাযিল হয়েছে। আর যখন এই কারণে আয়াতটি নাযিল হলো, তখন আমরা আল-কুর্‌আন গবেষণা করার জন্য এবং এর অর্থসমূহ জানার জন্য কিতাব (আল-কুর্‌আন) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করব। অতঃপর আল-কুর্‌আন যা নিয়ে এসেছে তা মেনে চলব। আর আল্লাহর শপথ (করে বলছি)! নিশ্চয় এর মাঝে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

"তারপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে দিক-নির্দেশনা আসবে, তখন যে ব্যক্তি আমার দিক-নির্দেশনার অনুসরণ করবে; সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুর্ভাগ্যবান হবে না। আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে ব্যক্তির জন্য দুঃখময় জীবন রয়েছে। আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় পুনরুত্থিত করব"। সূরা ত্বহা ২০:১২৩-১২৪।

আর একারণেই তুমি মুমিনের চেয়ে অবস্থার দিক দিয়ে অধিকতর সুখী, অন্তরের দিক দিয়ে অধিকতর প্রশস্ত এবং অন্তরে প্রশান্তির দিক দিয়ে দৃঢ়তর কাউকে কখনোই খুঁজে পাবে না। এমনকি যদিও উক্ত মুমিন লোকটি দরিদ্র হয়। অতএব, একজন মুমিন সুখের দিক দিয়ে ও প্রশান্তির দিক দিয়ে সর্বাধিক শক্তিশালী এবং অন্তরের দিক দিয়ে সর্বাধিক প্রশস্ত। আর তোমরা যদি চাও, তা হলে আল্লাহর (এই) বাণীটি তিলাওয়াত করো,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

"পুরুষ এবং মহিলার মধ্য থেকে যদি কেউ মুমিন অবস্থায় সৎ আমল করে, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে সুখী জীবন দান করব এবং তারা যে আমল করত তার চেয়ে অধিকতর উত্তম পুরুষ্কার তাদেরকে দান করব"। সূরা আন-নাহল ১৬:৯৭।

প্রশ্ন: সুখী জীবন কী?

উত্তর: সুখী জীবন হলো: অন্তরের আনন্দ এবং মনের প্রশান্তি, এমনকি যদিও মানুষ গুরুতর দারিদ্রের মাঝে থাকে। কেননা এটি প্রশান্ত আত্মা, প্রফুল্ল অন্তর। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَد إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"মুমিনের বিষয় আশ্চর্যজনক। নিশ্চয় তার সকল কাজ সর্বাধিক কল্যাণকর। এটি মুমিন ছাড়া অন্য কারও জন্য হতে পারে না। যদি তার নিকটে সুখ-শান্তি এসে পড়ে, তাহলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অতএব, এটি তার জন্য কল্যাণকর।

আর যদি তার নিকটে দুঃখ-কষ্ট এসে পড়ে, তাহলে সে ধৈর্যধারণ করে। অতএব, এটি তার জন্য কল্যাণকর”।[৩০]

প্রশ্ন: যখন কাফিরের নিকটে দুঃখ-কষ্ট এসে পড়ে, তখন সে কি ধৈর্যধারণ করে?
উত্তর: না! বরং সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং দুনিয়া তার উপর চাপ দেয়। আর কখনো কখনো সে আত্মহত্যা করে। কিন্তু মুমিন ধৈর্যধারণ করে এবং আনন্দ ও প্রশান্তির মাধ্যমে ধৈর্যের স্বাদ পায়। আর একারণেই তার জীবন সুখী হয়। এব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার বাণীটি হচ্ছে,

﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾

তাহলে অবশ্যই আমি তাকে সুখী জীবন দান করব। সূরা আন-নাহল **১৬:৯৭**।

অতএব, একজন মুমিন যেখানেই থাকুক, (সেখানেই) কল্যাণের মধ্যে থাকে এবং সে ইহকালে ও পরকালে লাভবান হয়। আর একজন কাফির অকল্যাণের মধ্যে থাকে এবং সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

“মহাকালের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে (তারা নয়) যারা ঈমান আনে, সৎ আমল করে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়”। সূরা আল আছর **১০৩:১-৩**।

একাদশ আদেশ: [বিভিন্ন সংবাদ এবং বিভিন্ন বিধানের ব্যাপারে] নিশ্চিত হওয়া (التثبت والثبات): যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচারসমূহ দ্বারা সজ্জিত হওয়া একজন শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য, সেগুলোর মধ্য থেকে একটি শিষ্টাচার হলো; বর্ণিত সংবাদসমূহের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং প্রকাশিত বিধানসমূহের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। অতএব, যখন সংবাদগুলো বর্ণিত হবে: তখন প্রথমত এগুলোর ব্যাপারে এটি নিশ্চিত হওয়া অপরিহার্য যে, যার নিকটে উক্ত সংবাদগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো ছ্বহীহ নাকি ছ্বহীহ না? অতপর যখন সংবাদগুলো ছ্বহীহ হবে, তখন সংবাদগুলো বিধানে সাব্যস্ত হবে। কখনো কখনো তোমার শ্রুত

[৩০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৯৯ ছ্বহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৮৯৬।

বিধানটি কোনো একটি মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল, যে মূলনীতিটি তুমি জান না। ফলে তুমি ফাছসালা দাও যে, এই বিধানটি ভুল। অথচ বাস্তবতা হলো যে, এই বিধানটি ভুল নয়। তাহলে এই অবস্থায় সমাধান কিরূপ হবে?

সমাধান হলো: যার সাথে সংবাদটি সম্পৃক্ত, তার নিকটে তোমার যাওয়া এবং বলা: আপনার থেকে এরূপ এরূপ সংবাদ বর্ণিত হয়েছে। এটি কি ছ্বহীহ? তারপর তুমি তার সাথে বিতর্ক করবে। প্রথমবার তুমি যা শুনেছ, সে সম্পর্কে তোমার না জানার কারণে কখনো কখনো তার প্রতি তোমার বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। কেননা এই বর্ণনার মাধ্যম কি, তা তুমি জান না। আর বলা হয়ে থাকে:

إِذَا عُلِمَ السَّبَبُ بَطُلَ الْعَجَبُ

"যখন মাধ্যম জানা যায়, তখন বিস্ময় দূর হয়ে যায়।"

অতএব, প্রথমত আবশ্যিক হলো: সংবাদ এবং বিধানের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। এরপর যার থেকে সংবাদটি বর্ণিত হয়েছে, তার নিকটে তুমি যাবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে: এটি কি ছ্বহীহ নাকি ছ্বহীহ না? তারপর তুমি তার সাথে বিতর্ক করবে। যদি সে লোক হক্বের উপর এবং সঠিক মতের উপর থাকে, তাহলে তুমি তার মতের দিকে ফিরে যাবে। আর যদি সঠিকতা তোমার নিকটে থাকে, তাহলে সে লোকটি তোমার সঠিক মতের দিকে ফিরে আসবে।

এখানে, **اَلثَّبَاتُ** এবং **اَلتَّثَبُّتُ** শব্দ দু'টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই দু'টি শব্দ শব্দগতভাবে সমার্থবোধক, কিন্তু অর্থগতভাবে বিপরীত।

اَلثَّبَاتُ অর্থ হলো: ধৈর্যধারণ করা এবং অটল থাকা, বিরক্ত না হওয়া, অসন্তুষ্ট না হওয়া এবং প্রত্যেক কিতাব থেকে অথবা প্রত্যেক বিষয় থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করে তারপর তা পরিত্যাগ না করা। কেননা এটি একজন শিক্ষার্থীর ক্ষতি করে এবং কোন উপকারিতা ছাড়াই তার অনেক দিন কেটে যায়।

উদাহরণস্বরূপ: কিছু শিক্ষার্থী নাহু সম্পর্কে পড়াশোনা করে। একবার 'মাত্‌নুল আজরূমিয়্যাহ', একবার 'কত্বরুন নাদা' এবং একবার 'আলফিয়্যাহ ইবনু মালিক' পড়ে। অনুরূপভাবে একই সাথে মুছ্বত্বলাহুল হাদীছ সম্পর্কে পড়াশোনা করে। একবার 'নুখবাতুল ফিক্‌র' এবং একবার 'আলফিয়্যাতুল ইরাক্বী' পড়ে। ঠিক অনুরূপভাবে ফিক্‌হ সম্পর্কে পড়াশোনা করে। একবার 'যাদুল মুসতাক্বনি', একবার 'উম্‌দাতুল ফিক্‌হ', একবার 'মুগ্‌নী' এবং একবার 'শার্‌হুল মুহায্‌যাব'

পড়ে। প্রত্যেক কিতাবের ক্ষেত্রেই এমন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এভাবে একজন শিক্ষার্থী 'ইল্ম অর্জন করতে পারে না, যদিও সে ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারে। কেননা সে মাসআলাহগুলো শিক্ষা করে, কিন্তু নিয়ম-নীতি শিক্ষা করে না। আর শুধুমাত্র মাসআলাহগুলো শিক্ষা করা এমন জিনিসের মত, যা ফড়িং একটির পর একটি আহরণ করে। কিন্তু নিয়ম-নীতি শিক্ষা করা, সুদক্ষ হওয়া এবং (বিভিন্ন সংবাদের ব্যাপারে) নিশ্চিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, তুমি যে কিতাবগুলো পড় এবং অনুশীলন কর, সে কিতাবগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হও এবং যে শাইখগণের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর, তাদের সম্পর্কে নিশ্চিত হও। প্রতি সপ্তাহে এবং প্রতি মাসে কোন একজন শাইখের নিকটে শুধুমাত্র সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ো না। প্রথমত তুমি মনস্থ্ করো, কার নিকটে তুমি 'ইল্ম শিক্ষা করবে। অতঃপর যখন তুমি এটি মনস্থ্ করবে, তখন তুমি তা নিশ্চিত করো। আর তুমি তোমার জন্য প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতি মাসে একজন করে শাইখ নিযুক্ত করো না। ফিক্‌হের ক্ষেত্রে তোমার জন্য একজন শাইখ নির্ধারণ করবে এবং ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর সাথে লেগে থাকবে। নাহু'র ক্ষেত্রে অন্য একজন শাইখ নির্ধারণ করবে এবং নাহু বিষয়ে তাঁর সাথে লেগে থাকবে। 'আক্বীদাহ ও তাওহীদের ক্ষেত্রে আরেকজন শাইখ নির্ধারণ করবে এবং এই বিষয়ে তাঁর সাথে লেগে থাকবে। এগুলোর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, তুমি ('ইল্ম অর্জনের ক্ষেত্রে শাইখগণের কাছে) স্থির থাকবে, শুধুমাত্র স্বাদ আস্বাদন করবে না। আর তুমি তালাক্ব প্রদানকারী ঐ ব্যক্তির মত হবে না, যে ব্যক্তি কোন একজন মহিলাকে বিবাহ করল ও তার নিকটে কয়েকদিন অবস্থান করে তাকে তালাক্ব দিল এবং অন্য একজন মহিলার খোঁজে বের হলো।

"اَلتَّثَبُّتُ" (নিশ্চিত হওয়া)ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা কখনো কখনো বর্ণনাকারীদের খারাপ নিয়্যাত থাকে। আর কখনো কখনো তাদের খারাপ নিয়্যাত থাকে না। কিন্তু তারা উদ্দিষ্ট অর্থের বিপরীত বিষয় বুঝে। আর একারণেই (কোনো সংবাদের ব্যাপারে) নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং, যখন বর্ণিত বিষয়টি সানাদ (বর্ণনা সূত্র) সহকারে সাব্যস্ত হবে, তখন কোনো একজন ব্যক্তি কোনো বর্ণনার ব্যাপারে ভুল অথবা সঠিক ফায়সালা দেওয়ার পূর্বে তার ঐ সঙ্গীর সাথে বিতর্কের পর্যায়ে আসবে, যা থেকে বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি সানাদ সহকারে একারণে সাব্যস্ত হতে হবে যে, কখনো কখনো বিতর্কের মাধ্যমে তোমার নিকটে এটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে সঠিকতা ঐ ব্যক্তি সাথে রয়েছে, যার থেকে বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ, যার থেকে সংবাদটি বর্ণিত হয়েছে তার কথায় সঠিক)

সারাংশ হলো যে: যখন কোনো ব্যক্তির থেকে কোনো সংবাদ বর্ণিত হবে, যা তুমি মনে কর যে এটি ভুল; তখন তুমি ধারাবাহিক তিনটি পন্থা অবলম্বন করবে,

(১) সংবাদটির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে নিশ্চত হওয়া।

(২) বিধানটির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা। অতএব, বিধানটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে তার পক্ষ অবলম্বন কর। আর যদি বিধানটিকে তুমি ভুল দেখ, তাহলে তুমি সঠিক পন্থা অবলম্বন কর।

(৩) যার দিকে বর্ণনাটিকে সম্বোধন করা হয়েছে, তার নিকটে সে বর্ণনার ব্যাপারে বিতর্ক করার জন্য যাওয়া। আর এই বিতর্কটি যেন শান্তভাবে এবং সম্মানের সাথে হয়।

দ্বাদশ আদেশ: আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **এর উদ্দেশ্য বুঝার ব্যাপারে লেগে থাকা (الحرص على فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم):** 'ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্য বুঝা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা অধিকাংশ মানুষকে 'ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে (সঠিক) বুঝ দেওয়া হয় নি। (অতএব) বুঝা ছাড়া আল্লাহর কুরআন এবং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ থেকে যা সহজ, তা তোমার মুখস্ত করা যথেষ্ট নয়। আল্লাহ এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা উদ্দেশ্য করেছেন, তা আল্লাহ এবং তার রসূল থেকেই তোমার বুঝা আবশ্যক। কোনো কোনো দলের পক্ষ থেকে কতইনা ভুল সংঘটিত হয়! যে দলের লোকজন আল্লাহ এবং তার রসূলের উদ্দেশ্য ছাড়াই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে। এর ফলে পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি হয়।

আর এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছি। জেনে নাও! তা হলো- বুঝার ক্ষেত্রে যে ভুল হয়, তা কখনো কখনো অজ্ঞতার ভুলের চেয়ে কঠিন ঝুঁকিপূর্ণ হয়। কেননা অজ্ঞ ব্যাক্তি যখন তার না জানার কারণে ভুল করে, তখন সে জানে যে, সে জাহেল। ফলে সে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি যখন ভুল করে, তখন সে নিজে নিজে এই বিশ্বাস করে যে, সে একজন অভ্রান্ত আলিম এবং সে এটাও বিশ্বাস করে যে, এটিই আল্লাহ এবং তার রাসূলের উদ্দেশ্য।

আর একারণে আমরা কিছু উদাহরণ পেশ করব, যেন আমাদের নিকটে “বুঝ” এর গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রথম উদাহরণ: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَ دَاوُوْدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَ كُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُوْدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

“স্মরণ করো দাঊদ এবং সুলাইমানের কথা! যখন তারা শস্যক্ষেতের ব্যাপারে বিচার করছিল। যখন তাতে কোনো সম্প্রদায়ের মেষ রাতের বেলা ঢুকে পড়েছিল। আর আমি তাদের বিচার (কার্য) প্রত্যক্ষ করছিলাম। অতঃপর আমি সুলাইমানকে এবিষয়ের (সঠিক) বুঝ দিয়েছিলাম। আর আমি (তাদের) প্রত্যেকেই বিচারশক্তি এবং জ্ঞান দিয়েছিলাম। আর আমি পর্বতমালা এবং পাখিদেরকে (দাঊদের) অধীন করে দিয়েছিলাম, তারা দাঊদের সাথে তাসবী‘হ পাঠ করত। আর এসবকিছু আমিই করছিলাম। সূরা আল-আম্বিয়া; ২১:৭৮-৭৯।

আল্লাহ তা‘আলা এই বিচারের ক্ষেত্রে “বুঝ” এর কারণে দাঊদ (আলাইহিস সালাম) এর উপর সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) কে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহর বাণী: {অতঃপর আমি সুলাইমানকে এবিষয়ের (সঠিক) বুঝ দিয়েছিলাম}। কিন্তু এখানে দাঊদ (আলাইহিস সালাম) এর ‘ইল্‌মে কমতি নেই। যেমন আল্লাহর বাণী: {আর আমি (তাদের) প্রত্যেকেই বিচারশক্তি এবং জ্ঞান দিয়েছিলাম}। আর তুমি এই সম্মানিত আয়াতের দিকে লক্ষ্য করো, আল্লাহ যা উল্লেখ্য করেছেন। যার কারণে সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, তা হলো “বুঝ”। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা দাঊদ (আলাইহিস সালাম) এর ও শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “আর আমি পর্বতমালা এবং পাখিদেরকে (দাঊদের) অধীন করে দিয়েছিলাম, তারা দাঊদের সাথে তাসবী‘হ পাঠ করত”।

যেন তাদের দু’জনের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই সমান। তারপর তারা দু’জন যে ক্ষেত্রে একত্রিত হয়েছেন, আল্লাহ তা উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো: বিচারশক্তি এবং ‘ইল্‌ম। অবশেষে দু’জনের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই যে কারণে একে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, আল্লাহ তা উল্লেখ করেছেন। এই আয়াতটি আমাদের নিকট “বুঝ” এর গুরুত্বের উপর প্রমাণ করে। আর ‘ইল্‌ম অর্জনই সবকিছু নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ: যদি তোমার নিকটে দু'টি পাত্র থাকে। দু'টি পাত্রের একটিতে তীব্র গরম পানি থাকে এবং অপরটিতে তীব্র ঠান্ডা থাকে। এমতাবস্থায় ঋতু হলো শীতকাল। অতএব, কোনো এক লোক জানাবাত (শারীরিক অপবিত্রতা) এর গোসল করার উদ্দেশ্যে আসল। তারপর অপর একজন লোক বলল: ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা তোমার জন্য আবশ্যক। আর এটি একারণে যে, ঠান্ডা পানিতে কষ্ট রয়েছে। কেননা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ যার দ্বারা গুনাহসমূহ মুছে দেন এবং যার দ্বারা মর্যাদাসমূহ বৃদ্ধি করে দেন, আমি কি তোমাদেরকে সে ব্যাপারে সংবাদ দিব না? ছাহাবাহগণ বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে অযূ করা"।[৩১]

লোকটি (এই হাদীছ থেকে) উদ্দেশ্য নিয়েছেন ঠান্ডার দিনগুলিতে পরিপূর্ণরূপে উযূ করা। অতএব, যখন তুমি ঠান্ডা পানি দিয়ে পরিপূর্ণরূপে উযূ করবে, তখন এটি অবহাওয়ার প্রকৃতির অনুকূল গরম পানি দ্বারা তোমার উযূ করার চেয়ে অধিকতর উত্তম। সুতরাং লোকটি ফাত্ওয়া দিয়েছেন যে, ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা সর্বোত্তম। আর তিনি পূর্ববর্তী হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তাহলে ভুলটি কি জানার ক্ষেত্রে, নাকি বুঝার ক্ষেত্রে?

উত্তর: ভুলটি বুঝার ক্ষেত্রে হয়েছে। কেননা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে অযূ করা"। অথচ তিনি বলেননি: অযূর জন্য ঠান্ডা পানি নির্বাচন করো। আর তিনি দু'টি ব্যাখ্যার মাঝে পার্থক্য করেছেন। যদি হাদীছটিতে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি বর্ণিত হতো, তাহলে আমরা বলতাম: হ্যাঁ, তুমি ঠান্ডা পানি নির্বাচন কর। অথচ রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে উযূ করা"।

অর্থাৎ পানির শীতলতা পরিপূর্ণরূপে উযূ করা থেকে মানুষকে বাধা দেয় না। অতঃপর আমরা বলব: আল্লাহ কি তার বান্দাদের প্রতি সহজতা চান, নাকি তাদের প্রতি কঠোরতা চান?

---

[৩১] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৫১, তিরমিযী হা/৫১, নাসাঈ হা/১৪৩।

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

"আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতা চান এবং তোমাদের প্রতি কঠোরতা চান না"। সূরা আল-বাক্বারাহ; ২:১৮৫।

আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ

"নিশ্চয় দীন সহজ"।[৩২]

সুতরাং আমি সকল ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলব: নিশ্চয় "বুঝ"এর বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব, আল্লাহ তার বান্দাদের থেকে কি চেয়েছেন, তা বুঝা আমাদের উপর আবশ্যক। ইবাদতসমূহ পালন করার ক্ষেত্রে আল্লাহ কি তাদের উপর কষ্ট দিতে চান, নাকি তাদের প্রতি সহজতা চান?

উত্তর: কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি সহজতা চান এবং আমাদের প্রতি কঠোরতা চান না। অতএব, যে শিষ্টাচারগুলো দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর 'ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে প্রভাবিত হওয়া, উত্তম আর্দশ হওয়া, এমনকি কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী হওয়া এবং আল্লাহর দীনের ক্ষেত্রে নেতা হওয়া উচিত; সেগুলোর মধ্য থেকে এগুলো কিছু শিষ্টাচার। সুতরাং ধৈর্য এবং দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে দীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব অর্জন হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾

"আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা নির্ধারণ করেছিলাম যারা আমার আদেশ অনুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যতদিন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করত"। সূরা আস-সাজ্‌দাহ; ৩২:২৪।

---

[৩২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৯, নাসাঈ হা/৫০২৪।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: 'ইল্‌ম অর্জনের সুনির্দিষ্ট কারণ

'ইল্‌ম অর্জনের অনেক কারণ বিদ্যমান। সেগুলোর কিছু আমরা উল্লেখ করলাম।

১. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা (التقوى):

তাক্বওয়া অর্জন করা তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল বান্দাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوْا اللَّهَ وَ إِنْ تَكْفُرُوْا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾

"তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে এবং তোমাদেরকে অবশ্যই আমি এই নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমারা আল্লাহকে ভয় করো। আর যদি তোমরা কুফুরী কর তাহলে, নিশ্চয় আসমানসমূহ এবং যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ হলেন অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত"। সূরা আন-নিসা ৪:১৩১।

আর এটা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও নির্দেশ তার উম্মাতের প্রতি। আবু উমামাহ ছ্বদী ইবনু 'আজলান 'আল-বাহিলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَ: اتَّقُوْا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَ صَلُّوْا خَمْسَكُمْ، وَ صُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَ أَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَ أَطِيعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

"আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বিদায় হজ্জে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন: তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত আদায় করো, তোমাদের রমাযান মাসের ছ্বিয়াম পালন করো, তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত প্রদান করো, তোমাদের নেতাদের আনুগত্য করো এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করো"।[৩৩]

---

[৩৩] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/৬১৬।

আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো নেতাকে কোনো অভিযানে প্রেরণ করতেন, তখন বিশেষ করে তাকে আল্লাহভীতির নির্দেশ দিতেন এবং মুসলিমদের মধ্য থেকে তার (নেতার) সাথে যারা থাকতেন তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিতেন এবং সালাফে সালেহীন তাদের বক্তৃতায়, তাদের লেখনীতে এবং মৃত্যুর সময় তাদের ওয়াছ্বিয়্যাতে তারা পরস্পরকে সদুপদেশ দিতে অব্যাহত থাকতেন।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার ছেলে আব্দুল্লাহর নিকটে লিখেছিলেন,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ –عَزَّ وَجَلَّ– فَإِنَّهُ مَنْ اتَّقَاهُ وَقَاهُ، وَمَنْ أَقْرَضَهُ جَزَاهُ؛ وَمَنْ شُكْرَهُ زَادَهُ

অতঃপর আমি তোমাকে আল্লাহভীতির ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি। যে তাকে ভয় করবে, তিনি তাকে রক্ষা করবেন। যে তাকে ঋণ দিবে, তিনি তাকে প্রতিদান দিবেন এবং যে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, তিনি তাকে তা বৃদ্ধি করে দিবেন।

আর ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোনো একজন ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, “আমি তোমাকে এমন আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, যার সাক্ষাৎ তোমার জন্য আবশ্যক। যাকে ছাড়া তোমার কোনো সমাপ্তি নেই। আর তিনি ইহকাল এবং পরকালের মালিক”।

আর কোনো একজন ধার্মিক ব্যক্তি তার কোনো এক দীনি ভাইয়ের নিকটে লিখেছেন, “আমি তোমাকে এমন আল্লাহভীতির নির্দেশ দিচ্ছি, যিনি তোমাকে তোমার বিছানায় (বিপদ-আপদ থেকে) রক্ষা করেন এবং তোমাকে তোমার বাহিরে আরোহণে (বিপদ-আপদ থেকে) রক্ষা করেন। সুতরাং তুমি তোমার অন্তরকে দিনে এবং রাতে সর্বাবস্তায় আল্লাহর কাছে প্রদান করো। তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো তোমার নিকট তার নিকটবর্তীতা অনুযায়ী, তোমার উপর তার ক্ষমতা অনুযায়ী। আর জেনে রাখো! নিশ্চয় তুমি তার চোখের সামনে রয়েছো, তুমি তার কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে অন্যের কর্তৃত্বের দিকে যেতে পারবে না এবং তার মালিকানা থেকে অন্যের মালিকানার দিকে যেতে পারবে না। অতএব তার প্রতি তোমার ভয় যেন বেশি থাকে”।

আর তাক্বওয়ার শাব্দিক অর্থ: “বান্দা তার মাঝে এবং সে যার ভয় করে তার মাঝে এমন প্রতিরক্ষা স্থাপন করবে, যা তাকে ভয় হতে রক্ষা করবে”।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: “বান্দা তার নিজের মাঝে এবং সে যার রাগ ও অসন্তুষ্টির ভয় করে তার মাঝে, তার আনুগত্যের মাধ্যমে ও তার পাপসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এমন প্রতিরক্ষা স্থাপন করবে, যা তাকে তার রাগ ও অসন্তুষ্টির ভয় থেকে রক্ষা করবে”।

জেনে রাখো! কখনো কখনো “তাক্বওয়া” শব্দটি “বির্” শব্দটির সাথে যুক্ত হয়ে আসে, তখন বলা হয়: بِرٌّ وَتَقْوَى যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى﴾

“আর তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো আদেশসমূহ পালন এবং নিষেধসমূহ বর্জনের ব্যাপারে”। সূরা আল-মায়িদা ৫:২।

আর কখনো কখনো এ শব্দ দু’টির একটিকে উল্লেখ করা হয়। অতএব, যখন “বির্” শব্দটির সাথে “তাক্বওয়া” শব্দটি মিলিত হয়ে আসে, তখন “বির্” শব্দটি “আদেশ পালন” এর অর্থ দেয়। আর “তাক্বওয়া” শব্দটি “নিষেধসমূহ বর্জন” এর অর্থও দেয়। আর “তাক্বওয়া” শব্দটি যখন এককভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এটি এমন ব্যাপক অর্থ দেয়, যা আদেশসমূহ পালন ও নিষেধসমূহ বর্জনের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আর অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা তার কুর্‌আনে উল্লেখ করেছেন যে, জান্নাত মুত্তাকীদের (আল্লাহভীরুদের) জন্য তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং, আল্লাহভীরুরাই জান্নাতের অধিবাসী (আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত করুন)। আর একারণেই মানুষের উপর আবশ্যক হলো আল্লাহকে ভয় করা; তার আদেশসমূহ মেনে চলার জন্য, তার প্রতিদান অন্বেষণের জন্য এবং তার শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوْا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾

“হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী শক্তি প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ তা‘আলা মহা অনুগ্রহশীল। সূরা আল-আনফাল ৮:২৯।

আর এই আয়াতের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়দাহ/মর্যাদা রয়েছে,

প্রথম ফায়দাহ: ﴿يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ “তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী শক্তি প্রদান করবেন”। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে এমন শক্তি প্রদান করবেন, যার মাধ্যমে তোমরা সত্য-মিথ্যার মাঝে ও ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে। আর আয়াতের এই অংশে ‘ইল্‌ম অন্তর্ভুক্ত। এটি এভাবে যে, আল্লাহ তা‘আলা মানুষের জন্য যে জ্ঞানসমূহ উন্মোচন করে দিয়েছেন, তা অন্য কারো জন্য উন্মোচন করেননি। কেননা আল্লাহভীতির মাধ্যমেই সঠিক পথের আধিক্যতা, ‘ইল্‌মের আধিক্যতা এবং সংরক্ষণের আধিক্যতা অর্জিত হয়।

আর একারণেই শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন:

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ ... فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِيْ وَ قَالَ اِعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ ... وَ نُوْرُ اللهِ لَا يُؤْتَاهُ عَاصِيْ

“আমি আমার শিক্ষক ওয়াকী‘ এর নিকট আমার স্মরণশক্তির দুর্বলতার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে গুনাহসমূহ বর্জনের পরামর্শ দিলেন এবং বললেন: তুমি জেনে রাখো যে, ‘ইল্‌ম হলো নূর। আর আল্লাহর নূর কোনো পাপীকে দেওয়া হয় না”।

কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ যখন ‘ইল্‌ম বৃদ্ধি করতে চায়, তখন মানুষ শিক্ষা ব্যবস্থা, সত্য-মিথ্যা মাঝে এবং ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্যকারী শক্তি বৃদ্ধি করতে চায়।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা মানুষের জন্য যে “বুঝ” উন্মোচন করে দিয়েছেন, তা আয়াতের এ অংশের অন্তর্ভুক্ত। আর তাক্বওয়া হচ্ছে বুঝশক্তির উপকরণ এবং বুঝশক্তির মাধ্যমে ‘ইল্‌মের আধিক্যতা অর্জিত হয়। অতঃপর তুমি দু’জন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করবে, তারা আল্লাহর কুর্‌আন থেকে কোনো আয়াত সংরক্ষণ করে এবং তাদের দু’জনের একজন উক্ত আয়াত থেকে তিনটি হুকুম বের করতে সক্ষম হয়। আর অপরজন; আল্লাহ তাকে যে “বুঝ” দিয়েছেন, তা অনুযায়ী সে উক্ত আয়াত থেকে অনেক হুক্‌ম বের করতে সক্ষম হয়। তাক্বওয়া হচ্ছে বুঝের আধিক্যতার উপকরণ।

আর আয়াতের এই অংশে অন্তরদৃষ্টিও অন্তর্ভুক্ত যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের এমন অন্তরদৃষ্টি প্রদান করেন, যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে (ভাল-মন্দের) পার্থক্য করে। সুতরাং শুধুমাত্র মানুষকে দেখেই সে চিনতে পারে যে, সে (মানুষটি) সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী, নেক্‌কার নাকি বদ্‌কার। এমনকি আল্লাহ তাকে যে

অন্তরদৃষ্টি দিয়েছেন, তার মাধ্যমে কখনো কখনো সে ব্যক্তি কোনো এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়ছালা দেয়। অথচ সে (কখনো) তার সঙ্গী হয়নি এবং তার সম্পর্কে (পূর্ব থেকে) কোনো কিছুই জানে না।

দ্বিতীয় ফায়দাহ: ﴿وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ "তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন"। আর সৎ আমলের মাধ্যমে পাপ মোচন হয়। কেননা সৎ আমল খারাপ আমলের কাফ্‌ফারা। যেমন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَ رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

যদি বান্দা কাবীরাহ গুনাসমূহ বর্জন করে, তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত, এক জুম'আহ থেকে অপর জুম'আহ এবং এক রমাযান (মাস) থেকে অপর রমাযান (মাস), এগুলোর মধ্যবর্তী সময়ে যে (ছ্ব'গীরাহ) গুনাসমূহ হয়েছে, সেগুলোর কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে।[৩৪] রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

এক 'উমরা থেকে অপর 'উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে যে (ছ্বগীরা) গুনাহগুলো হয়েছে, সেগুলোর কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে।[৩৫]

সুতরাং সৎ আমলসমূহের মাধ্যমেই কাফ্‌ফারা হয়। আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, মানুষ যখন আল্লাহকে ভয় করে, তখন আল্লাহ তার জন্য এমন সৎ আমলসমূহ সহজ করে দেন, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।

তৃতীয় ফায়দাহ: ﴿وَ يَغْفِرْ لَكُمْ﴾ "এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন"। এটা এজন্য যে, তাওবা এবং ইস্তেগফার তোমাদের জন্য সহজ করা হয়েছে।

কেননা এটা বান্দার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাওবা এবং ইস্তেগফারকে সহজ করেছেন।

---

[৩৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩৩।
[৩৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৭৭৩।

২. ‘ইল্‌ম অন্বেষণের ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রমী হওয়া ও তাতে অটল থাকা (المثابرة والاستمرار على طلب العلم): ‘ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রম ব্যয় করা, তার উপর ধৈর্যধারণ করা এবং ‘ইল্‌ম অর্জনের পর তা সংরক্ষণ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। কেননা শরীরের প্রশান্তির মাধ্যমে ‘ইল্‌ম অর্জিত হয় না। অতএব, প্রত্যেক শিক্ষার্থী ঐ সকল পথে চলবে, যে সকল পথ ‘ইল্‌ম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর একারণে সে ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে। কেননা ছ্বহীহ মুসলিমে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো পথে চলে, যে পথে সে ‘ইল্‌ম অন্বেষণ করবে; তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি পথ সহজ করে দিবেন”।[৩৬]

অতএব, প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন অধ্যবসায়ী হয়, কঠোর পরিশ্রমী হয়, রাত্রী জাগরণ করে এবং তার থেকে যেন ঐ প্রত্যেক জিনিস দূরে থাকে, যা তাকে ‘ইল্‌ম অন্বেষণ থেকে বিরত রাখে অথবা তাকে ব্যস্ত রাখে।

আর সালাফে ছ্বলেহীনের ‘ইল্‌ম অন্বেষণের ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের ব্যাপারে অনেক ঘটনা রয়েছে। এমনকি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কিসের মাধ্যমে ‘ইল্‌ম অর্জন করেছেন? তিনি (জবাবে) বলেছিলেন,

بِلِسَانٍ سَؤُوْلٍ، وَ قَلْبٍ عَقُوْلٍ، وَ بَدَنٍ غَيْرِ كَسُوْلٍ

অধিক প্রশ্নকারী জিহ্বার মাধ্যমে, জ্ঞানবান অন্তরের মাধ্যমে এবং নিরলস শরীরের মাধ্যমে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

إِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيْثُ عَنْ الرَجُلِ فَآتِي بَابَهُ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِيْ عَلَى بَابِه، تُسْفِي الرِّيْحُ عَلَيَّ مِنَ التُّرَاب، فَيَخْرُجُ فَيَقُوْلُ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ مَا جَاءَ بِكَ؟ أَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ؟ فَأَقُوْلُ: أَنَا أَحَقُّ أَنَ آتِيَكَ

---

[৩৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৯৯।

"নিশ্চয় কোনো একজন ব্যক্তি থেকে কোনো একটি হাদীছ আমার নিকট পৌঁছেছিল। অতঃপর আমি তার দরজায় এসেছিলাম। পরে আমি আমার চাদরটি তার দরজার উপর বালিশরূপে ব্যবহার করেছিলাম। বাতাস আমার উপর দিয়ে ধূলা-বালি উড়িয়ে নিয়েছিল। অতঃপর, সে লোক বের হয়ে বলেছিল, হে রসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই! আপনাকে কে নিয়ে এসেছে? আপনি কেন আমার নিকটে (কাউকে) পাঠান নি, তাহলে আমি আপনার নিকটে আসতাম? তারপর আমি বলেছিলাম: আপনার নিকটে আসার আমি বেশি হকদার"।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) 'ইল্‌মের কারণে বিনয়ী ছিলেন। ফলে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে কঠোর পরিশ্রম করা একজন শিক্ষার্থীর জন্য উচিত। আর ইমাম শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) থেকেও বর্ণিত আছে যে, কোনো এক রাত্রিতে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) তাকে দাওয়াত দিলেন। তারপর তার সামনে রাতের খাবার পেশ করলেন। এরপর শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) খাবার খেলেন। খাবার শেষে দু'ব্যক্তি তাদের বিছানায় চলে গেল। তারপর শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) কোনো একটি হাদীছের হুকুমগুলো উদ্‌ঘাটনের জন্য গবেষণা করতে থাকলেন। আর হাদীছটি হলো নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাণী,

يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

হে আবু 'উমাইর! নু'গাইর (ছোট পাখি) কি করে?[৩৭]

আবু উমাইর এর সাথে একটি ছোট পাখি ছিল। যাকে নু'গাইর বলে ডাকা হত। তারপর এই পাখিটি মারা গেল। অতঃপর বালকটি পাখিটির ব্যাপারে দুঃখ পেল। আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের সাথে খেলা করতেন।

অতঃপর দীর্ঘ রাত্রি ধরে ইমাম শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছটি থেকে (হুকুম) উদ্‌ঘাটন করতে থাকলেন। বলা হয়ে থাকে: তিনি হাদীছটি থেকে ১০০০ এর চেয়েও বেশি ফায়দাহ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। সম্ভবত তিনি যখন কোনো ফায়দাহ উদ্‌ঘাটন করতেন, তখন এর সাথে আরেকটি হাদীছ টেনে আনতেন। অতঃপর যখন ফজ্‌রের আযান দেওয়া হল, তখন ইমাম শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) ছ্বলাত আদায় করলেন। অথচ উযূ করলেন না। তারপর তিনি তার বাড়ির দিকে ফিরে গেলেন। আর ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) তার পরিবারের নিকটে শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ)

[৩৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬১২৯।

এর প্রশংসা করেছিলেন। তারপর তার পরিবারের লোকজন তাকে বললেন, হে আবু আব্‌দুল্লাহ! আপনি কিভাবে এমন ব্যক্তির প্রশংসা করেন; যিনি পানাহার করলেন, ঘুমালেন, রাত্রি জাগরণ করলেন না এবং উযূ ছাড়া ফজ্‌রের ছ্বলাত আদায় করলেন? তারপর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর ইমাম শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) (জবাবে) বললেন: "আমি পাত্র খালি করা পর্যন্ত খেয়েছি। কেননা আমি ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) এর খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার খুঁজে পাইনি। তাই এ খাবার দিয়ে আমার পেট পূর্ণ করার ইচ্ছা করেছি। আর আমি তাহাজ্জুদের ছ্বলাত আদায় করিনি। কেননা রাতের (নফল ছ্বলাতে) দণ্ডায়মান হওয়ার চেয়ে 'ইল্‌ম অর্জন করা অধিকতর উত্তম। আর আমি (উক্ত সময়ে) এই হাদীছটির ব্যাপারে গবেষণা করেছিলাম। পক্ষান্তরে, ফজ্‌রের ছ্বলাতের জন্য আমি উযূ করিনি। কেননা আমি 'ইশার ছ্বলাত থেকেই উযূ অবস্থায় ছিলাম"।

(লেখক) আমি সর্বাবস্থায় বলব: 'ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমী হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব, আমরা যেন আমাদের বর্তমান সময়ের দিকে লক্ষ্য করি, আমরা কি এই কঠোর পরিশ্রমের উপর আছি, নাকি নাই? পক্ষান্তরে, যারা নিয়মিত লেখাপড়া করে। অতঃপর যখন তারা লেখাপড়া থেকে বিরত হয়, তখন তারা এমন কিছু জিনিসের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, যেগুলো তাদেরকে পড়াশুনার ব্যাপারে উৎসাহিত করে না।

আমি একটি উদাহরণ পেশ করছি: কোনো একজন শিক্ষার্থী কোনো এক বিষয়ে খারাপ পরীক্ষা দিল। তারপর শিক্ষক বললেন, "কেন (তুমি খারাপ পরীক্ষা দিলে)? অতঃপর ছাত্রটি বলল: কেননা আমি এই বিষয়টি বুঝতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছি। ফলে আমি এই বিষয়টি পড়ি না। কিন্তু আমি এটি বুঝতে চাই"। এ কেমন হতাশা? এটি একটি বড় ভুল। অতএব, আমাদের কঠোর পরিশ্রম করা আবশ্যক, যতক্ষণ না আমরা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। আর আমার নিকটে আমাদের শিক্ষক আব্দুর র'হ্‌মান আস-সা'দী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছিলেন যে: "নাহু বিষয়ে কুফাবাসীর ইমাম আল-কিসায়ী (রহিমাহুল্লাহ) নাহুশাস্ত্রে 'ইল্‌ম অন্বেষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সক্ষম হন নি। কোনো একদিন তিনি এমন একটি পিঁপড়াকে দেখলেন, যে পিঁপড়াটি তার খাবার বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল এবং খাবার নিয়ে দেয়ালের (উপর) দিকে আরোহণ করছিল। যখনই সে উপরের দিকে আরোহণ করছিল, তখনই সে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে এই বাধা থেকে মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত এবং দেয়ালে আরোহণ করা পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

তারপর আল-কিসায়ী (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, এই পিঁপড়াটি অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গেল। তারপর তিনিও নাহুশাস্ত্রে ইমাম হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গেলেন”। হে শিক্ষার্থীরা! আর একারনেই আমাদের কঠোর পরিশ্রম করা এবং হতাশ না হওয়া উচিত। কেননা হতাশার অর্থ হলো: কল্যাণের দরজা বন্ধ করা। আর আমাদের নিজেদেরকে অশুভ মনে না করা উচিত। বরং আমাদের নিজেদেরকে কল্যাণকর এবং শুভ মনে করা উচিত।

৩. হিফয বা মুখস্থকরণ (الحفظ):

পড়াশুনার ব্যাপারে লেগে থাকা একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। আর সে যা শিক্ষা করে, তা তার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং তা তার কিতাবে সংরক্ষণ করা তার উপর আবশ্যক। কেননা মানুষ ভুলের লক্ষ্যবস্তু। অতএব, যখন মানুষ পড়াশুনার ব্যাপারে লেগে থাকবে না এবং যা শিখেছে তা বারবার চর্চা করবে না, তখন অবশ্যই এটি তার থেকে হারিয়ে যাবে এবং তা সে ভুলে যাবে। বলা হয়ে থাকে: ‘ইল্‌ম হচ্ছে শিকারলব্ধ প্রাণী এবং তা লিখে রাখা হচ্ছে প্রাণীটির বন্দিকরণ। অতএব, তোমার শিকারলব্ধ প্রাণীগুলোকে নির্ভরযোগ্য রশিসমূহ দ্বারা বন্দি করো। কোনো একটি হরিণীকে তোমার বন্দি করে রাখা, তারপর তাকে পৃথিবীর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া বোকামির অন্তর্ভুক্ত। এটা যেন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার মত। যে সকল পদ্ধতি ‘ইল্‌ম সংরক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত করে, তার মধ্য থেকে একটি পদ্ধতি হলো, ‘ইল্‌ম অনুযায়ী মানুষের সঠিক পথ পাওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَ آتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾

আর যারা সঠিক পথ অবলম্বন করে, তিনি তাদের সঠিকপথ প্রাপ্তি বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে আল্লাহভীতি প্রদান করেন। সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৭। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَ يَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾

আর যারা সঠিক পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ (তাদের সঠিক পথপ্রাপ্তি) বৃদ্ধি করে দেন। সূরা মারইয়াম ১৯:৭৬।

অতএব, যখনই মানুষ তার ‘ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে, তখনই আল্লাহ তার মুখস্ত শক্তি এবং “বুঝ” শক্তি বৃদ্ধি করে দেন।

৪. আলিমগণের সংস্পর্শে থাকা (ملازمة العلماء):

আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। অতঃপর আলিমগণের সংস্পর্শে থাকা এবং তাদের কিতাবে তারা যা লিখেছেন তার সাহায্য নেওয়া একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। কেননা শুধুমাত্র (নিজে নিজে) পড়াশুনা এবং অধ্যয়নের উপর সীমাবদ্ধ থাকার কারণে একজন শিক্ষার্থী দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন মনে করে। যা ঐ ছাত্রের বিপরীত, যে এমন কোনো একজন আলেমের নিকটে বসে, যিনি তার নিকটে (বিভিন্ন বিষয়ে) ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং সঠিক পথ সুস্পষ্ট করে দেন। আর আমি বলছি না, নিশ্চয় একজন ছাত্র শাইখদের নিকট থেকে ‘ইল্‌ম শিক্ষা করা ছাড়া ‘ইল্‌ম অর্জন করতে পারবে না। বরং অবশ্যই মানুষ (নিজে নিজে) পড়াশুনা এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে ‘ইল্‌ম অর্জন করতে পারবে। কেননা অধিকংশ ক্ষেত্রে যখন কোনো একজন ছাত্র (নিজে নিজে) দিনে এবং রাতে পরিপূর্ণরূপে (‘ইল্‌ম অর্জনের কাজে) ঝুঁকে পড়ে এবং “বুঝ” অর্জন করে, তখন কখনো কখনো ছাত্রটি অধিক ভুল করে। একারণেই বলা হয়ে থাকে, “যদি কোনো ব্যক্তির দলীল হয় তার কিতাব, তাহলে তার ভুলের পরিমাণ সঠিকতার চেয়ে অধিকতর বেশি”।

কিন্তু এই কথাটি কোনো ভাবেই সঠিক নয়। বরং শাইখগণের নিকট থেকে ‘ইল্‌ম অর্জন সর্বোৎকৃষ্ট। আর আমি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিব যে, সে কোনো একটি বিষয়ে সকল শাইখ থেকে ‘ইল্‌ম অর্জন করবে না। যেমন সে একের অধিক শাইখ থেকে ফিক্‌হ সংক্রান্ত বিষয়ে ‘ইল্‌ম অর্জন করবে না। কেননা ‘আলিমগণ কুর্‌আন-সুন্নাহ থেকে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেন এবং তাদের মতামতের ক্ষেত্রেও মতানৈক্য করেন।

সুতরাং তুমি তোমার জন্য এমন একজন ‘আলিম নির্ধারণ করবে, যার নিকটে ফিক্‌হ, বাল‘গাত ইত্যাদি বিষয়ে তুমি ‘ইল্‌ম অর্জন করবে। অর্থাৎ তুমি একটি বিষয়ে একজন শাইখ থেকেই ‘ইল্‌ম অর্জন করবে। আর যখন উক্ত শাইখের নিকটে একটি বিষয়ের চেয়ে অধিক বিষয়ে ‘ইল্‌ম থাকবে, তখন তুমি তার সাথে লেগে থাকবে। কেননা যখন তুমি ফিক্‌হ শাস্ত্র সম্পর্কে একাধিক শাইখ থেকে ‘ইল্‌ম অর্জন করবে, অথচ তারা তাদের মতামতের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেন; তখন তোমার (নিজের) মতামত কি হবে? অথচ তুমি ছাত্র? (তখন) তোমার মতামত হবে হতবুদ্ধিতা এবং সন্দেহ। কিন্তু যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো একজন ‘আলিমের সাথে তুমি লেগে থাকবে, তখন এটি তোমাকে প্রশান্তি দিবে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ
‘ইল্‌ম অর্জনের পদ্ধতি এবং যে সকল ভুল থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ‘ইল্‌ম অর্জনের পদ্ধতি (طريق تحصيل العلم)

জানা বিষয় যে, যখন মানুষ কোনো একটি স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তখন তার এমন একটি পথ চেনা আবশ্যক, যে পথটি তাকে সে স্থানে পৌঁছে দিবে। আর যখন বহু সংখ্যক পথ হবে, তখন সে সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং সবচেয়ে সহজ পথ অনুসন্ধান করবে। একারণে একজন শিক্ষার্থীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলোঃ তার ‘ইল্‌ম অন্বেষণ কয়েকটি মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল হবে এবং আন্দাজে উদ্দেশ্যহীনভাবে না চলা। অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত মূলনীতিগুলো ভালভাবে আয়ত্ত্ব না করে, তাহলে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে না।

অতএব, মূলনীতিগুলো হলোঃ শাখাবিশিষ্ট মাসআলাহগুলোসহ ‘ইল্‌ম অর্জন করা। এ ধরনের ‘ইল্‌ম শাখাবিশিষ্ট গাছের মূলের মত। অতএব, যখন শাখাগুলো মজবুত মূলের উপর থাকবে না, তখন শাখাগুলো শুকিয়ে যাবে এবং মরে যাবে।

কিন্তু মূলনীতিগুলো কি? সেগুলো কি ছ্বহীহ দলীলসমূহ? নাকি সেগুলো নিয়মনীতি?

উত্তরঃ মূলনীতিগুলো হলো কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহ এবং কুরআন-সুন্নাহ থেকে গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে গৃহীত নিয়মনীতি। আর এগুলো একজন শিক্ষার্থীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণঃ জটিলতা সহজতাকে টেনে আনে। এটি কুরআন-সুন্নাহ থেকে গৃহীত একটি মূলনীতি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ﴾

“আর তিনি দীনের ক্ষেত্রে তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করেননি”। সূরা আল-হাজ্জ ২২:৭৮। আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘ইম্‌রান ইবনু ‘হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"তুমি দাঁড়ানো অবস্থায় ছ্বলাত আদায় করো। যদি তুমি (তাতে) সক্ষম না হও, তাহলে বসা অবস্থায় ছ্বলাত আদায় করো। যদি তুমি (তাতেও) সক্ষম না হও, তাহলে কোনো এক পার্শ্বের উপর (শুয়ে ছ্বলাত আদায় করো)"।[৩৮]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"যখন আমি তোমাদেরকে কোনে বিষয়ে আদেশ করব, তখন তোমরা তোমাদের সক্ষমতা অনুযায়ী তা পালন করবে"।[৩৯]

এটি হলো একটি মূলনীতি। যদি তোমার নিকটে বিভিন্ন আকৃতিতে ১০০০ মাসআলাহ আসে, তাহলে আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিব যে, তুমি এই মূলনীতি অনুযায়ী এই মাসআলাহগুলোর ফায়ছালা দিতে পারবে। কিন্তু যদি তোমার নিকটে এই মূলনীতিটি না থাকে, এমতাবস্থায় তোমার নিকটে দু'টি মাসআলাহ আসে; তাহলে তোমার উপর বিষয়টি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আর 'ইল্ম অর্জনের জন্য দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

'ইল্ম অর্জনের প্রথম পদ্ধতি:

একজন শিক্ষার্থী নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে 'ইল্ম অর্জন করবে এবং ঐসকল কিতাব থেকে 'ইল্ম অর্জন করবে; যেসকল কিতাব প্রসিদ্ধ 'আলিমগণ তাদের 'ইল্ম, বিশ্বস্থতা এবং বিদআত ও কুসংস্কার থেকে 'আক্বীদাহ্'র বিশুদ্ধতা অনুযায়ী রচনা করেছেন।

আর কোনো একটি মূল কিতাব থেকে 'ইল্ম গ্রহণ করা আবশ্যক। যার মাধ্যমে মানুষ যে কোনো অভিষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কিন্তু এখানে দু'টি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

---

[৩৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/১১১৭।
[৩৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২৮৮।

প্রথম প্রতিবন্ধকতা: সময়ের দীর্ঘতা।

কেননা মানুষ (মূল কিতাব থেকে ‘ইল্‌ম অর্জন করতে গেলে) দীর্ঘ সময়, খুব কষ্ট এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন মনে করে। এমনকি মানুষ যে ‘ইল্‌ম কামনা করে তা পর্যন্ত পোঁছে যায়। আর কখনো কখনো অধিকাংশ মানুষ এই প্রতিবন্ধকতার সাথে পেরে উঠতে পারে না। বিশেষ করে, মানুষ তার চারপাশে দেখে যে, অনেকেই কোনো লাভ ছাড়াই তাদের সময় নষ্ট করে। ফলে তাকেও অলসতা ধরে ফেলে, সে স্মৃতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে যা চায়, তা পায় না।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা: যে ছাত্র কোনো একটি মূল কিতাব থেকে ‘ইল্‌ম অর্জন করে, অথচ নিয়মনীতির/মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল হয় না।

তার ‘ইল্‌ম অর্জন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বল হয়। আর একারণেই যে ছাত্র কোনো একটি মূল কিতাব থেকে ‘ইল্‌ম অর্জন করে, আমরা তার নিকট থেকে অনেক ভুল দেখতে পায়। কেননা তার নিকটে এমন নিয়মনীতি ও মূলনীতিসমূহ নেই, যেগুলোর উপর সে নির্ভর করবে এবং যেগুলোর উপর কুরআন ও সুন্নাহর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ভিত্তিশীল হবে। আমরা এমন কিছু লোককে দেখতে পায়, যারা এমন হাদীছ বর্ণনা করে, যা নির্ভরযোগ্য ছ্বহীহ হাদীছ ও মুস্‌নাদ হাদীছ গ্রন্থসমূহে উল্লেখ নেয়। বিদ্বানগণের নিকটে এই পদ্ধতিটি এমন পদ্ধতির বিপরীত, যা নির্ভরযোগ্য মূলনীতিসমূহে উল্লেখিত আছে।

অতঃপর তারা এই হাদীছটি গ্রহণ করে এবং এই হাদীছটির উপরই তাদের বিশ্বাস ভিত্তিশীল হয়। কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি ভুল। কেননা কুরআন-সুন্নাহর এমন কিছু মূলনীতি রয়েছে, যেগুলোর উপর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি আবর্তিত হয়। অতএব, এসকল আনুষঙ্গিক বিষয়াদিকে মূলনীতিসমূহের দিকে এমন ভাবে ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক; যখন আমরা এসকল আনুষঙ্গিক বিষয়াদির মাঝে উক্ত মূলনীতিসমূহের বিপরীত কিছু দেখতে পাব, তখন এসকল আনুষঙ্গিক বিষয়াদির মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব নয়। অতএব, অবশ্যই আমরা এসকল আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পরিত্যাগ করব।

‘ইল্‌ম অর্জনের দ্বিতীয় পদ্ধতি:

তুমি এমন শিক্ষকের নিকট থেকে ‘ইল্‌ম অর্জন করবে, যিনি তার ‘ইল্‌ম এবং দীনের ব্যাপারে আস্থাশীল। আর এই পদ্ধতিটি ‘ইল্‌ম অর্জনের সবচেয়ে দ্রুততম এবং সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি। কেননা প্রথম পদ্ধতিতে কখনো কখনো একজন শিক্ষার্থী তার বুঝের দুর্বলতার কারণে বা তার ‘ইল্‌মের কমতির কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে বিভ্রান্ত হয়ে যায় অথচ সে জানেই না।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের সাথে কোনো মত গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে আলোচনা করে। অতঃপর এর কারণেই উক্ত ছাত্রটির জন্য বুঝের ক্ষেত্রে, অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, বিশুদ্ধ মতামতগুলোর পক্ষ সমর্থনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে এবং দুর্বল মতামতগুলো বর্জনের ক্ষেত্রে বহু দরজা খুলে যায়। আর যখন ছাত্রটি দু’টি পদ্ধতির মাঝে সমন্বয় করবে, তখন এটি অধিক পরিপূর্ণ হবে। আর ছাত্রটি যেন ধারাবাহিকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি দ্বারা এবং বিস্তারিত বিদ্যার আগে সংক্ষিপ্ত বিদ্যার দ্বারা (‘ইল্‌ম অর্জন) শুরু করে। যেন সে একটি স্তর থেকে আরেকটি স্তরের দিকে উন্নীত হতে পারে। অতএব, ছাত্রটি কোনো একটি স্তরে আরোহণ করবে না, যতক্ষণ না তার পূর্ববর্তী স্তরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। যাতে করে তার আরোহণটি নিরাপদ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

যে সকল ভুল থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক

এখানে কিছু ভুল উল্লেখ করব, যেগুলো ভুল কিছু শিক্ষার্থী করে থাকে।

১. হিংসা করা (الحسد):

“হিংসা” এর সংজ্ঞা: “আল্লাহ অন্যের উপর যে নি‘আমত দান করেছেন, তা অপছন্দ করা। আর হিংসা অন্যের উপর থেকে আল্লাহর নি‘আমত চলে যাওয়ার আকাঙ্খা করা নয়। বরং এটি শুধুমাত্র অন্যের উপর আল্লাহ যে নি‘আমত দিয়েছেন, তা কোনো লোকের অপছন্দ করা”।

তার নি‘আমত চলে যাওয়া বা থাকা উভয়টিই সমান। কিন্তু মানুষ তা অপছন্দ করে। যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) অনুসন্ধান করে বলেছেন,

اَلْحَسَدُ كَرَاهَةُ الْإِنْسَانِ مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ

“অন্যের উপর আল্লাহ যে নি‘আমত দিয়েছেন, তা মানুষের অপছন্দ করাই হলো হিংসা”।

আর কখনো কখনো হিংসা থেকে আত্মাসমূহ মুক্ত থাকে না। অর্থাৎ কখনো কখনো হিংসা করা আত্মার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغَ ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ

“যখন তুমি হিংসা করবে, তখন (কোনো বিষয়ে) বাড়াবাড়ি করবে না। আর যখন তুমি ধারণা করবে, তখন কোনো কিছু অনুসন্ধান করবে না”।[৪০]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য করেছেন যে, যখন মানুষ অন্তর থেকে অন্যের ব্যাপারে হিংসা করবে, তখন সেই মানুষের জন্য অন্যের ব্যাপারে কথা ও কাজের মাধ্যমে বাড়াবাড়ি না করা আবশ্যক। কেননা এই বাড়াবাড়ি করা ঐ সকল ইয়াহূদীদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيماً﴾

“আল্লাহ নিজ অনুগ্রহের কারণে লোকদেরকে যে নি‘আমত দান করেছেন, এর কারণে তারা (ইয়াহূদীরা) কি মানুষের প্রতি হিংসা করে? তাহলে তো অবশ্যই আমি ইব্‌রাহীমের বংশধরকে কিতাব এবং প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিশাল রাজত্ব দান করেছিলাম”। সূরা আন-নিসা ৪:৫৪।

---

[৪০] যঈফ: ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী ১০/২১৩, ইবনে আব্দুল বার, তামহীদ ৬/১২৫, আলবানী, যঈফ জামী হা/২৫২৭।

একজন হিংসুক ব্যক্তি কয়েকটি অকল্যাণে পতিত হয়।

(১) আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, হিংসুক ব্যক্তির তা অপছন্দ করা:

অতএব, নিশ্চয় আল্লাহ কোনো ব্যক্তির উপর যে নি'আমত দান করেছেন, তা হিংসুক ব্যক্তির অপছন্দ করা আল্লাহর ফায়ছালার বিরোধিতা করার নামান্তর।

(২) হিংসা সৎ আমলগুলোকে ঠিক তেমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমনভাবে আগুন জ্বালানী কাঠকে খেয়ে ফেলে:

কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিংসুক ব্যক্তি হিংসাকৃত ব্যক্তির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে; অপছন্দনীয় বিষয় আলোচনা করার মাধ্যমে, তার থেকে মানুষকে ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে, তার মর্যাদাহানি করার মাধ্যমে এবং এগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্ম করার মাধ্যমে। আর এটি ঐসকল কাবীরাহ গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো কখনো কখনো সৎ আমল সমূহকে নষ্ট করে দেয়।

(৩) একজন হিংসুক ব্যক্তির অন্তরে এমন দুঃখ এবং প্রজ্জ্বলিত আগুন পতিত হয়, যা তাকে পরিপূর্ণরূপে খেয়ে ফেলে:

ফলে যখনই ঐ হিংসুক ব্যক্তি কোনো হিংসাকৃত ব্যক্তির উপর আল্লাহর কোনো নি'আমত দেখতে পায়, তখনই তার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং সে হিংসুক ব্যক্তি তাকে নজরে রাখে। যখনই আল্লাহ তার উপর কোনো নি'আমত দান করেন, তখনই সে দুঃখিত হয় এবং তার উপর দুনিয়া সংকীর্ণ হয়ে যায়।

(৪) নিশ্চয় হিংসার মাঝে ইয়াহূদীদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে:

আর এটি জানা বিষয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি কাফেরদের আচরণগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি আচরণ করে, তাহলে এই আচরণের দিক দিয়ে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে, তাহলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪১]

---

[৪১] ছ্বহীহ: সুনান আবু-দাউদ হা/৪০৩১, আলবানী, ইরওয়া হা/১২৬৯।

(৫) হিংসুকের হিংসা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সে কখনো অন্যের থেকে আল্লাহর নি‘আমত সরিয়ে নিতে সক্ষম নয়, বরং সে অক্ষম। তাহলে কেন তাদের অন্তরে হিংসা পতিত হয়?

(৬) হিংসা পরিপূর্ণ ঈমানের বিরোধী:

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না; যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে”।[৪২]

এই হাদীছটি তোমার ভাইয়ের উপর থেকে আল্লাহর নি‘আমত চলে যাওয়া তোমার অপছন্দ করাকে আবশ্যক করে। অতএব, যদি তার থেকে আল্লাহর নি‘আমত চলে যাওয়া তুমি অপছন্দ না কর; তাহলে তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য তা অপছন্দ করলে না, যা তুমি তোমার নিজের জন্য অপছন্দ কর। আর এটিই হলো পরিপূর্ণ ঈমানের বিপরীত।

(৭) হিংসা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করা থেকে মানুষের বিরত থাকাকে আবশ্যক করে:

ফলে তুমি হিংসুক ব্যক্তিকে সর্বদা এমন নি‘আমতের প্রতি আগ্রহী দেখতে পাবে, যে নি‘আমত আল্লাহ অন্যের উপর দান করেন। অথচ সে নিজের জন্য আল্লাহর নিকটে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ اسْأَلُوْا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾

“আর যে নি‘আমতের দ্বারা আল্লাহ তোমাদের একজনের উপর আরেকজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তোমরা তা আকাঙ্খা করো না। পুরুষরা যা উপার্জন করে, তা থেকে তাদের জন্য একটি অংশ রয়েছে। আর মহিলারা যা উপার্জন করে, তা থেকে তাদের জন্য একটি অংশ রয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর নিকটে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো”। সূরা আন-নিসা ৪:৩২।

---

[৪২] মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩, মুসলিম হা/৪৫।

(৮) নিশ্চয় হিংসুক ব্যক্তির উপর আল্লাহর যে নি‘আমত রয়েছে, হিংসা তা অবজ্ঞা করাকে আবশ্যক করে:

অর্থাৎ হিংসুক ব্যক্তি মনে করে যে, সে কোনো নি‘আমতের মাঝেই নেই। আর সে মনে করে যে, হিংসাকৃত ব্যক্তি তার চেয়ে অনেক বেশি নি‘আমতের মাঝে রয়েছে। আর এই সময় সে তার নিজের উপর আল্লাহর নি‘আমতকে অবজ্ঞা করে। ফলে সে এই নি‘আমতের কৃতজ্ঞতা শিকার করে না। বরং সে (তা থেকে) বিরত থাকে।

(৯) হিংসা একটি খারাপ স্বভাব:

কেননা হিংসুক ব্যক্তি তার সমাজে সৃষ্টির উপর আল্লাহর নি‘আমত অনুসন্ধান করে। আর সে তার সক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের মাঝে এবং হিংসাকৃত ব্যক্তির মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালায়; কখনো কখনো হিংসাকৃত ব্যক্তির মর্যাদাহানি করার মাধ্যমে এবং কখনো কখনো হিংসাকৃত ব্যক্তি যে ভালো কাজ করে, তা অবজ্ঞা করার মাধ্যমে।

(১০) নিশ্চয় হিংসুক ব্যক্তি যখন হিংসা করে, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিংসাকৃত ব্যক্তির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে:

এর ফলে হিংসাকৃত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ঐ হিংসুক ব্যক্তির নেকআমলসমূহ গ্রহণ করবে। আর যদি তার নেক আমলসমূহ না থাকে, তাহলে তার বদআমলসমূহ নিয়ে তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে। আর হিংসুক ব্যক্তি হিংসাকৃত ব্যক্তির বদআমলসমূহ গ্রহণ করবে।

সরাংশ: অবশ্যই হিংসা একটি মন্দ স্বভাব। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, হিংসা একটি মন্দ স্বভাব হওয়া সত্ত্বেও, অধিকাংশ ‘আলিম, ছাত্র এবং ব্যবসায়ীর মাঝে এটি দেখা যায়। তাদের একজন আরেকজনের প্রতি হিংসা করে। আর প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার অংশীদারের সাথে হিংসা করে। কিন্তু আরো পরিতাপের বিষয় এই যে, ‘আলিমগণের মাঝে এবং ছাত্রদের মাঝে হিংসা আরো বেশি। অথচ সর্বোত্তম হলো ‘আলিমগণ মানুষকে হিংসা থেকে দূরে রাখবে এবং পরিপূর্ণ ভাল আচরণের দিকে আহ্বান করবে।

হে আমার ভাই! যখন তুমি দেখবে আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দার উপর নি‘আমত দিয়েছেন, তখন তুমি তার মত হওয়ার চেষ্টা কর এবং আল্লাহ যার উপর নি‘আমত দিয়েছেন, তাকে তুমি অপছন্দ করো না। বরং তুমি বল:

اَللَّهُمَّ زِدْهُ مِنْ فَضْلِكَ وَ أَعْطِنِي أَفْضَلُ مِنْهُ

“হে আল্লাহ! তার প্রতি আপনার অনুগ্রহ বৃদ্ধি করে দিন এবং তার চেয়ে অধিকতর উত্তম অনুগ্রহ আমাকে দান করুন”।

আর হিংসা অবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে পারে না। বরং এটি দশটি অকল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে, আমরা যেগুলো এইমাত্র কিতাবটিতে উল্লেখ করলাম। আর যে ব্যক্তি যত আসা করবে, সে ব্যক্তি তত বেশি পাবে।

২. ‘ইল্ম ছাড়া ফাতাওয়া দেওয়া (الإفتاء بغير علم):

ফাতাওয়া দেয়া একটি বড় যোগ্যতার কাজ। একারণে সাধারণ মানুষের নিকটে তাদের দীনের বিষয়ে যা সমস্যাপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা করার জন্য একজন ফাত্ওয়া প্রদানকারী উদ্যোগ নেন এবং তাদেরকে সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকনে। একারণেই ফাত্ওয়া প্রদানের যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কেউ এই বড় পদটির জন্য নেতৃত্বে থাকে না। এজন্য আল্লাহকে ভয় করা এবং ‘ইল্ম ও বুদ্ধিমত্তা থেকে কথা বলা সকল বান্দাদের উপর আবশ্যক। আর তাদের এটা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ এক। সৃষ্টিজগৎ এবং সমস্ত আদেশ তারই। অতএব, আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টিকর্তা নেয়, আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টি জগতের কোনো পরিচালক নেয় এবং আল্লাহর বিধি-বিধান ছাড়া সৃষ্টি জগতে কোনো বিধি-বিধান বৈধ হতে পারে না। অতএব, তিনি সেই সত্তা, যিনি কোনো জিনিসকে ফরয করেন, হারাম করেন, নফল করেন এবং হালাল করেন। আর যারা তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় যে জিনিসকে হালাল করে এবং হারাম করে, আল্লাহ তা অবশ্যই প্রতাখ্যান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُوْنَ* وَ مَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

“হে নাবী! আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিয্ক অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা তার কিছুকে হারাম এবং কিছুকে হালাল করেছো? আপনি বলুন, আল্লাহ কি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছো? যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, কিয়ামতের দিন (তার পরিণতি সম্পর্কে) তাদের ধারণা কি”? সূরা ইউনুস ১০:৫৯-৬০। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

“তোমাদের জিহ্বা যেসব মিথ্যা বর্ণনা করে, তার কারণে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করার জন্য তোমরা একথা বল না যে, এটি হালাল; আর এটি হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে, তারা কখনোই কৃতকার্য হয় না। (এসব মিথ্যাচারে লাভ হয়) সামান্য ভোগসামগ্রী। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি”। সূরা আল-নাহল **১৬:১১৬-১১৭**।

আর নিশ্চয় এটি কাবীরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত যে, কোনো জিনিস সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি বলবে, এটি হালাল। অথচ সে জানে না এই জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহ কি বিধান দিয়েছেন। অথবা ঐ জিনিস সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি বলবে, এটি হারাম। অথচ সে ব্যক্তি এ ব্যাপারে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জানে না। অথবা ঐ জিনিস সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি বলবে: এটি ফর্‌য। অথচ সে ব্যক্তি জানে না যে, আল্লাহ তা‘আলা এটি ফর্‌য করেছেন। অথবা ঐ জিনিস সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি বলবে: নিশ্চয় এটি ফর্‌য নয়। অথচ সে ব্যক্তি জানে না যে, আল্লাহ তা‘আলা এটি ফর্‌য করেননি। নিশ্চয় এগুলো (বলা) পাপ এবং আল্লাহর সাথে খারাপ আচরণ। হে বান্দা! আল্লাহর আগে আগে কথা বলার পরও তুমি কিভাবে জানলে যে, সমস্ত বিধান আল্লাহর জন্য? অতঃপর আল্লাহর দীনের ব্যাপারে এবং তার বিধি-বিধানের ব্যাপারে এমন কথা বল, যা তুমি জানো না? অবশ্যই আল্লাহ তার ব্যাপারে ‘ইল্‌ম ছাড়া কোনো কথা বলাকে তাঁর প্রতি শির্‌ক করার সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوْا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَ أَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

“(হে নবী)! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতাকে, পাপ কাজকে, অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়িকে, আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করাকে; যে ব্যাপারে তিনি কোনো দলীল অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের এমন কথা বলাকে, যা তোমরা জানো না। সূরা আল-আ’রাফ ৭:৩৩।

আর নিশ্চয় অনেক সাধারণ মানুষ এমন কিছুর ব্যাপারে একে অপরকে ফাত্‌ওয়া দেয়, যা তারা জানে না। অতএব, তুমি তাদেরকে বলতে দেখবে: এটি হালাল

বা হারাম বা ফর্‌য অথবা নফ্‌ল। অথচ তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাহলে এসকল লোক কি জানে না যে, তারা যা বলে, সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন?! তারা কি জানে না যে, তারা যখন কোনো ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করবে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য যা হারাম করেছেন, তার জন্য তা হালাল করার মাধ্যমে অথবা আল্লাহ তার জন্য যা হালাল করেছেন, তা তার জন্য হারাম করার মাধ্যমে; তখন তারা ঐ ব্যক্তির পাপ (নিজেরাই) বয়ে আনবে এবং ঐ ব্যক্তি যে ভুল আমল করবে, তার সমপরিমাণ পাপ তাদের উপর বর্তাবে? আর তারা ঐ ব্যক্তিকে যে ভুল ফাত্‌ওয়া দিয়েছে, তার কারণেই এটি সংঘটিত হবে। আর নিশ্চয় কিছু সাধারণ মানুষ অনান্য পাপ করে। যখন সে এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখে, যে ব্যক্তি কোনো 'আলিমের নিকটে ফাত্‌ওয়া চাওয়ার জন্য কামনা করে; তখন সে সাধারণ লোকটি তাকে বলে: তোমার ফাত্‌ওয়া চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এটি সুস্পষ্ট বিষয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি হালাল হওয়া সত্ত্বেও সে বলে যে, এটি হারাম বিষয়। ফলে আল্লাহ তার জন্য যা হালাল করেছেন, ঐ সাধারণ লোকটি তার জন্য সেটি হারাম করে দেয়। অথবা ঐ সাধারণ লোকটি তাকে বলে: এটি ফরয বিষয়। ফলে আল্লাহ তার জন্য যা ফরয করেননি, সে তার জন্য তা ফরয করে দেয়। অথবা সে সাধারণ লোকটি বলে: এটি নফ্‌ল বিষয়। অথচ এটি আল্লাহর শারী'আতে ফর্‌য বিষয়। ফলে আল্লাহ তার উপর যা ফর্‌য করেছেন, তা তার থেকে বাদ পড়ে যায়। অথবা সে লোকটি বলে: এটি হালাল বিষয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি হারাম বিষয়। আল্লাহর শরী'আতের ব্যাপারে এগুলো কথা বলা ঐ সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে একটি পাপ এবং তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে প্রতারণার শামিল। যেহেতু সে তাকে 'ইল্‌ম ছাড়া ফাত্‌ওয়া দিয়েছে। তুমি কি মনে কর, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো একটি দেশের কোনো পথ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তারপর যদি তুমি এখান থেকে পথটি বলে দাও, অথচ তুমি জানো না। তাহলে কি মানুষ এটাকে তোমার পক্ষ থেকে প্রতারণা ধরে নিবে না? তাহলে কিভাবে তুমি জান্নাতের পথ সম্পর্কে কথা বল, অথচ তুমি তা সম্পর্কে কিছুই জান না?! আর এই পথটি এমন একটি পথ, যার ব্যাপারে আল্লাহ বিধান অবতীর্ণ করেছেন?! আর নিশ্চয় কিছু শিক্ষার্থী হলো অর্ধেক 'আলিম। সাধারণ মানুষ সাহসের কারণে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে যেসকল বিষয়ে ফাত্‌ওয়া দেয়, তারা ঠিক সেসকল বিষয়ে ফাত্‌ওয়া দেয়।

বিষয়গুলো হলো: হালাল করা, হারাম করা এবং ফরয করা। তারা যা জানে না, সে ব্যাপারে কথা বলে। তারা শারী'আতের ব্যাপারে কমায় এবং বাড়ায়। আর

আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে তারা হলো সবচেয়ে অজ্ঞ মানুষের অন্তর্ভুক্ত। যখন তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকে কথা বলতে শুনবে, তখন যেন মনে হয় তার দৃঢ়ভাবে কথা বলার ব্যাপারে তার উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। ফলে সে এটা বলতে সক্ষম হয় না, “আমি জানি না”। তার ‘ইল্‌ম না থাকা সত্ত্বেও সে যেন সত্যের প্রতীক। এছাড়াও সে মনে করে যে, সে একজন ‘আলিম। এভাবে সে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে। কেননা কখনো কখনো সাধারণ মানুষ তার উপর আস্থাশীল হয় এবং তার দ্বারা প্রতারিত হয়। এসকল মূর্খ জাতি তাদের কথার সম্বন্ধ তাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না। বরং তুমি তাদেরকে দেখবে, তারা তাদের কথাটিকে ইসলাসের দিকে সম্বন্ধ করে বলে: “ইসলাম এরূপ বলে, ইসলাম এরূপ মনে করে”। অথচ এটি কোনো ক্ষেত্রে বৈধ নয়। তবে ঐ ক্ষেত্রে বৈধ, যে ক্ষেত্রে কোনো প্রবক্তা জেনে বলে যে, এটি দীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। আর জানার কোনো পথ নেই আল্লাহর কুরআন, রাসূলের হাদীছ অথবা মুসলিমদের ঐকমত্যের জ্ঞান রাখা ছাড়া। নিশ্চয় কিছু মানুষ তাদের সাহসের কারণে, তাদের অসতর্কতার কারণে, লজ্জাহীনতার কারণে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের ভয় না থাকার কারণে কোনো স্পষ্ট হারাম বিষয় সম্পর্কে বলে থাকে: “আমি এটিকে হারাম মনে করি না”। অথবা কোনো স্পষ্ট ফর্‌য বিষয় সম্পর্কে বলে থাকে: “আমি এটিকে ফর্‌য মনে করি না”। হয় তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে এটা বলে বা বিরোধিতা এবং অহংকারের কারণে অথবা আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তার বান্দাদেরকে সন্দেহে পতিত করার জন্য। আর অবশ্যই বিবেক , ঈমান, আল্লাহভীতি এবং তার বড়ত্ব ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হলো যে, কোনো ব্যক্তি যে সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, সে সম্পর্কে বলবে: “আমি জানি না, আমি এবিষয়ে অন্যকে জিজ্ঞেস করব”। অতএব, নিশ্চয় এটি পরিপূর্ণ বিবেকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা মানুষ তার গ্রহণযোগ্যতা দেখে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর অবশ্যই একথা বলা ঈমান এবং আল্লাভীতির অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু সে তার প্রতিপালকের আগে আগে কথা বলে না এবং না জেনে তার দীনের ক্ষেত্রে তার ব্যাপারে কথা বলে না।

আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে ব্যাপারে তার উপর কোনো ওহী অবতীর্ণ হয় নি। তারপর তার উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। অথচ তিনি আল্লাহর দীনের ব্যাপারে সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ। তারপর যে সম্পর্কে আল্লাহর নাবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ নিজে জবাব দিয়েছিলেন:

﴿يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾

“তাদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, পবিত্র জিনিসগুলো তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে”। সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৪। আল্লাহ আরো বলেন,

﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾

“তারা আপনাকে যুল ক্বর্‌নাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, অচিরেই আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে বলব”। সূরা আল-কাহাফ ১৮:৮৩। তিনি আরো বলেন,

﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾

“তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, কখন কিয়ামত হবে? আপনি বলুন, কেবলমাত্র এই জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকটেই (রয়েছে)। তিনি এর সঠিক সময়ে এটি প্রকাশ করবেন”। সূরা আল-আরাফ ৭:১৮৭।

আর যখন মর্যাদাবান ছাহাবীগণের নিকটে এমন মাসআলাহ পেশ করা হতো, যার ব্যাপারে তারা আল্লাহর বিধান জানতেন না; তখন তারা এর জবাব দিতে দ্বিধা করতেন। অতএব, জেনে রাখো! আবূ বকর আছ-ছিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন,

أَيْ سَمَاءُ تَظُلُّنِيْ، وَ أَيْ أَرْضُ تَقِلُّنِي إِذَا أَنَا قُلْتُ فِيْ كِتَابِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

“হে আসমান! তুমি আমার উপর অন্ধকার হয়ে যাবে, আর হে যমীন! তুমি আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে; যখন আমি আল্লাহর কুর্‌আনের ব্যাপারে ‘ইল্‌ম ছাড়া কথা বলব”।

এছাড়া আরও জেনে রাখো! একদা উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকটে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল। তারপর তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য ছ্বা‘হাবীগণকে একত্রিত করেছিলেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَلْيَقُلْ بِهِ، وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُوْلَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ

“হে মানুষ সকল! যদি কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো ‘ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যা সে জানে; তাহলে সে যেন সে ব্যাপারে কথা বলে। আর যার নিকটে ‘ইল্‌ম নেই সে যেন বলে: اللهُ أَعْلَمُ (আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে জ্ঞানী)। কেননা যা সে জানে না, সে ব্যাপারে একথা বলা ‘ইল্‌ম এর অন্তর্ভুক্ত।

আশ-শা’বী (রাহিমাহুল্লাহ) কে একটি মাসআলাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তারপর তিনি বললেন, “আমি এর উত্তর ভালো জানি না”। তারপর তার সঙ্গীরা তাকে বললেন, “নিশ্চয় আমরা আপনাকে ‘জানি না’ কথাটি বলতে লজ্জা পাই”। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, “কিন্তু ফেরেশ্‌তাগণ ‘জানি না’ কথাটি বলতে লজ্জা পান না, যখন তারা বলেন,

﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾

“আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, সেটা ছাড়া আমাদের কোনো ‘ইল্‌ম নেই”। সূরা আল-বাক্বারা ২:৩২।

আর এখানে ‘ইল্‌ম ছাড়া ফাত্‌ওয়া দেওয়ার ব্যাপারে অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সেগুলোর মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত হলো: যখন অসুস্থ ব্যক্তির কাপড় অপবিত্র হয় এবং সে তা পবিত্র করতে সক্ষম না হয়, তখন তার ব্যাপারে ফাত্‌ওয়া দেওয়া হয় যে, তার কাপড় পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সে ছ্বলাত আদায় করবে না। আর এটি মিথ্যা, ভুল এবং বতিল ফাত্‌ওয়া। সঠিক ফাত্‌ওয়া হলো: অসুস্থ ব্যক্তি ছ্বলাত আদায় করবে। যদিও তার শরীরে অপবিত্র কাপড় থাকে, যদিও তার শরীর অপবিত্র হয়। এটি ঐ সময় জায়েয হবে, যখন সে তার কাপড় পবিত্র করতে সক্ষম হবে না। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“অতএব, তোমরা তোমাদের সক্ষমতা অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো”। সূরা আত্-তাগাবুন ৬৪:১৬।

অতএব, অসুস্থ ব্যক্তি তার অবস্থা এবং সক্ষমতা অনুযায়ী ছ্বলাত আদায় করবে। সে দাঁড়ানো অবস্থায় ছ্বলাত আদায় করবে। কিন্তু সে যদি সক্ষম না হয়, তাহলে কিছু ‘আলিমের মতে সে হুবহু ইশারা করে ছ্বলাত আদায় করবে। অতএব, যদি সে ইশারা করতেও সক্ষম না হয়, অথচ তার জ্ঞান রয়েছে; তাহলে সে যেন অন্তর দ্বারা ছ্বলাতের নিয়্যাত করে এবং তার জিহ্বা দ্বারা কথা বলে।

উদাহরণস্বরূপ, সে বলবে: اَللهُ أَكْبَرُ । তারপর সূরাহ ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরাহ পাঠ করবে। অতঃপর সে বলবে: اَللهُ أَكْبَرُ এবং রুকু করার নিয়্যাত করবে। তারপর সে বলবে: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর নিয়্যাত করবে। অতঃপর সে সিজদাহ এবং ছ্বলাতের অবশিষ্ট কর্মগুলোর ক্ষেত্রেও অনুরূপ বলবে। সে ছ্বলাতের মধ্যে যেগুলো কাজ করতে সক্ষম নয়, অন্তর দ্বারা সেগুলো কাজের নিয়্যাত করবে এবং ছ্বলাতকে তার নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে পিছিয়ে দেবে না।

আর এই মিথ্যা ও ভুল ফাত্‌ওয়ার কারণে কিছু মুসলিম মারা যায়, অথচ এই ভুল ফাত্‌ওয়ার কারণে তারা ছ্বলাত আদায় করে না। যদিও তারা জানে যে, অসুস্থ মানুষ যে অবস্থাতেই ছ্বলাত আদায় করে মারা যাবে, তারা ছ্বলাত আদায়কারী হিসাবে গণ্য হবে। আর এধরনের অনেক মাসআলা রয়েছে।

অতএব, সাধারণ মানুষের উপর আবশ্যক হলো যে, তারা 'আলিমদের নিকট থেকে এসকল মাসআলার বিধি-বিধান শিখে নিবে। এমনকি তারা এব্যাপারে আল্লাহর বিধান জেনে নিবে এবং না জেনে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তারা কোনো কথা বলবে না।

৩. অহংকার করা:

অবশ্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্টভবে "অহংকার" এর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ

"হিংসা হলো: সত্যকে দম্ভের সাথে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা"।[৪৩]

এখানে, بَطَرُ الْحَقِّ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: رَدُّ الْحَقِّ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং غَمْطُ النَّاسِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: احْتِقَارُ النَّاسِ মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা।

তোমার শিক্ষকের সাথে তোমার বাড়াবাড়ি করা এবং তার সাথে খারাপ আচরণ করা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আর এটিও অহংকারের অন্তর্ভুক্ত যে, তোমার চেয়ে

---

[৪৩] ছ্বহীহ মুসলিম; হা/৯১, তিরমিযী হা/১৯৯৯, ইবনে হিব্বান ১২/২৮০।

নিচু পর্যায়ের কোনো ব্যক্তি তোমার কোনো উপকার করে, অথচ তুমি ঐ ব্যক্তি থেকে বিরত থাক। আর এধরনের কাজ কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে সংঘটিত হয়। যখন ‘ইল্‌মের ক্ষেত্রে নিম্ন পর্যায়ের কোনো ছাত্র তাদের নিকটে কোনো বিষয়ে সংবাদ দেয়, তখন তারা অহংকার করে এবং তার সংবাদটি গ্রহণ করে না। যেমনভাবে স্রোত উঁচু স্থান থেকে ডানে ও বামে প্রবাহিত হয় এবং তাতে স্থির থাকে না, ঠিক তেমনভাবে ‘ইল্‌ম অহংকার এবং বড়ত্বের সাথে স্থির থাকে না। আর কখনো কখনো অহংকার এবং বড়ত্বের কারণে ‘ইল্‌মকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

৪. বিভিন্ন মাযহাব এবং মতের পক্ষাবলম্বন করা (التعصب للمذاهب والآراء):

দলাদলি এবং দলীয় মনোভাব থেকে মুক্ত থাকা একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। কেননা এর ফলে কোনো নির্দিষ্ট দলের সাথে বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা সংঘটিত হয়। অতএব, কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি সালাফে ছ্বলিহগণের কর্মপন্থার বিপরীত। সালাফে ছ্বলিহগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত নয়। বরং তারা সকলেই একটি দলে ঐক্যবদ্ধ। তারা সকলেই আল্লাহর একটি বাণীর ছায়াতলে একত্রিত হয়েছেন। বাণীটি হলো,

﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾

“তিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন মুসলিম”। সূরা আল-হজ্জ্ব; ২২:৭৮।

সুতরাং কোন দলাদলি বা একাধিক ভাগে বিভক্ত হওয়ার সুযোগ নেই, কুরআন ও সুন্নাহতে যা এসেছে তা ব্যতীত কোন বন্ধুত্ব ও শত্রুতা নেই। অনেক মানুষ এমন আছে যারা - উদাহরণস্বরূপ- কোন একটি নির্দিষ্ট দলের সাথে জড়িয়ে পড়ে এর মানহাজকে স্বীকৃতি দেয় এবং তার পক্ষে এমন কিছু দলীল পেশ করে থাকে, যা মূলত তার বিরুদ্ধেই দলীল। (এরপর) সে এটার পক্ষে কথা বলে আর তার দলের বাইরের সবাইকে বিভ্রান্ত বলে মনে করে, যদিও অনেক সময় (যার বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে) ঐ তার থেকে হক্বের নিকটবর্তী হয়ে থাকে। এই ব্যক্তি একটি মূলনীতি গ্রহণ করে থাকে, তা হলঃ যে আমার (দলের) সঙ্গে নেই সেই আমার বিরোধী। এটি একটি জঘন্য মূলনীতি; কেননা তোমার পক্ষে এবং বিপক্ষের মধ্যেও একটি সম্পর্ক আছে। যখন হক্বের কারণে কেউ তোমার বিরোধী, সে যেন তোমার বিরোধীতা করার মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে তোমার পক্ষে রয়েছে। কেননা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"

তোমার ভাইকে সাহায্য কর, হোক সে জালিম অথবা মজলুম।[88]

আর অত্যাচারী ব্যক্তিকে সাহায্য করার অর্থ হলো: অত্যাচার থেকে তাকে তোমার বাধা দেওয়া। অতএব, ইসলামে কোনো দলাদলী নেই। আর একারণেই যখন মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন দল প্রকাশিত হলো, মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হলো, তাদের একজন আরেকজনকে পথভ্রষ্ট বলতে থাকলো এবং তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে থাকলো (গীবত করতে থাকলো); তখন তারা দুর্বল হয়ে পড়লো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

"আর তোমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব করো না, (যদি দ্বন্দ্ব কর) তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে"। সূরা আল-আন্‌ফাল ৮:৪৬।

আমরা কোন কোন শিক্ষার্থীকে দেখতে পাই; যে শিক্ষার্থী শাইখগণের মধ্য থেকে কোন একজন শাইখ এর নিকটে থাকে। ন্যায় ও অন্যায় উভয়ের ক্ষেত্রেই সে ঐ শাইখ এর পক্ষ সমর্থন করে। আর অন্য শাইখ এর বিরোধিতা করে, অন্য শাইখকে পথভ্রষ্ট এবং বিদ'আতী বলে। আর সে মনে করে যে, তার শাইখ হলেন জ্ঞানবান, সংশোধনকারী এবং অন্য শাইখ হলেন মূর্খ অথবা গোলযোগ সৃষ্টিকারী। এটি (ধারণাটি) একটি বড় ভুল। বরং যার মত কুরআন-সুন্নাহ এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবাগণের মতের সাথে মিলে যাবে, তার মত গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫. যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে ফাতাওয়া প্রদান:

ফাত্‌ওয়া প্রদানের যোগ্য হওয়ার পূর্বে একজন শিক্ষার্থীর ফাত্‌ওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কেননা যখন একজন শিক্ষার্থী এরূপ (ফাতাওয়া প্রদান) করবে, তখন এটি কয়েকটি বিষয়ের প্রমাণ হয়ে যাবে।

প্রথম বিষয়: স্বয়ং নিজেকে বিস্মিত করণ। যখন একজন শিক্ষার্থী (যোগ্য হওয়ার পূর্বেই) ফাত্‌ওয়া দিবে, তখন সে নিজেকে দলের নেতাদের মধ্য থেকে একজন নেতা মনে করবে।

---

[88] মুত্তাফাকুন আলাইহি: বুখারী হা/২৪৪৩, মুসলিম হা/২৫৮৪।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ বিষয়গুলো তার না বুঝার উপর প্রমাণ। কেননা যখন একজন শিক্ষার্থী (যোগ্য হওয়ার পূর্বেই) ফাত্ওয়া দিবে; তখন কখনো কখনো সে এমন একটি সমস্যায় পতিত হবে, যা থেকে সে মুক্ত হতে সক্ষম নয়। নিশ্চয় যখন লোকেরা তাকে ফাত্ওয়া দিতে দেখবে, তখন তারা তার নিকট কিছু মাসআলা পেশ করবে, সে মাসআলাগুলোর সমস্যা সমাধান করার জন্য।

তৃতীয় বিষয়ঃ যখন কোন শিক্ষার্থী যোগ্য হওয়ার পূর্বেই ফাত্ওয়া প্রদান করবে; তখন আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কথা বলা তার জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যার উদ্দেশ্য হলো না জেনে ফাত্ওয়া দেওয়া, সে (কোন কিছুকেই) পরোয়া করবে না। তাকে যে ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করা হবে, সে ব্যাপারেই উত্তর দিবে (ফাত্ওয়া দিবে)। আর সে ‘ইল্‌ম ছাড়া তার দীনের ব্যাপারে এবং আল্লাহ’র ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ গ্রহণ করবে।

চতুর্থ বিষয়ঃ যখন কোন মানুষ (যোগ্য হওয়ার পূর্বেই) ফাত্ওয়া দিবে, তখন সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যকে গ্রহণ করবে না। কেননা সে তার নির্বুদ্ধিতার কারণে ধারণা করবে যে, তার নিজের কাছে হক্ব থাকা সত্ত্বেও যখন সে অন্যের অধীন হবে, তখন এই কাজটি এটির উপর দলীল হয়ে যাবে যে, সে ব্যক্তি ‘আলিম নয়।

৬. মন্দ ধারণা করাঃ

অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা করা থেকে বিরত থাকা একজন শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপঃ কোন ব্যক্তির ধারণা করে একথা বলাঃ “অমুক ব্যক্তি শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্যই দান করে; ছাত্রটি শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্যই প্রশ্নের উত্তর দেয়, যেন এটি বুঝা যায় যে, সে একজন জ্ঞানবান ছাত্র”। মুমিনগণের মধ্য থেকে কোন দানকারী ব্যক্তি যখন বেশি পরিমাণে ছ্বদাক্বাহ প্রদান করে, তখন মুনাফিক্বরা বলেঃ “এই ব্যক্তি লোক দেখানো দান করে”। আর যখন ঐ দানকারী ব্যক্তি কম পরিমাণে ছ্বদাক্বাহ প্রদান করে, তখন মুনাফিক্বরা বলেঃ “নিশ্চয় আল্লাহ এই দানের থেকে অমুখাপেক্ষী”। আল্লাহ মুনাফিক্বদের সম্পর্কে বলেন,

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"যারা দোষারোপ করে মুমিনগণের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় ছ্বদাক্বাহ প্রদানকারী মুমিনগণকে এবং তাদেরকে যারা তাদের পরিশ্রম ছাড়া (ছ্বদাক্বাহ করার জন্য) কিছুই পায় না। অতঃপর তারা তাদেরকে (স্বেচ্ছায় দানকারীদেরকে) নিয়ে উপহাস করে। আল্লাহও তাদেরকে নিয়ে উপহাস করেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"। সূরা আত-তাওবা ৭৯:৯।

সুতরাং তুমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা থেকে বিরত থাকো, যার ন্যায়পরায়ণতা সুস্পষ্ট। আর তোমার শিক্ষকের ব্যাপারে বা তোমার সঙ্গীর ব্যাপারে খারাপ ধারণা করার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা যার ন্যায়পরায়ণতা সুস্পষ্ট হয়েছে, তার ব্যাপারে ভাল ধারণা করা অপরিহার্য। পক্ষান্তরে, যার সততা সুস্পষ্ট নয়, তার ব্যাপারে তোমার অন্তরে খারাপ ধারণা হলে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার অন্তরে যে সন্দেহ রয়েছে, তা দূর হওয়া পর্যন্ত (সে ব্যাপারে) নিশ্চিত হওয়া তোমার উপর অপরিহার্য। কেননা কিছু মানুষ মিথ্যা সন্দেহের উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এমন ধারণা করে, যার কোন সত্যতা নেই।

সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি খারাপ ধারণা করবে, সে ব্যক্তি ছাত্রদের মধ্য থেকে হোক অথবা অন্য কেউ হোক; তখন তোমার খারাপ ধারণা করার উপযোগী কোন সুস্পষ্ট চিহ্ন আছে কিনা, তা লক্ষ্য রাখা বাধ্যতামূলক। পক্ষান্তরে, যখন খারাপ ধারণাটি শুধুমাত্র সন্দেহের উপর ভিত্তি করে হবে; তখন ঐ মুসলিমের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা তোমার জন্য বৈধ নয়, যে মুসলিমের ন্যায়নিষ্ঠতা সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি বেশি ধারণা করা থেকে বিরত থাকো"। সূরা আল-হুজরাত ৪৯:১২।

আল্লাহ (একথা) বলেননি: كُلَّ الظَّنِّ (প্রত্যেক ধারণা থেকে)। কেননা কিছু ধারণার ভিত্তি রয়েছে এবং যৌক্তিকতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

"নিশ্চয় কিছু ধারণা পাপ"। সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১২।

সুতরাং যে ধারণায় অন্যের প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি হয়; কোন সন্দেহ নেই যে, সে ধারণাটি হলো পাপ। অনুরূপভাবে যে ধারণার কোন ভিত্তি নেই, (সে ধারণাটিও পাপ)।

পক্ষান্তরে, যদি ধারণাটির কোন ভিত্তি থাকে, তাহলে আলামত ও প্রমাণ অনুযায়ী তোমার মন্দ ধারণা করায় কোন সমস্যা নেই। একারণেই মানুষের জন্য উচিত হলো তার আত্মাকে স্ব-স্থানে জায়গা দেওয়া, ময়লা দ্বারা আত্মাকে কলুষিত না করা এবং উল্লেখিত গুনাহসমূহ থেকে সর্তক থাকা। কেননা আল্লাহ (দীনের) শিক্ষার্থীকে ‘ইল্‌মের কারণে সম্মানিত করেন এবং তাকে (অন্যদের) আর্দশ বানিয়ে দেন। এমনকি মানুষের (দীনের ক্ষেত্রে) সমস্যাপূর্ণ বিষয়গুলোকে ‘আলিমগণের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন,

﴿فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

“অতএব, (হে অজানা লোকেরা!) যদি তোমরা (দীনের কোন বিষয়ে) না জান, তাহলে (তা সম্পর্কে) তোমরা ‘আলিমগণকে জিজ্ঞেস করো”। সূরা আন-নাহল ১৬:৪৩। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ﴾

“আর যখন তাদের নিকটে শান্তি বা ভয়ের কোন সংবাদ আসে, তখন তারা তা প্রচার করে। আর যদি তারা রাসূল এবং তাদের মধ্য থেকে উলূল আম্‌রগণের (অর্থাৎ, ‘আলিমগণের) দিকে সংবাদটি ফিরিয়ে দিত, তাহলে তাদের মধ্য থেকে তথ্য অনুসন্ধানকারীগণ তার যথার্থতা উপলব্ধি করতেন”। সূরা আন-নিসা ৪:৮৩।

অতএব, (আলোচনার) সারাংশ হলো যে, হে শিক্ষার্থী! তুমি সম্মানিত। সুতরাং, তুমি তোমার নিজেকে অপমান এবং নিকৃষ্টতার ক্ষেত্রে নামিয়ে দিও না।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় কিতাব, ফাতাওয়া এবং আনুষঙ্গিক বিষয়

প্রথম পরিচ্ছেদ: শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় কিতাব।

এ পরিচ্ছেদের আলোচনা শুরু করার পূর্বে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা প্রয়োজন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো।

প্রথমত: কি ধরনের কিতাব অধ্যয়ন করবে?

কতিপয় বিষয় সামনে রেখে কিতাবের প্রয়োজন হয়:

(ক) কিতাবের বিষয়বস্তু (موضوع) জেনে নেয়া। মানুষ যেন তা থেকে উপকৃত হতে পারে। এ জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের কিতাব প্রয়োজন। প্রায়ই দেখা যায় যে, যাদু অথবা ভেলকি কিংবা বাতিল বিষয়ের কিতাব রচিত হয়। তাই উপকার লাভের উদ্দেশ্যে কিতাবের বিষয়বস্তু জেনে নেয়া আবশ্যক।

(খ) কিতাবের পরিভাষা (**المصطلحات**) বুঝে নেয়া। কিতাবের পরিভাষা জানা থাকলে অতিরিক্ত সময় নষ্ট হয় না। আলিমগণ কিতাবের ভূমিকায় পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ, আমরা **بلوغ المرام** (বুলুগুল মারাম) প্রণেতার কথা জানি যে, তিনি এ কিতাবে **متفق عليه** (মুত্তাফাকুন আলাইহি) পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ মুত্তাফাকুন আলাইহি পরিভাষাটি দ্বারা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (رحمهما الله) এর বর্ণনা বুঝানো হয়েছে।

অন্যদিকে, **المنتقى** (আল-মুনতাক্বি) কিতাব প্রণেতা এ পরিভাষাটি ব্যবহার করে ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহিমাহুমুল্লাহর বর্ণনা বুঝিয়েছেন। অনুরূপভাবে ফিক্বহী গ্রন্থসমূহে القولان، والوجهان، والروايتان، والاحتمالان ব্যবহৃত ইত্যাদি পরিভাষা নিয়েও অনেক আলিমের মাঝে মতোপার্থক্য রয়েছে। তাই الروايتان বলতে الروايتان عن الإمام ও الوجهان দ্বারা الوجهان عن الأصحاب উদ্দেশ্যে। আর আছহাব হচ্ছে বড় বড় মাযহাবের ইমামগণ যারা أهل التوجيه বা

দিক নির্দেশক। الاحتمالان পরিভাষাটি দ্বারা والاحتمالان للتردد بين قولين এবং القولان বলতে القولان أعم من ذلك كله তথা এসব বিষয় হতে ব্যাপকতর দু'টি কথাকে বুঝানো হয়েছে।

অনুরূপভাবে আরো কিছু পরিভাষা জানা প্রয়োজন। যেমন লেখক إجماعًا أو وفاقًا শব্দ ব্যবহার করলে বুঝতে হবে إجماعًا শব্দ দিয়ে উম্মতের মাঝে ইজমা এবং وفاقًا শব্দ দ্বারা কোন বিষয়ে তিন ইমামের ঐকমত্য পোষণ করা বুঝানো হয়েছে। যেমন হাম্বলী মাযহাবের ফিক্বহ الفروع এর প্রণেতা এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীগণও পরিভাষা ব্যবহার করেন। আসলে এসবই হচ্ছে পরিভাষা। তাই শিক্ষার্থীর জন্য লেখকের পরিভাষার ব্যবহার সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

(গ) পরিভাষা ব্যবহার এবং এর শব্দগুচ্ছ জানা: তুমি প্রথমেই যখন এমন কোন কিতাব পাঠ করবে যা জ্ঞানের কথায় পূর্ণ, তখন এমন কিছু পাঠ্যাংশ পাবে যার অর্থ নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। কেননা পূর্বে তুমি তা সংযোজন করোনি। এ কিতাব বারবার পাঠ করলে ব্যাখ্যামূলক কথাগুলো তুমি সংযোজন করতে পারবে। তাই এখানেও কিতাব ব্যবহারের একটি বহিরাগত বিষয় নিহিত আছে তা হচ্ছে টীকা-টিপ্পনীর সংযোজন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর (জ্ঞান অর্জনের) সুযোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। আর কিতাব পঠনের সময় কোন মাসআলা পরিলক্ষিত হলে তা ব্যাখ্যা করা অথবা সে বিষয়ে দলীল-প্রমাণ পেশ করা কিংবা তা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হবে। তা নাহলে বিষয়টি ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই বিষয়টি টিকা-টিপ্পনীর সাথে সম্পর্কিত যা কিতাবের মূল পাঠের ডানে-বামে উল্লেখ করা থাকে অথবা তা কিতাবের নিম্নভাগে পাদটীকায় উল্লেখিত হয়। এধরনের প্রাসঙ্গিকতার অধিকাংশই মানুষ এড়িয়ে যায়, যদি তা পর্যালোচনা করা হতো তাহলে একটি অথবা দু'টি সূক্ষ্ম বিষয় ছাড়া তুমি এ বিষয়ে নিমগ্ন হতে পারতে না। অতঃপর মানুষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য এ আনুষঙ্গিক আলোচনার দিকে ধাবিত হয়। কিছু সময় এমন হয় যে, উপদেশ গ্রহণের বিষয় থেকেই যায়। আর কোন সময় তা থেকে উপদেশ গ্রহণই করে না। তাই শিক্ষার্থীর উচিত এ বিষয়ে, বিশেষত ফিক্বহী কিতাবে মনোযোগ দেয়া। কতিপয় কিতাবে কোন মাসআলা ও তার হুকুম পরিলক্ষিত হলে তুমি দ্বিধাগ্রস্থ হতে পার এবং জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই এক্ষেত্রে তোমার কাছে থাকা কিতাব

ছাড়াও অধিক ব্যাখ্যাসম্পন্ন কিতাবের শরণাপন্ন হলে এ সমস্যার সমাধান মিলতে পারে। সুতরাং সমস্যার সমাধানের জন্য আরেকবার ব্যাখ্যাসম্পন্ন কিতাব দেখে নিতে হবে। আর কারণ ছাড়া এমনিতেই মূল কিতাব দেখার প্রয়োজনবোধ হলে তা শুধু তোমার সময়কেই বৃদ্ধি করে মাত্র।

দ্বিতীয়: কিতাব অধ্যয়ন দু'ধরনের।

ক. নিগুঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি মূলক অধ্যয়ন। এ ধরনের অধ্যয়নে পাঠকের জন্য আবশ্যক হচ্ছে চিন্তা-ভাবনা করা ও মন্থর গতি অবলম্বন করা।

খ. কিতাবের বিষয়বস্তু এবং তাতে যে সব বিষয়ের আলোচনা আছে তার ভিত্তিতে শুধু অন্বেষণ মূলক অধ্যয়ন। এক্ষেত্রে পাঠক কিতাবের মূলবক্তব্য জেনে নিতে পারে। এসব ব্যাপকতর বিষয় নিহিত থাকা ও দ্রুত কিতাব পাঠ করার কারণে কোন বিষয়ে পাঠক গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না এবং তার নিগুঢ়তত্ত্ব রহস্য উপলব্ধি হয় না যা প্রথমটির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

তৃতীয়: কিতাব একত্রিকরণ (جمع الكتب)।

বিভিন্ন কিতাব সংগ্রহের উপর শিক্ষার্থীর উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। তবে পর্যায়ক্রমে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব সংগ্রহ করতে হবে। আর তোমার কাছে থাকা লোকসংখ্যা (শ্রোতা) কম হলে সেক্ষেত্রে অনেক কিতাব ক্রয় করে রাখা কল্যাণ ও হিকমত (প্রজ্ঞাপূর্ণ) কাজ নয়। কেননা বেশি কিতাব ক্রয় করে তুমি ঋণগ্রস্থ হতে পার। তাই এভাবে খরচ করা ভাল নয়। তাই তোমার অর্থ ব্যয় করে কিতাব ক্রয় করা সম্ভব না হলে তুমি কোন লাইব্রেরী হতে কিতাব ধার নিতে পার।

চতুর্থ: গুরুত্বপূর্ণ কিতাব পঠনের উপর উৎসাহিত হওয়া।

শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক হচ্ছে বর্তমান যুগের লেখকের রচিত কিতাবের চেয়ে মূল কিতাব পঠনের উপর উৎসাহিত হওয়া। কেননা, বর্তমান যুগের কতিপয় লেখকের গভীর জ্ঞান নেই। এ জন্য তাদের কিতাব পাঠ করলে তুমি বুঝতে পারবে তা যেন অগভীর (সারশূন্য)। এ শ্রেণীর লেখকদের কেউ তার

লিখনীতে নিজের (বানানো) শব্দ ব্যবহার করে। আবার কখনো পাঠালোচনা দীর্ঘায়িত করত (মূলপাঠ) পরিবর্তন করে যা অনর্থক বলে গণ্য। তাই শিক্ষার্থীর উচিত সালাফ (পূর্ববর্তীদের) কিতাব অধ্যয়ন করা। কেননা তা পরবর্তী লেখকের রচিত কিতাবের চেয়ে অধিক কল্যাণকর ও উপকারী। আর পরবর্তীদের অধিকাংশ কিতাবই কম অর্থসম্পন্ন এবং অধিক আলোচনায় ভরপুর। তাই পূর্ণ একটি পৃষ্ঠা পাঠ করার পর মাত্র একটি অথবা দু'টি লাইনের মোদ্দা কথা বুঝা সম্ভব হয়। কিন্তু সালাফ (পূর্ববর্তীদের) কিতাবে বোধগম্যতা, প্রাঞ্জলতা, সহজতা ও অর্থের গভীরতা নিহিত আছে। এজন্য তাতে অর্থহীন কোন কথা খুঁজে পাওয়া দুস্কর। আর যেসব কিতাব অধ্যয়নের উপর শিক্ষার্থীর উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত তার মধ্যে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ও তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম জাওজী (রহিমাহুমাল্লাহ) এর কিতাব গুরুত্ব পূর্ণ। জ্ঞাতব্য যে, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) এর কিতাবসমূহ অধিকতর সহজ ও প্রাঞ্জল। কেননা শাইখুল ইসলামের ইলমের গভীরতা ও স্মৃতিশক্তির প্রখরতার কারণে তার কিতাবের ইবারত (বর্ণনাভঙ্গি) সুদৃঢ়-প্রবল। ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বাইতে মা'মূর দেখেছেন। অতঃপর তিনি ছিলেন (ইলমের) অগ্রগতি ও পদক্ষেপ গ্রহণের ধারকবাহক। আমরা এটা বলতে চাই না যে, ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) এর অনুলিপি স্বরূপ। বরং ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন স্বাধীন। তিনি যখন দেখেছেন যে, তার শাইখ তার (ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এর) সঠিক মতামতের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন তখন তিনি ঐ বিষয়ে কথা বলেছেন।

শাইখুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ) মনে করতেন, উজুব (ওয়াজিবিয়াত) কেবল ছাহাবীদের সাথে খাছ-নির্দিষ্ট। তিনি (ইবনুল জাওজী (রহিমাহুল্লাহ)) বলেন, আমি আমাদের শাইখের কথার প্রতি নিবিষ্ট হই। অতঃপর তার বৈপরীত্য কথার ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হয়। শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। কিন্তু তিনি যা হক্ব-সঠিক মনে করেন সে বিষয়ে তার শাইখের অনুসরণ করেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সন্দেহ নেই যে, তুমি যখন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) এর স্বকীয়তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে তখন তা সঠিক হিসাবেই পাবে। আর এ বিষয়টিই তাদের কিতাবের জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পরিচয় দান করে।

পঞ্চম: কিতাবসমূহের জরিপ:

কিতাবসমূহ তিনভাগে বিভক্ত।

(ক) উৎকৃষ্ট মানের কিতাব।

(খ) মন্দ প্রকৃতির কিতাব।

(গ) ভাল-মন্দ কোনটিই নয় বরং মধ্যম মানের কিতাব।

সুতরাং যে কিতাবে কোন কল্যাণমূলক আলোচনা নেই অথবা যার দ্বারা উপকার লাভের সম্ভাবনা নেই তা নিজস্ব পাঠাগার হতে মুক্ত করার ব্যাপারে তোমার উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। যেমন: সাহিত্যের কিতাবাদী। এসব কিতাব পাঠ করে কেবল সময় অপচয় হয় এবং তা থেকে তেমন উপকৃত হওয়া যায় না।

আরো কিছু কিতাব আছে, যেমন নির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও পদ্ধতির ভিত্তিতে রচিত কিতাব যা পাঠ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এধরনের কিতাবাদীও লাইব্রেরীতে রাখা ঠিক হবে না; হোক তা কোন মানহাজ (রীতি-নীতির) উপর রচিত কিতাব কিংবা আক্বীদা বিষয়ক কিতাব। যেমন: বিদ'আতীদের কিতাব, যা আক্বীদার জন্য ক্ষতিকারক। বিদ্রোহমূলক কিতাব, যা মানহাজের (পালনীয় রীতির) জন্য ক্ষতিকারক। এসবই ক্ষতিকারক কিতাব, যা লাইব্রেরীতে রাখা ঠিক নয়। কেননা কিতাব হচ্ছে আত্মার খাবার যেমন পানীয় শরীরের খাবার। এসকল (ভ্রান্ত) কিতাবকে তুমি যদি আত্মার খাবার হিসেবে গ্রহণ করো তাহলে তা তোমার মারাত্মক ক্ষতিই করবে। ফলে তখন বিপরীত পথে ধাবিত হয়ে ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি হতে তুমি হবে বিচ্যুত।

শিক্ষার্থীর জন্য নির্বাচিত কিতাব

প্রথম: আক্বীদা (العقيدة):

১. ثلاثة الأصول (ছালাছাতুল উছুল)।

২. "القواعد الأربع" (আল-ক্বাওয়াঈদুল আরবাহ)।

৩. "كشف الشبهات" (কাশফুশ শুবহাত)।

৪. "التوحيد" كتاب (কিতাবুত তাওহীদ)।[৪৫] এ চারটি কিতাবের লেখক ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব (রহিমাহুল্লাহ)।

৫. كتاب العقيدة الواسطية وتتضمن توحيد الأسماء والصفات **কিতাবুল আক্বীদা আল-ওয়াসেত্বীয়া**, যা তাওহীদুল আসমা ও ছিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণবাচক তাওহীদ) বিষয়ক কিতাব।[৪৬] এ অধ্যায়ে উল্লেখিত কিতাবাদীর মধ্যে এ কিতাব উত্তম, যা পঠন ও পুনরাবৃত্তির জন্য নির্ভরযোগ্য।

৬. "الحموية" كتاب কিতাব: আল হুমুবিয়াহ।

৭. "التدمورية" كتاب এ দু'টি কিতাব ওয়াসেত্বীয়ার চেয়ে ব্যাপকতর। ৫ নং হতে ৭ নং পর্যন্ত কিতাব তিনটির লেখক ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)।

৮. كتاب العقيدة الطحاوية **(আল-আক্বীদা আত-ত্বাহাবীয়াহ)**।[৪৭] কিতাবটির লেখক শাইখ জা'ফর মুহাম্মদ ত্বাহাবী (রহিমাহুল্লাহ)।

৯. كتاب شرح العقيدة الحاوية **(কিতাবু শারহুল আক্বীদা আত ত্বহাবীয়া)**[৪৮] নামক কিতাবের লেখক আবূল হাসান আলী ইবনে আবিল ইয্‌য (রহিমাহুল্লাহ)।

১০. كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية এ কিতাবের সংকলক শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম (রহিমাহুল্লাহ)।

১১. "الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية" كتاب এ কিতাবের লেখক মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস-সিফারিনী আল-হাম্বলী (রহিমাহুল্লাহ)। এ কিতাবে সালাফী মানহাজ বিরোধী কিছু কথা রয়েছে। যেমন: আমাদের প্রভু কোন রত্নাদি, আবশ্যকীয় বস্তু এবং দেহ নন। এ জন্য শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক হচ্ছে সালাফী

---

[৪৫] মাকতাবাতুস সুন্নাহ হতে প্রকাশিত
[৪৬] মাকতাবাতুস সুন্নাহ হতে প্রকাশিত
[৪৭] মাকতাবাতুস সুন্নাহ হতে প্রকাশিত
[৪৮] মাকতাবাতুস সুন্নাহ হতে প্রকাশিত

আক্বীদার সাথে শাইখের কথা মিলিয়ে জেনে বুঝে পাঠ গ্রহণ করা; যাতে সালাফে ছ্বলিহীনের আক্বীদা বিরোধী কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয়: হাদীছ (الحديث):

১. **فتح الباري شرح صحيح البخاري** (ফাতহুল বারী): এ কিতাব (ছ্বহীহ বুখারীর) ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ)।

২. **سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني** (সুবুলুস সালাম): এ জামে'উ গ্রন্থ যা হাদীছ এবং ফিক্বহী আলোচনা বিশিষ্ট।

৩. **نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني** (নাইলুল আওত্বার): এটি শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

৪. **عمدة الأحكام للمقدسي** (উমদাতুল আহকাম): এ কিতাবের লেখক মাকদেসী (রহিমাহুল্লাহ)। এটি একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব। এ কিতাবের সকল হাদীছ ছ্বহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে। তাই এ কিতাবের হাদীছসমূহের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়োজন নেই।

৫. **الأربعين النووية لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى** (আরবাঈন) এ কিতাবের লেখক আবূ যাকারিয়া নববী (রহিমাহুল্লাহ)। এটি একটি ভাল কিতাব। কেননা এ কিতাবে আদব (শিষ্টাচার), উত্তম মানহাজ (রীতিনীতি) এবং অত্যন্ত উপকারী পন্থা আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"

কারো জন্য ইসলামের উত্তমতা হচ্ছে এমন জিনিস পরিত্যাগ করা যা তার কাজে আসে না।[৪৯]

এ হাদীছ থেকে যে রীতি সাব্যস্ত হয় তা যদি কেউ অনুসরণ করে তাহলে তা যথেষ্ট বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে বাক্যালাপের ক্ষেত্রেও এ কিতাবে হাদীছের আলোকে রীতি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন:

---

[৪৯] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২৩১৭, ইবনে মাজাহ হা/ ৩৯৭৬।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

যে আল্লাহ তা‘আলা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে নচেৎ চুপ থাকে।[৫০]

৬. كتاب بلوغ المرام (বুলূগুল মারাম) এটি হাফেজ ইবনে হাজার আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ) এর কিতাব যা (সার্বজনীন বিষয়ে) উপকারী। বিশেষত তিনি এ কিতাবে বিশস্ত রাবীর বর্ণিত ছ্বহীহ হাদীছ উল্লেখ করেছেন এবং দুর্বল হাদীছ চিহ্নিত করেছেন।

৭. كتاب نخبة الفكر এ গ্রন্থেরও লেখক হাফেজ ইবনে হাজার আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ)। কিতাবটিকে জামে‘উ গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষার্থীরা যদি এ কিতাব পূর্ণাঙ্গরূপে বুঝে এবং এর উপর নির্ভর করে তাহলে তা (যথেষ্ট হওয়ার) কারণে তারা পরিভাষাগত অনেক কিতাব অধ্যয়ন করা হতে নিবৃত হবে। আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ) এর লিখনীতে অনেক উপকারী পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তার লিখনীতে রয়েছে মৌলিক বিষয় ও কাঠামো। তাই এ গ্রন্থ পাঠ করলে শিক্ষার্থী হবে প্রাণবন্ত-উৎফুল্ল। কেননা এ গ্রন্থ মূলত বিবেক জাগ্রত করণের ভিত্তি স্বরূপ। আর আমি বলবো, এ কিতাব অধ্যয়নে শিক্ষার্থী উত্তমরূপে জ্ঞানার্জন করবে। কারণ এটা পরিভাষাগত জ্ঞানের সারসংক্ষেপ উপকারী গ্রন্থ।

৮. الكتب الستة صحيح البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي

ছয়টি হাদীছের কিতাব: ছ্বহীহ বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী। আমি শিক্ষার্থীকে পরামর্শ দিবো যে, তারা যেন এসকল কিতাব বেশি বেশি পাঠ করে। কেননা, এতে দু’টি উপকার লাভ হয়।

প্রথমত: উছুলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। দ্বিতীয়ত: স্মৃতিপটে হাদীছের রাবীগণের নাম পুনরাবৃত্তি ঘটে। এভাবে বারবার হাদীছ অধ্যয়নের কারণে বুখারীর যে কোন সনদের রাবী সম্পর্কে অধিক পরিচিতি লাভ করত হাদীছ পঠনের দিক থেকে উপকৃত হওয়া যায়।

---

[৫০] মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৬০১৮, মুসলিম হা/৪৭।

তৃতীয়: ফিক্বহী (**الفقه**) গ্রন্থাবলী।

১. كتاب آداب المشي إلى الصلاة এ গ্রন্থের লেখক শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব (রহিমাহুল্লাহ)।

২. كتاب ذاد المستقنع في اختصار المقنع للجحاوي এটি ফিক্বহ বিষয়ের চমৎকার কিতাব। যা সংক্ষিপ্ত জামে‘উ গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। আমাদের শাইখ আব্দুর রহমান সা‘দী (রহিমাহুল্লাহ) এ কিতাব সংরক্ষণ করতে আমাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৩. كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي

৪. كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى এ গ্রন্থের লেখক ইবনে কুদামা (রহিমাহুল্লাহ)।

চতুর্থ: ফারায়িয -الفرائض (সম্পদ বন্টনবিধি) গ্রন্থাবলী।

১. كتاب متن الرحبية للرحبي

২. كتاب متن البرهانية لمحمد البرهاني এ কিতাবের লেখক মুহাম্মদ বুরহানী (রহিমাহুল্লাহ)। এটি সংক্ষিপ্ত উপকারী ফারায়িয বিষয়ক জামে‘উ গ্রন্থ। কেননা, আমি মনে করি, বুরহানীয়্যাহ ফারায়িযের সব বিষয় জানার দিক থেকে ব্যাপকতর আলোচনা সাপেক্ষ সংকলিত চমৎকার কিতাব।

পঞ্চম: তাফসীর (التفسير) বিষয়ক কিতাব।

১. "تفسير القرآن العظيم" كتاب এ তাফসীর গ্রন্থের লেখক ইবনে কাছির (রহিমাহুল্লাহ)। তাফসীর বিল আছার এর দিক থেকে গ্রন্থটি উত্তম। গ্রন্থটি উপকারী ও নির্ভরযোগ্য। কিন্তু গ্রন্থটিতে ই'রাব ও বালাগাতের (ব্যাকরণগত) আলোচনা কম।

২. "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" كتاب এ গ্রন্থের লেখক শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে নাছির আস-সা'দী (রহিমাহুল্লাহ)। এটি প্রাঞ্জলতাপূর্ণ উপকারী নির্ভরযোগ্য চমৎকার গ্রন্থ। আমি শিক্ষার্থীকে এ কিতাব অধ্যয়নের পরামর্শ দিবো।

৩. مقدمة شيخ الإسلام في التفسير এটি শাইখুল ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুকাদ্দামা গ্রন্থ।

৪. "أضواء البيان" كتاب এ গ্রন্থের লেখক আল্লামা মুহাম্মদ আশ-শানক্বিত্বি (রহিমাহুল্লাহ)। এটি হাদীছ, ফিক্বহ, তাফসীর ও উছুল বিষয়ক জামে'উ গ্রন্থ।

ষষ্ঠ: বিষয় ভিত্তিক কিতাবাদী

১. "متن الآجرومية" এটি ইলমে নাহু বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সহজ কিতাব।

২. "ألفية بن مالك" এটিও নাহু বিষয়ক সার সংক্ষেপ কিতাব।

৩. "زاد المعاد" সিরাত বিষয়ক এ গ্রন্থের মত উত্তম গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি। কিতাবটির লেখক ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)। এটি অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থ। এ গ্রন্থে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী সার্বজনীন অবস্থার আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর অনেক বিধান সংক্রান্ত মাসআলা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৪. "روضة العقلاء" এ গ্রন্থের লেখক ইবনে হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ)। এটি সংক্ষিপ্ত উপকারী গ্রন্থ। অনেক বৃহৎ উপকারী বিষয়সহ আলিম, মুহাদ্দিছ ও অন্যান্যদের কৃতিত্ব এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. "سير أعلام النبلاء" كتاب এ গ্রন্থের লেখক ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ)। এটিও বৃহৎ উপকারী কিতাব। এ কিতাব অধ্যয়ন এবং পর্যালোচনা করা শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: জ্ঞানানুযায়ী ফাতাওয়া প্রদান (فتاوى حول العلم)।

১. সম্মানিত শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: যে সব শিক্ষার্থী সালাফে ছ্বলিহীনের রীতি-পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোন আলিম অথবা ইমামের আক্বীদা বিষয়ক পাঠ গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করে এ ক্ষেত্রে কি তাদের ওজর গ্রহণযোগ্য হবে কি?

এ প্রশ্নের জবাবে শাইখ বলেছেন, হক্ব পাওয়ার পরে এ অবস্থায় শিক্ষার্থীর জন্য কোন ওযর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, হক্ব যেখানেই থাক তার অনুসরণ করা এবং হক্ব স্পষ্ট করার জন্য এ সম্পর্কে আলোচনা করা শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা যে, হক্ব সুস্পষ্ট। যার নিয়্যাত বিশুদ্ধ তার নিকট হক্ব স্পষ্ট এবং তার পন্থা উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: ١٧]

আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? *সূরা আল ক্বমার ৫৪:১৮*

কতিপয় মানুষের এমন অনুসরণীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ রয়েছে যারা তাদের (ভ্রান্ত) মতাদর্শ থেকে পিছ পা হয় না। যদিও তাদের স্মৃতিপটে এটা রেখাপাত করে যে, তাদের মতাদর্শ দুর্বল কিংবা বাতিল-পরিত্যাজ্য। আর হক্ব স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পক্ষপাতিত্ব ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণই তাদের (ভ্রান্ত মতাদর্শের লোকদের) আনুগত্য করতে লোকেরা প্ররোচিত হয়।

২. সম্মানিত শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পদস্খলনের শঙ্কায় আক্বীদা বিষয়ক বিশেষত ভাগ্য বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করতে যারা আগ্রহী নয়, তাদের ব্যাপারে আপনার মত কি?।

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটিও অন্যান্য মাসআলার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা যা দীন ও দুনিয়া সম্পর্কিত বিষয় তা জানা মানুষের জন্য আবশ্যক। এ বিষয়ে অজ্ঞতা সম্পর্কে মানুষের পর্যালোচনা করা উচিত এবং এ ব্যাপারে বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির জন্য আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে কামনা করা প্রয়োজন যাতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আর যেসব মাসআলায় দীন প্রশ্নবিদ্ধ হয় না এবং দীন বিমুখ হওয়ার শঙ্কা না থাকে তাহলে যতক্ষণ না তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা পাওয়া যায় (সাধারণ) মাসআলার আলোচনা স্থগিত করাতে কোন সমস্যা নেই। আর গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার মধ্যে ভাগ্য সংক্রান্ত বিষয় অন্যতম। এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা বান্দার উপর আবশ্যক। যেন এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন হয়। আর প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি কতিপয় মানুষের উপর আক্বীদা বিষয়ক অধ্যয়নকে গুরুত্ববহ করছেন। অথচ তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করত আক্বীদার বিষয়ের উপর অন্য কিছুকে প্রধান্য দেয়। কিন্তু কেন?

"لِمَ" (কেন?) ও "كيف" (কিভাবে?) এ দু'টি প্রশ্নবোধক পদ ব্যবহার করে মানুষের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অর্থাৎ এরূপ আমল কেন করেছিলে? এটা ইখলাছ সম্পর্কিত প্রশ্ন। কিভাবে তা করেছিলে? এটা রসূল এর আনুগত্য বিষয়ক প্রশ্ন। আজকাল অধিকাংশ মানুষই "كيف"

(কিভাবে?) পদটির জবাব বিশ্লেষণে ব্যস্ত। অথচ "لِم" (কেন?) পদটির জবাব বিশ্লেষণে তারা অনাগ্রহী। এ জন্য দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই আমলের ইখলাছ (একনিষ্ঠতাকে) প্রধান্য দেয় না। তাই গুরুত্বহীন (অনর্থক) বিষয়ের আনুগত্যে তারা উৎসাহিত হয়। আজকাল অধিকাংশ মানুষই এর উপর গুরুত্বারোপ করে চলছে। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আক্বীদা, ইখলাছ ও তাওহীদ বিষয়ক আমল-আলোচনা হতে তারা বিস্মৃত-অমনোযোগী।

তাই দেখা যায়, কতিপয় মানুষ দীনের অত্যন্ত সহজ কিছু বিষয় সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করে। মূলত তাদের অন্তর দুনিয়ামুখী, আল্লাহর আনুগত্য হতে বিস্মৃত, ফলে পার্থিব ক্রয়-বিক্রয়, ভ্রমণ, বাসস্থান ও অন্ন-বস্ত্র নিয়ে তারা নিমগ্ন। তাই আজকাল কিছু মানুষ দুনিয়াপূজারী অথচ তারা এ ব্যাপারে বেখবর-বোধহীন। কখনো তারা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে অথচ তারা বুঝে না। কেননা, তারা তীব্র ক্ষোভ বশতঃ তাওহীদ ও আক্বীদার বিষয়কে গুরুত্ব দেয় না। এ

অবস্থা শুধু সর্বসাধারণের মাঝেই বিদ্যমান নয়। বরং কতিপয় শিক্ষার্থীর মাঝেও তা চালু রয়েছে। এটাই হচ্ছে ভয়াবহ বিষয়। যেমন আমল ছাড়াই শুধু সম্পর্ক সুদৃঢ় করণের বিষয়টি ঝুকিপূর্ণ। বন্ধন দৃঢ় করণের বিষয়টি শরী'আত প্রণেতা নির্ধারণ করেছেন (আমলসহ)। যারা সম্পর্ক-সংহতি রক্ষা করে তাদের মাঝেও ভুল-ত্রুটি আছে।

কেননা, প্রচারের সময় শুনি ও কিতাবাদী পাঠ করে আমরা বুঝি যে, উদার বন্ধন হচ্ছে দীনি সংহতি রক্ষা এবং অনুরূপ কিছু করা। আক্বীদার ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে এ আশঙ্কা থেকে যায় যে, আক্বীদা সঠিক আছে এ দলীল পেশ করে কেউ কেউ কতিপয় হারামকে হালালকরণের পথে পা বাড়ায়। কিন্তু হালাল ও হারামের ব্যাপারে পর্যালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আবশ্যক; যাতে কেন? এবং কিভাবে? প্রশ্নের সঠিক জবাব পাওয়া যায়। সারকথা হচ্ছে তাওহীদ ও আক্বীদা বিষয়ক পাঠ গ্রহণ করা ব্যক্তির উপর আবশ্যক। যাতে প্রকৃত উপাস্য ও মা'বূদ সম্পর্কে দূরদৃষ্টি বজায় থাকে এবং আল্লাহর নাম, গুণাবলী, তার কর্ম সমূহ, তার ঐচ্ছিক বিধান, শারঈ বিষয়, তার হিকমত (প্রজ্ঞা), তার শরী'আত ও সৃষ্টির গোপন রহস্য সম্পর্কে প্রমাণ ভিত্তিক জ্ঞান লাভ হয়। ফলে ব্যক্তি যেমন নিজে পথভ্রষ্ট হবে না অথবা অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে না। আর তাওহীদের জ্ঞান হচ্ছে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। একারণে আলিমগণ এ জ্ঞানকে (الفقه الأكبر) আল-ফিকহুল আকবার নামকরণ করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين".

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।[৫১]

জ্ঞানের মধ্যে তাওহীদ ও আক্বীদা বিষয়ক জ্ঞানই উত্তম। কিন্তু কিভাবে জ্ঞান অর্জন করবে এবং কোথা থেকে তা গ্রহণ করবে এ ব্যাপারেও শিক্ষার্থীর মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। তাই শিক্ষার্থী যেন প্রথমেই সন্দেহ মুক্ত সঠিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে। অতঃপর দ্বিতীয়ত (সঠিকতা নির্ণয়ে) সে যেন উদ্ভুত বিদ'আত ও সন্দেহ যুক্ত বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করে। যাতে সঠিক আক্বীদা গ্রহণের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ের আলোচনায় সচ্ছতা পাওয়া যায়। আর জ্ঞানার্জনের উৎস যেন হয় কুরআন এবং সুন্নাহ অতঃপর ছাহাবীগণের কথা-কর্ম, অতঃপর তাবেঈ ইমাম ও তাদের অনুসারীদের কথা এবং সবশেষে ইলম ও আমানতের

[৫১] মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৭১, মুসলিম হা/১০৩৭।

দিক থেকে নির্ভরযোগ্য-বিশস্ত বিদ্বানগণের কথা। আর বিশেষ করে আল্লাহর পূর্ণ রহমত বর্ষিত হোক ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ও তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম জাওজী (রহিমাহুমাল্লাহ) এর উপর এবং সকল মুসলিম ও তাদের ইমামগণের উপর।

৩. কতিপয় শারঈ জ্ঞানের শিক্ষার্থী জ্ঞান ও সনদপত্র উভয়টি অর্জনের মাঝে জটিলতা সৃষ্টি করছে। এ অবস্থা থেকে শিক্ষার্থী কিভাবে মুক্ত হতে পারে? জবাবে সম্মানিত শাইখ বলেন, এ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়,

প্রথম: কেবল সনদপত্র অর্জন করাই যেন শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে না হয়। বরং সৃষ্টির উপকারে কাজের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার্থী এ সনদপত্র গ্রহণ করতে পারে। কেননা, বর্তমান যুগে কাজ-কর্ম সনদপত্রের উপর নির্ভরশীল। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ এ সনদপত্র ছাড়া সৃষ্টির উপকার সাধন করতে সক্ষম নয়। এ জন্য এক্ষেত্রে নিয়্যাত যেন বিশুদ্ধ থাকে।

দ্বিতীয়: যেসব শিক্ষার্থী ইলম অর্জন করতে চায় কিন্তু প্রতিষ্ঠান ছাড়া যদি ইলম অর্জনের কোন উৎস-ক্ষেত্র না পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি হবে। তারপর সনদপত্র অর্জন হওয়ায় এটা তার উপর খারাপ প্রভাব ফেলবে না।

তৃতীয়: মানুষ যদি পার্থিব কাজ-কর্ম ও আখেরাতের আমলের সৌন্দর্যতা বজায় রাখতে চায় তাহলে সাধারণত এক্ষেত্রে তার কোন মাধ্যমের দরকার হয় না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: ٢، ٣] .

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন (সূরা আত-ত্বলাক্ব ৬৫:২,৩)।

এটাই হচ্ছে পার্থিব কাজে তাক্বওয়ার উৎস। যদি বলা হয়, যে তার আমলের মাধ্যমে দুনিয়া পেতে চায় কি হিসেবে তাকে মুখলিছ (একনিষ্ঠ) বলা হবে?

জবাব হচ্ছে সে তার ইবাদতে একনিষ্ঠতা বজায় রাখবে। আর সে কেবল দুনিয়া পাওয়ার ইচ্ছা করবে না। তাই লোক দেখানো ও প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যেন ইবাদত করা না হয়। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে ইবাদতের প্রতিদান পাওয়াই যেন মূল উদ্দেশ্যে হয়। যে আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় তা দ্বারা লৌকিকতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি মানুষের সান্নিধ্য ও তাদের প্রশংসা লাভ করতে চাইলে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে না। মূলত এরূপ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটলে ইবাদতে ইখলাছ (একনিষ্ঠতা) বিনষ্ট হয়। ফলে তা শিরকের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায় এবং যে কেবল আখেরাতের ইচ্ছা করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। ইবাদত সম্পর্কীয় কথা বলার উদ্দেশ্যে হলো কতিপয় মানুষকে সতর্ক করা যারা ইবাদতের উপকারীতা নিয়ে কথা বলে অথচ তা পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করে। যেমনঃ তারা বলে, ছ্বলাতে রয়েছে শরীর চর্চা ও একতার শিক্ষা। আর ছিয়ামে রয়েছে অতিরিক্ত পানাহার বর্জন এবং পর্যাক্রমে ফরয-ওয়াজীব পালনের উপকারীতা। তারা পার্থিব উপকারীতাকেই আসল বলে গণ্য করে। অথচ শুধু পার্থিব উপকারীতা ইবাদতে ইখলাছ (একনিষ্ঠতা) বিনষ্ট এবং আখেরাতের প্রতি অমনোযোগিতা সৃষ্টি করে। তাই আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে ছিয়াম পালনের তাৎপর্য বর্ণনা করেন। অর্থাৎ ছিয়াম হচ্ছে তাক্বওয়া অর্জনের মাধ্যম। তাই দীনি উপকারীতা লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্যে। পার্থিব উপকারীতা মুখ্য নয়। আমরা যখন জনসাধারণের সাথে কথা বলবো, তখন তাদের সামনে দীনি বিষয় তুলে ধরবো এবং যারা কেবল বস্তুবাদী বিষয় ছাড়া অন্য কিছুতে পরিতুষ্ট হয় না তাদের সামনে দীন ও দুনিয়া উভয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো এবং সবক্ষেত্রেই আমরা দীনি আলোচনাকে অগ্রাধীকার দিবো।

৪. সম্মানিত শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, অনেক শিক্ষার্থী (আহলুল মা'আছি) পাপাচারীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে এ নিয়ে মতভেদ করে এ সম্পর্কে আপনার সঠিক মত কি?

জবাবে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমরা বলবো, কতিপয় শিক্ষার্থী যখন দেখে যে, চরিত্র, চিন্তা-ভাবনা ও আমলগতভাবে কারো পদস্খলন হয়েছে, সেক্ষেত্রে তাকে তারা অপছন্দ করে আর এটাই ঐ ব্যক্তির প্রতি বিরূপভাব ও তার মাঝে দুরত্ব সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থীরা তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করেন না। তবে মাশা'আল্লাহ যেসব শিক্ষার্থীর অন্তর আল্লাহ তা'আলা আলোকিত করেছেন, তারা

চেষ্টা করে, কতিপয় শিক্ষার্থী মনে করে চরিত্রহীন ব্যক্তিকে ত্যাগ করা, তার মাঝে দুরত্ব বজায় রাখা, তাকে দূরভিত করা মহৎ কাজ। কিন্তু নিঃসন্দেহে এটা ভুল। তাই তাদেরকে উপদেশ দেয়া, তাদের প্রতি খেয়াল রাখা শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক। যেসব মানুষ অবহেলায় দিন কাটায়, তাদেরকে উপদেশ দেয়া হলে কেউ কেউ উপদেশ গ্রহণ করে। যারা দাঈ তথা দাওয়াতপন্থী জামা‘আত ও মুবাল্লিগ বলে পরিচিত তাদের দাওয়াত অধিক ফলপ্রসূ। মানুষ তাদের দাওয়াতে অধিক প্রভাবিত হয়। অনেক ফাসিক সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করছে, অনেক কাফির তাদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে হেদায়াত লাভ করেছে। কেননা দাঈগণ উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মানুষকে বিমোহিত করে। এ জন্য আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাদের যেসব ভাইকে জ্ঞান দান করেছেন তিনি যেন তাদেরকে ঐসকল দাঈর মত উত্তম চরিত্রের অধিকারী করেন।

যেন তারা বেশি বেশি মানুষের উপকার করতে পারে। যদি হক্বপন্থী দাঈ ও মুবাল্লিগগণের দাওয়াত দানের পদ্ধতি কেউ গ্রহণ করে তাহলে দাঈ ও মুবাল্লিগগণের সংস্পর্শে থাকার কারণে প্রভাবিত হয়ে তারাও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হয়। ফলে দাঈগণের মর্যাদা কেউ অস্বীকার করে না। শাইখ আব্দুল আজিজ ইবনে বায হাফিযাহুল্লাহর কিতাবে দেখেছি, দাঈগণের সমালোচনা করে এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করে তিনি বলেন,

أقلوا عليهم لا أبا لأبيكمُ من اللوم ... أو سدّوا المكان الذي سّدوا

সন্দেহ নেই যে, দাঈর দাওয়াতে মানুষের সাড়া দানে উত্তম চরিত্র বৃহৎ প্রভাব বিস্তার করে। অপর দিকে দেখা যায়, কিছু দাঈ মানুষের মাঝে শরী‘আত বিরোধী কিছু দেখলে তারা শরী‘আতের বিধি-নিষেধ পালনের উপর তাদেরকে গালি দেয়, তিরস্কিত করে। যেমনঃ দাড়ি ছেড়ে দেয়া নিয়ে তাদেরকে গালি-গালাজ করতে দেখা যায়। অবশ্য দাড়ি রাখা শরী‘আতের আমল। অনুরূপভাবে কোন কাজে ছাওয়াবের কমতি ও (অহংকার বশত) খালি পায়ে হাঁটার বিষয়কে কেন্দ্র করেও তারা গালি-গালাজ করে। কিন্তু কেন? এটাতো মানুষের সাথে সদাচরণ নয়। এমনটি যারা করে তারাতো উত্তম চরিত্রের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না। তারা মূলত অসদারচণ ও কঠোরতার দিকেই দাওয়াত দেয়। আর তারা চায়, সবাই একবারেই সংশোধন হোক। এটাই ভুল পন্থা। একবারে কোন মানুষের সংশোধন হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম কি মক্কায় তের বছর অবস্থান করে দাওয়াত দেননি? পরিশেষে ষড়যন্ত্র করে তাকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ} [الأنفال: ٣٠] .

যখন কাফিররা তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিল, তোমাকে বন্দী করতে অথবা তোমাকে হত্যা করতে কিংবা তোমাকে বের করে দিতে (সূরা আনফাল ৮:৩০)।

يثبتوك অর্থাৎ তোমাকে আটক করতে অথবা হত্যা করতে কিংবা বের করে দিতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} [الأنفال: ٣٠]

তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে উত্তম (সূরা আল আনফাল ৮:৩০)।

সুতরাং বুঝা গেল, শুধু একবার অথবা দু'বার দাওয়াত দিয়ে মানুষের চরিত্র সংশোধন করা সম্ভব নয়। বিশেষত এভাবে দাওয়াত দানের কোন মূল্যায়ন হবে না। তবে ধৈর্য, হৃদ্যতা, প্রজ্ঞা ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে দাওয়াত ফলপ্রসূ হয়। শীঘ্রই এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা।

সন্দেহ নেই যে, উত্তম কথায় পূর্ণপ্রভাব বিদ্যমান। কথিত আছে যে, আহলে হিসবাহর জনৈক ব্যক্তি এক কৃষকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যার উট ছিল উৎফুল্ল। এটা ছিল মাগরিবের আযানের সময়। কৃষক তখন গান করছিল। যখন উটটি গান শুনতে পেল তখন সেটা পাগলের মত চলতে আরম্ভ করলো। কেননা, সে আনন্দচিত্তে অন্য কিছু থেকে অমনোযোগী হয়ে গান করছিল, সে আযান শুনছিল না। অতঃপর হিসবাহর লোকটি তার ব্যাপারে খুব কঠোর ভাষা ব্যবহার করত (রাগ করে বললো), কে উটের মালিক; শীঘ্রই আমি অব্যাহতভাবে গান গাইতে থাকবো। আমার লাঠির জোর আছে কিনা আমি দেখে নিবো। এ বলে তার প্রতি সে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলো। অতঃপর (আযানের সময় গান করার) বিষয়কে কেন্দ্র করে সে বিচারকের কাছে গিয়ে বললো, আমি কৃষকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমতবস্থায় আমি শুনছিলাম যে, মাগরিবের আযানের সময় সে তার উটকে গান শুনাচ্ছিল, এ ব্যাপারে আমি তাকে উপদেশ দেই (গান করতে নিষেধ করি) কিন্তু সে তা গ্রহণ করেনি। অতঃপর পরের দিন বিচারক নিজে ঐ

সময়ে উটের মালিকের জায়গায় গেলেন। অতঃপর আযান হলে কৃষক এসে তাকে (হিসবার লোককে) বললো, হে ভাই! আযান হয়েছে। এখন তোমার ছ্বলাত আদায় করতে যাওয়া উচিত। কেননা, আল্লাহ তা’আলা বলেন,

{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه:١٣٢]

এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ে আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিযক চাই না। আমিই তোমাকে রিযক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য (সূরা ত্ব-হা ২০:১৩২)।

এরপর উটের মালিক جزاك الله خير বলে দু’আ করলো, অতঃপর সে উটের চাবুক রেখে উযূ করে তাদের সাথে ছ্বলাতে অংশ গ্রহণ করলো। এখান থেকে কি বুঝা গেল? এখানে প্রথম কথা হচ্ছে, যদি তার থেকে দূরে থাকা হতো তাহলে অবশ্যই সে মন্দ পথ বেছে নিতো এবং কল্যাণকর কাজ ছেড়ে দিতো। দ্বিতীয়ত তার সাথে সদাচরণের কারণে সে পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেছে। এ জন্য আমি বলবো, কতিপয় শিক্ষার্থীর আত্মসম্মান আছে কিন্তু তারা ভাল আচরণ করতে জানে না। মানুষের উচিত যে, সে তার জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং বড় মর্যাদাপূর্ণ প্রজ্ঞা ব্যবহার করে সদাচরণ করবে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন সকলকে কল্যাণমূলক কাজের তাওফীক দান করেন। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।

৫. সম্মানিত শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, জ্ঞানের ধারকবাহক আলিমদেরকে গুরুত্ব দেয়া ব্যতীরেকে কতিপয় শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে তাদের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

জবাবে তিনি বলেন, আমি মনে করি, শিক্ষার্থীর উচিত, দক্ষ আলিমের কাছে জ্ঞানার্জন করা। কেননা, কতিপয় শিক্ষার্থী পাঠ দানে পারদর্শী এবং হাদীছ অথবা ফিক্বহ কিংবা আক্বীদার বিষয়ে তারা কোন মাসআলা পর্যালোচনা পূর্বক পূর্ণবিশ্লেষণ করতে পারে। তরুণ শ্রেণীর কেউ এ পর্যালোচনা শুনলে ঐ শিক্ষার্থীকে সে বড় আলিম মনে করে, যদিও ঐ শিক্ষার্থী এসব বিষয়ের সামান্যই বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করতে সক্ষম। মূলত তার কাছে কোন জ্ঞান

নেই। একারণে প্রথম পর্যায়ের শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক হচ্ছে নির্ভরশীল আলিমদের জ্ঞান, আমানত ও দীন অনুযায়ী তাদের কাছে থেকে জ্ঞানার্জন করা।

৬. সম্মানিত শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মন্তব্য করা হয় যে, শিক্ষার্থীর মাঝে সক্ষমতা কম এবং তাদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। বিদ্যার্জনে অধিক সক্ষম হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদানে কোন কোন মাধ্যম ও পন্থা রয়েছে?

জবাবে তিনি বলেন, শারঈ জ্ঞানের শিক্ষার্থীর মাঝে সাহসের দুর্বলতা একটি বড় সমস্যা। এ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় আবশ্যক।

প্রথম: বিদ্যার্জনে আল্লাহর প্রতি একনিষ্টতা বজায় রাখা। মানুষ যখন জ্ঞানার্জনে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা বজায় রাখবে এবং বুঝতে সক্ষম হবে যে, জ্ঞানার্জনে ছাওয়াব রয়েছে। অচিরেই সে তৃতীয় স্তরের মর্যাদায় উন্নিত হবে। কারণ তার সক্ষমতা তাকে উৎসাহী করে তুলবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: ٦٩] .

আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম (সূরা আন নিসা ৪:৬৯)।

দ্বিতীয়: এমন সহচর্য গ্রহণ করা আবশ্যক যারা তাদেরকে বিদ্যার্জনে উৎসাহ দিবে এবং আলোচনা ও পর্যালোচনায় তারা তাকে সহযোগিতা করবে। আর যতক্ষণ তারা বিদ্যার্জনে সহযোগিতা করবে সে তাদের সহচর্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে না।

তৃতীয়: নিজেকে ধৈর্যের জালে আবদ্ধ রাখতে হবে, যদিও অন্তর বিদ্যার্জন হতে বিমুখ হতে চায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف: ٢٨] .

তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তার সন্তুষ্টির উদ্দেশে এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে (সূরা আল কাহাফ ১৮:২৮)।

মোট কথা, শিক্ষার্থী যেন ধৈর্য ধারণ করে, তারা ধৈর্য ধারণের দিকে ফিরে আসলে তখনই তাদের জ্ঞানার্জন স্বার্থক হবে। আর বিদ্যার্জন না করা হলে সময় হবে দীর্ঘ। কিন্তু নিজেকে সাহায্যে করলে এরূপ হবে না। আর নাফসে আম্মারা তথা কু-প্রবৃত্তি খারাপ-গর্হিত কাজের দিকে ঠেলে দিয়ে মানুষকে অলস করে তুলে এবং বিদ্যার্জন না করার প্রতি উৎসাহ দেয়।

৭. সম্মানি শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, কোন মাসআলা নিজের মতাদর্শের অনুকূলে হওয়া কিংবা না হওয়ার দিক থেকে যারা তাদের ভাইয়ের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখে অথবা শত্রুতা করে এবং অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীর মাঝেও হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে তাদের ব্যাপারে আপনার মত কি?

জবাবে তিনি বলেন, এটা ঠিক যে, কতিপয় শিক্ষার্থী তাদের মাসআলা অনুকূলে হওয়া বা না হওয়ার দিক দিয়ে তারা বন্ধুত্ব ও শত্রুতা নির্ধারণ করে। দেখা যায়, তাদের কাছ কিছু মানুষ মাসআলা জেনে নেয়, কেননা, ঐ মাসআলা তাদের অনুকূলে হয়েছে ফলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব হয়। আর কতিপয় মানুষ ঐ মাসআলার বিরোধিতা করে ফলে তাদের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। আফ্রিকার অধিবাসী দু'দলের মাঝে মিনায় ঘটে যাওয়া একটি কাহিনী তোমাদের সামনে পেশ করবো; যারা একে অপরকে অভিশম্পাত করে এবং কাফির বলে আখ্যা দেয়। ঝগড়ারত অবস্থায় তাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসা হলো। আমরা বললাম, কি হয়েছে? প্রথম দল বললো, এ লোক ছ্বলাতে দাঁড়িয়ে তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর হাত বেধেছে। এটাতো সুন্নাহ বিরোধী কুফরী কাজ। অপর দল বললো, এ লোক ছ্বলাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা ব্যতীরেকেই তার দু'হাত উরুর উপর রেখেছে যা কুফরী বলে গণ্য। কেননা, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"من رغب عن سنتي فليس مني"

যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয় সে আমার উম্মত নয়।[৫২]

এটা সুন্নাহ বিষয়ক মাসআলা, যা ওয়াজীব নয়, ছ্বলাতের রুকন নয় এবং ছ্বলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তা শর্তও নয়। তা জানা সত্ত্বেও এভাবে তারা একে অপরকে কাফির বলে আখ্যা দেয়। অনেক প্রচেষ্টা-পরিশ্রমের পর তারা আমাদের সামনে এক মত হয়েছে। আমাদের মত সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন। বর্তমানে দেখা যায়, কিছু ভাই ক্ষোপের সাথে তার অপর ভাইকে ঐসব নাস্তিকদের চেয়ে বেশি

[৫২] মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৫০৬৩, মুসলিম হা/১৪০১।

মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে যাদের কুফরী স্পষ্ট। তারা নাস্তিকদের চেয়ে তাদের সাথে বেশি শত্রুতা পোষণ করে, তাদের কথায় নিন্দা জ্ঞাপন করে যার কোন মূলই নেই, বাস্তবতা নেই। কিন্তু এর মাধ্যমে হিংসা ও বাড়াবাড়িই করা হয়। নিঃসন্দেহে হিংসা ইয়াহূদীদের চরিত্র। হিংসুক আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দার মধ্যে গণ্য। হিংসুক তার হিংসা থেকে উপকার লাভ করতে পারে না। এটা কেবল বিষন্নতা ও দুঃখ বৃদ্ধি করে। তাই অন্যের কল্যাণ কামনা কর; তোমার কল্যাণ হবে। জেনে রেখো, আল্লাহ যাকে চান তাকেই তিনি অনুগ্রহ করেন। তুমি যদি বিদ্বেষ পোষণ করো তবুও আল্লাহর অনুগ্রহ ঠেকাতে পারবে না। অন্যের উপর অনুগ্রহ না হোক এ মন্দ কামনাই কখনো তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতিবন্ধক হয় এবং অন্যের প্রতি তোমার অপছন্দনীয়তা থাকার কারণে তার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষণ হয়।

এ কারণে হিংসুক বিদ্যার্জনে শিক্ষার্থীর নিয়্যাত ও একনিষ্ঠতায় সন্দেহের সৃষ্টি করে। হিংসুক মানুষের কাছে মর্যাদা পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর সাথে হিংসা করে। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের কথায় মানুষ তার কাছে আসে এজন্য হিংসুক তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, যাতে দুনিয়ায় তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সত্যই যদি সে আখিরাত কামনা করতো, প্রকৃত পক্ষে ইলম অর্জন করতে চাইতো, তাহলে অবশ্যই সে ঐ জ্ঞানী লোকের কাছে জেনে নিতো যার কাছে মানুষ জ্ঞানের কথা জেনে নেয়। এরূপ করলে সেও তার মতো হতো। জ্ঞানের কথা জেনে শিক্ষার্থীর উপকৃত হওয়া উচিত। অপরদিকে যদি জ্ঞানী লোকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হয়, তার নিন্দাজ্ঞাপন ও দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা হয় যা তার মাঝে নেই; তাহলে এটা নিঃসন্দেহে বাড়াবাড়ি, শত্রুতা ও নিকৃষ্ট স্বভাব বলে গণ্য হবে।

৮. সম্মানিত শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, বাগদাদের খতিব ইলম অর্জনের ব্যাপারে একটি বিষয় তুলে ধরেন, তা হচ্ছে কেবল আলিম অথবা শাইখদের কারো থেকে ইলম অর্জন করা আবশ্যক এ সম্পর্কে আপনার মত কি?

জবাবে তিনি বলেন, এটা ভাল যে, মানুষ বিশস্ত শাইখদের কাউকে কেন্দ্র করে ইলম অর্জন করবে। বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। প্রাথমিক পর্যায়ের নীচের স্তরের শিক্ষার্থী বিভিন্ন মানুষের কাছে ইলম অর্জন করতে গিয়ে তারা হয় দোদুল্যমান। কারণ মানুষ বিশেষত বর্তমান যুগে কোন বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চায় না। কয়েক যুগ আগেও মানুষ তাদের দেশের আলিমদের নিকট থেকে সর্বদা সন্তুষ্ট চিত্তে চুড়ান্ত পর্যায়ের ফাতওয়া গ্রহণ

করতো। কারণ ঐ সকল আলিমের ফাতওয়া ও ব্যাখ্যা ছিল একই ধরনের। অবহিত করণ ও উত্তম পন্থা ব্যতীরেকে কেউ কারো বিরুদ্ধে মতভেদে লিপ্ত হতো না। কিন্তু এখন কেউ একটি অথবা দু'টি হাদীছ মুখস্থ করে বলে আমি অমুক ইমামের অনুসারী ই। ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) মানুষ ছিলেন, আমরাও মানুষ। এ অজুহাতে মাসআলায় ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকেই কখনো কখনো নিজের মত ফাতওয়া দিতে শুরু করে, ফলে ফাতওয়া হয় গোলকধাধা। আমি এ ধরনের গোলযোগপূর্ণ ফাতওয়া লিপিবদ্ধ করতে গুরুত্বারোপ করেছি কিন্তু যার অনুসরণ করা হয় তার গোপনীয়তা প্রকাশের আশঙ্কা করছি। তাই সতর্কতামূলক এ বর্ণনা ছেড়ে দিয়েছি। আলিমদের কেউ এমন বিষয়ের বর্ণনা করেছেন যা সঠিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন।

আমি বলবো, শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় প্রথমত একজন আলিমের শরণাপন্ন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাতে শিক্ষার্থী দোদূল্যমান অবস্থার মুখোমুখী না হয়। এ জন্য মুগনি, শারহুল মুহায্‌যাব এবং যেসব কিতাবে অনেক মতামত উল্লেখ আছে আমাদের শাইখগণ ছাত্র অবস্থায় ঐ সব কিতাব পাঠ না করার পরামর্শ দেন। আমাদের কতিপয় শাইখ উল্লেখ করেন যে, শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান (রহিমাহুল্লাহ) শাইখদের মধ্যে বড় মাপের নজদী মুফতি। তারা উল্লেখ করেন যে, তিনিই الروض المربع অধ্যয়নে ছিলেন নিবেদিত-মনোযোগী। তিনি তা পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি এর সারকথা পুনরায় উল্লেখ করেন। তাৎপর্য, বক্তব্য, ইশারা এবং ইবারতকে (মূল রচনা) তিনি গ্রহণ করেন। যা অনেক কল্যাণকর। মানুষ বিস্তারিত জানতে চাইলে তার উচিত হবে, আলিমদের কথা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। যাতে জ্ঞানগত ও সামঞ্জস্য বিধানের উপকারীতা লাভ হয়। এ ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনের প্রথম পর্যায়ে কোন একজন শাইখের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য আমি শিক্ষার্থীকে পরামর্শ দিবো; যাতে ঐ শিক্ষার্থী (মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে) সীমা অতিক্রম না করে।

৯. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষার্থী যদি এমন হাদীছ বর্ণনা করার ইচ্ছা করে যা ইবনে হাদীর كتاب المحرر চেয়েও بلوغ المرام হতে অতিরিক্ত। এ ধরনের বর্ণনা পদ্ধতিতে কোন উপকার আছে কি?

শাইখ জবাবে বলেন, এ পদ্ধতি অনুসরণে কোন ফায়েদা নেই। এটা একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি মাত্র। মূলত ব্যাপক পরিসরে প্রচলিত প্রসিদ্ধ কিতাবাদী অধ্যয়ন করা উত্তম।

১০. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ইবনে হাদীর কিতাবুল মুহার্‌রার কি বুলুগুল মারামের চেয়ে উত্তম নয় কি?

শাইখ জবাবে বলেন, بلوغ المرام কিতাবটি প্রচলিত। এ কিতাবের সংকলক একজন ব্যাখ্যাকার। আর অন্য কিছুর চেয়ে প্রচলিত কোন বিষয়ে মানুষের মনোযোগ বেশি হওয়াই যেন অত্যাবশ্যক। কেননা, অনেকেই ছেড়ে দেয়া-বর্জিত কোন বিষয়ের মাধ্যমে উপকৃত হয় না। যেমন জ্ঞাতব্য যে, বুলুগুল মারাম কিতাবটি হতে মানুষ উপকৃত হয়। আমাদের আলিম ও শাইখগণ এ কিতাবটি পাঠ করেন।

১১. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ইবনে ওয়াজির উল্লেখ করেন যে, ছাহাবী আবূ বকর, উমার ও উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তারা সকলে কুরআন সংরক্ষণ করেননি। অনুরূপভাবে ইমামগণ হতে বর্ণিত আছে যে, উছমান ইবনু আবি শাইবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুরআন সংরক্ষণ করেননি। কতিপয় শিক্ষার্থী বলে, আল্লাহর কিতাব সম্পূর্ণ মুখস্থ না করলে চলবে ঐ বিষয়েই তারা পরামর্শ দেয়, এটা কি ঠিক?

জবাবে শাইখ বলেন, আমি মনে করি, আবূ বকর, উমার, উছমান ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এ সকল মর্যাদাবান ছাহাবী আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণ করেননি এ কথাটি অপ্রচলিত। জেনে রাখতে হবে যে, আবূ বকর, উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর যুগে কুরআন একত্রিত করা হয়েছে। তারা কুরআন একত্রিত করেছেন অথচ তারাই কুরআন সংরক্ষণ করেননি? এ কথাটি খুবই অপ্রচলিত। কিন্তু এ কথাটি যার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে প্রথমত তার সনদ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। যদি সনদ ছ্বহীহ প্রমাণিত হয়, তাহলে আমরা বলবো, সমালোচনা করে এ কথা যারা বলে যে, ঐ সকল ছাহাবী কুরআন সংরক্ষণ করেননি তারা মূলত কিছুই জানে না। ছাহাবীগণ কুরআন সংরক্ষণ করেননি এ কথাটি অত্যন্ত অপ্রচলিত-দূর্বোধ্য। আর কুরআন (সম্পূর্ণ) মুখস্থ করা হতে কাউকে বিরত থাকা বলা উচিত নয়।

১২. আমি সম্মানিত শাইখের নিকট শারঈ বিভিন্ন ইলম অর্জনের সঠিক মানহাজ-পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা আশা করছি, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন, আপনাকে ক্ষমা করুন। জবাবে শাইখ বলেন, শারঈ জ্ঞান কয়েক প্রকার: তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে,

ক. **علم التفسير :** শিক্ষার্থীর উচিত আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণে ছাহাবীদের অনুসরণ পূর্বক তাফসীরের জ্ঞান লাভ করা। এ ক্ষেত্রে তারা কমপক্ষে দশটি আয়াত না শিখা পর্যন্ত সীমা অতিক্রম করবে না। তাই আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান ও আমল উভয়টি থাকা বাঞ্ছনীয়। যাতে কুরআনের শব্দাবলী সংরক্ষণে অর্থের সম্পর্ক (যথার্থতা) ঠিক থাকে। তাই মানুষ মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করলে তা হয় যথাযথ তিলাওয়াত।

খ. **علم السنة:** শুরুতেই ছ্বহীহ হাদীছের জ্ঞানার্জন করবে। আর ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহিমাহুমাল্লাহ) যে হাদীছের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন তা অধিক বিশুদ্ধ। তবে সুন্নাহর জ্ঞানার্জন দু'ভাবে হয়।

প্রথম পর্যায় মানুষ শারঈ বিধি-বিধান জানার ইচ্ছা করে হোক তা আক্বাঈদ ও তাওহীদের জ্ঞান। অথবা দ্বিতীয় পর্যায় আমলগত বিধি-বিধান জানার ইচ্ছা করে। এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য রচিত কিতাবাদী অধ্যয়ন করেই ঐ জ্ঞান সংরক্ষণ করা উচিত। যেমন, বুলূগুল মারাম بلوغ المرام, উমদাতুল আহকাম عمدة الأحكام, শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রচিত كتاب التوحيد এবং অনুরূপ অন্যান্য কিতাব। মূল কিতাবাদী পর্যালোচনা ও পাঠ করার মাধ্যমেই অবশিষ্ট থাকবে। এভাবেই তা সংরক্ষিত হবে এবং পঠন হতে থাকবে হবে। আর এতে চিন্তা-গবেষণাও হবে বেশি। কেননা, এখানে দু'টি বিষয়ে উপকারীতা লাভ হয়।

প্রথম: উছূলের দিকে প্রত্যাবর্তন।

দ্বিতীয়: রাবীদের নাম বারবার স্বরণ হওয়া। হাদীছ পঠনের মধ্যে দিয়ে রাবীগণের নাম বারবার স্বরণ হওয়ায় হাদীছ পাঠকারী বুখারীতে বর্ণিত হাদীছের সনদ এড়িয়ে যেতে পারবে না। তথা বুখারীতে বর্ণিত হাদীছের সনদ বুঝতে সে সক্ষম হবে। এভাবেই ঐ পাঠকারীর হাদীছ পঠনগত উপকারীতা লাভ হয়।

গ. علم العقائد এ বিষয়ের অনেক কিতাব রয়েছে। আমি মনে করি, বর্তমানে এ কিতাবাদী পঠনে অনেক সময় ব্যয় হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম জাওজী (রহিমাহুমাল্লাহ) ও আমাদের আলিমদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব এবং (তার সমপর্যায়) পরবর্তী আলিমগণ এ সম্পর্কে যে সার-সংক্ষেপ কিতাব রচনা করেছেন তা পঠনের মাঝেই উপকার নিহিত আছে।

ঘ. علم الفقه সন্দেহ নেই যে, মানুষের উচিত কোন একটি মাযহাবকে কেন্দ্র করে তার উছুল ও কায়েদা সমূহ সংরক্ষণ করা। কিন্তু এ অর্থ নয় যে, এ মাযহাবের ইমাম যা বলেছেন তা মেনে নেয়া আমাদের জন্য আবশ্যক।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা মেনে নেয়াই আমাদের জন্য আবশ্যক। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করেই ফিক্বহের উৎপত্তি হয়।

অন্য মাযহাবের ছ্বহীহ দলীল পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করতে হবে। এর উপর ভিত্তি করেই ইমামগণ যেমন ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) এবং অন্যান্য আলিম মাযহাবের অনুসরণ করতেন। এভাবেই ফিক্বহের মূল ভিত্তি গঠিত হয়। কেননা, আমি মনে করি, শারঈ বিধি-বিধান সম্পর্কে আলিমগণের রচিত কিতাব অধ্যয়ন ব্যতীরেকে যারা হাদীছ গ্রহণ করেন, তাদের মাঝে থাকে সিদ্ধান্তহীনতা যদিও তারা হাদীছের জ্ঞানে অধিকতর যোগ্য-শক্তিশালী। কিন্তু ফিক্বহ না বুঝার কারণে থেকে যায় সিদ্ধান্তহীনতা। কেননা, ফক্বীহগণের কথা থেকে তারা রয়েছে বিচ্ছিন্ন-দূরতম অবস্থানে।

তাদের মাসআলায় দুর্বোধ্যতা লক্ষ্য করা যায়। ঐ মাসআলা ইজমা বিরোধী কিনা তা নিশ্চিত নয় অথবা এ ধারণা নিশ্চিত হতে পারে যে, তা ইজমা বিরোধী। একারণে মানুষের উচিত হবে ফক্বীহগণের রচিত কিতাবাদীর সাথে সম্পর্ক রেখে মাসআলা গ্রহণ করা। এর অর্থ এটা নয় যে, আবশ্যক মনে করে কোন মাযহাবের ইমামকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মত নির্ধারণ করত তার কথা ও কর্মকে গ্রহণ করতে হবে। বরং এর মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করতে হবে এবং এটা কায়েদা-পন্থা বলে গণ্য হবে। কোন মাযহাবে সঠিক কথা পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা আবশ্যক; এতে কোন আপত্তি নেই। ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) এর মাযহাবের অধিকাংশ কথাই সঠিক। তার মাযহাবকে নির্দিষ্ট কোন বলে মনেই হবে না। মাযহাবের কোন বিষয়ে দু'টি বর্ণনা আছে এমন কিতাব তিনি অনুসরণ করতেন। দেখা যায়, দলীলের সাথে ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) কথার সঙ্গতি থাকলেই তিনি তা মাযহাব মনে করতেন। তিনি কোন বিষয় বিস্তারিত অনুসন্ধান করতেন এবং হক্ব যেখানেই থাক তার দিকে তিনি অগ্রগামী হতেন। আমি মনে করি, মানুষ (শিক্ষার ক্ষেত্রে) কোন একটি মাযহাবকে কেন্দ্র করবে যা সে পছন্দ করে। আর আমাদের জানা মতে, সুন্নাহর অনুসরণের দিক থেকে ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) এর মাযহাবই উত্তম। আর অন্যান্য মাযহাব সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী। এ বিষয়ে বলা হয়েছে। দেখা যায়, ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) এর মাযহাব (কুরআন-সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায়) তা উপযোগী। চিন্তা-গবেষণা ও

অধ্যয়ন করে ফক্বীহ হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মানহাজ-পদ্ধতি প্রসঙ্গে তার মাযহাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও নিহিত আছে। অর্থাৎ শারঈ বিধান, তার প্রভাব-ফলাফল ও তাৎপর্য সম্পর্কে বুঝা যাবে। আর যা জানা আছে তার মাধ্যমে সাধ্য অনুযায়ী সমতা বিধান করা সম্ভব হবে। এ মর্মে আল্লাহ ত'আলা বলেন,

{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] .

আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না (সূরা আল-বাক্বারা ২:২৮৬)।

এখানে সক্ষমতা বজায় রেখে সামঞ্জস্য বিধানের উপর উৎসাহিত করা হয়েছে। আমি শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে "التطبيق" (সমতা বিধান) বিষয়টি সর্বদাই পুনরাবৃত্তি করি হোক তা ইবাদত অথবা চরিত্র কিংবা আদান-প্রদান সম্পর্কিত। হে শিক্ষার্থী! তুমি সমন্বয় সাধন করতে শিখো যাতে বুঝা যায়, তোমার জানা বিষয়ে তুমি আমলকারী শিক্ষার্থী।

আমরা একটা উদাহরণ পেশ করবো, যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন তাকে সালাম দেয়া শরী'আত সম্মত হবে কি?

জবাব হচ্ছে, হ্যাঁ, শরী'আত সম্মত। কিন্তু আমি অনেককে দেখি যে, যখন কেউ তার ভাইয়ের পাশ দিয়ে যায়, মনে যেন সে একটা খুঁটির পাশ দিয়ে যাচ্ছে; সে তাকে সালাম দেয় না। অথচ এটা মারাত্মক ভুল। জনসাধারণের ব্যাপারে এধরনের সমালোচনা করা গেলে ছাত্রদের ক্ষেত্রে কেন করা যাবে না? السلام عليكم কথাটি বলতে ছাত্রদের অসুবিধা কি? অনেকেই ছাত্রদের কাছে আসে, তাদেরকে সালাম দিলে দশগুণ বেশি প্রতিদান পাওয়া যায়। দুনিয়ার সকল ভাল কাজের জন্য দশগুণ বেশি প্রতিদান পাওয়া যায়। যদি মানুষকে উৎসাহমূলক বলা হয়, যে কেউ তার ভাইয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে সালাম দিলে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তিকে কয়েক রিয়াল দেয়া হবে। তাহলে অবশ্যই দেখা যাবে, সালাম প্রদানকারীকে সালাম দেয়ার জন্য (রিয়াল পাওয়ার উদ্দেশ্যে) মানুষ বাজারে তাকে খুজছে। কিন্তু আমরা দশগুণ প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে শৈথিল্যতা দেখাই-অবহেলা করি। আল্লাহই প্রকৃত সাহায্যেকারী।

অন্যান্য উপকারীতা: মানুষের মাঝে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি হওয়া। ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বজায় রাখা, তা সুদৃঢ় করা ও অব্যাহত রাখার ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে। আর ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বিরোধী বিষয় থেকে বিরত

থাকতে হবে। ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বিরোধী অনেক বিষয় আছে। যেমন: ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কারো দরদামে দরকষাকষি করা। কোন মুসলিমের বিবাহ প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া। অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। এ ধরনের প্রত্যেক শত্রুতা ও বিদ্বেষকে দমন করে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বজায় রাখতে হবে। এখানেই রয়েছে ঈমানের বাস্তবতা। এ প্রসঙ্গে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا".

আল্লাহর শপথ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান করো এবং পরস্পরকে ভালোবাসো।]৫৩[

জ্ঞাতব্য যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছতে ভালোবাসে, তার ঐ সম্মান ঈমান বাস্তবায়নের মধ্যে নিহিত। কেননা, আমাদের শারীরিক আমল খুবই কম এবং দুর্বল। ছ্বলাত আদায় করলে তা অতিত হয়ে যায়, অনুরূপ ছিয়াম পালন ও দান-ছাদাক্বাও গত হয়। অথচ আমরা এসব ইবাদত থেকে অন্য কিছু অর্জন করি। এসব আমল সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জানেন। আমাদের এসব আমলের দিক থেকে আমরা দুর্বল। আমাদের ঈমান শক্তিশালী করা দরকার। আর সালাম প্রদানের মাধ্যমে ঈমান শক্তিশালী হয়। কেননা, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذ فعلتموه تحاببتم يعني حصل لكم الإيمان أفشوا السلام بينكم"

আল্লাহর শপথ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান করো এবং পরস্পরকে ভালোবাসো। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিবো না যখন তোমরা তা করবে তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ তোমাদের ঈমান অর্জন হবে। তোমরা বেশি বেশি সালাম প্রদানে অভ্যস্ত হও।[৫৪]

---

[৫৩] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/ ৫৪, ইবনে মাজাহ হা/৬৮, আবূ দাউদ হা/৫১৯৩, তিরমিযী হা/২৬৮৯।
[৫৪] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/ ৫৪, ইবনে মাজাহ হা/৬৮, আবূ দাউদ হা/৫১৯৩, তিরমিযী হা/২৬৮৯।

আমরা যা জানলাম তা একটি মাত্র বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা অনেক কিছুই লঙ্ঘন করি। এ জন্য আমি বলি, আমরা যা জেনেছি তা সমন্বয় সাধনের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে এ কামনা করছি তিনি যেন আমাকে এবং তোমাদের সকলকে এ ব্যাপারে সাহায্যে করেন। কেননা, আমরা জানি অনেক কিন্তু আমল করি কম। হে আমার শিক্ষার্থী ভাইগণ! ইলম অর্জন, তদানুযায়ী আমল এবং এর মাঝে সমন্বয় সাধন সবই তোমাদের উর আবশ্যক। ইলম হচ্ছে দলীল-প্রমাণ স্বরূপ। যখন ইলম অনুযায়ী আমল করবে তখন তা বৃদ্ধি পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} [محمد: ١٧] .

যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদের হেদায়াত প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাক্বওয়া প্রদান করেন (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৭)।

বুঝা গেল, তোমরা ইলম অনুযায়ী আমল করলে তোমাদের আলো ও দলীল বৃদ্ধি পাবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ} [الأنفال: ٢٩] .

হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল (সূরা আল-আনফাল ৮:২৯)। তিনি আরো বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الحديد: ٢٨] .

হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, আর তোমাদেরকে নূর দেবেন যার সাহায্যে তোমরা চলতে পারবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু (সূরা আল-হাদীদ ৫৭:২৮)।

এ আয়াতের অনেক অর্থ রয়েছে। তোমাদের উচিত হবে যে, ইবাদত, চরিত্র ও আদান-প্রদান সব কিছুতেই সমতা বজায় রাখা। যাতে তোমরা প্রকৃত শিক্ষার্থী হিসাবে গণ্য হও। আল্লাহর কাছে সাহায্যে কামনা করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে সঠিক কথা-কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা দান করেন। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সাড়াদানকারী। সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

১৩. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, কখন শিক্ষার্থীরা ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) এর মাযহাবের অনুসারী হবে? জবাবে তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) ও অন্যান্য ইমামগণের মাযহাব দু’শ্রেণীতে বিভক্ত।

(ক) ব্যক্তি কেন্দ্রীক মাযহাব (খ) পরিভাষাগত মাযহাব।

বর্ণনা সমূহের মধ্যে (নির্দিষ্ট করে) কোন একটি বর্ণনা গ্রহণ করলে তুমি হবে ব্যক্তি কেন্দ্রীক মাযহাবের অনুসারী। আর পরিভাষাগত মাযহাবের সাথে ব্যক্তি কেন্দ্রীক মাযহাবের বৈপরীত্য থাকায় তা গ্রহণ করলে ব্যক্তি কেন্দ্রীক মাযহাবের উপর তুমি অটল থাকতে পারবে না। ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) তার ব্যক্তি কেন্দ্রীক মাযহাব থেকে প্রত্যাবর্তন করে কখনো পরিভাষাগত মাযহাবকে নির্ধারণ করতেন। ব্যক্তি কেন্দ্রীক মাযহাবের কথা বলতেন না। তবে মাযহাবের সঠিক বিষয় অনুসরণে প্রত্যেকের জন্য যে পদ্ধতি রয়েছে মানুষ ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করে চলবে।

১৪. প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য আপনার দিক-নির্দেশনা কি? তারা নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করবে নাকি মাযহাব থেকে বের হবে?

জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: ٧] .

তোমার পূর্বে আমি পুরুষই পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠাতাম। সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান (সূরা আম্বিয়া ২১:৭)।

কথা হলো, প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা বুঝবে না যে, কিভাবে দলীল বের করতে হয়। তাই এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মৃত কোন ইমামের অনুসরণ করা অথবা বর্তমানে জীবিত কোন আলিমের নিকট জেনে নেয়া ছাড়া তার কোন পন্থা নেই। এটাই তার জন্য

উত্তম। কিন্তু তার নিকট যখন ছ্বহীহ হাদীছ বিরোধী কথার বর্ণনা স্পষ্ট হবে তখন হাদীছকেই গ্রহণ করা ওয়াজীব-আবশ্যক।

১৫. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, আলিমদের নিকট থেকে অর্জিত যে সব শিক্ষার্থীর আক্বীদা ও ফিক্বহী বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানের ভিত্তি রয়েছে তারা কি মাসজিদে দাওয়াত দানের ভূমিকা পালন করতে পারবে নাকি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে?

জবাবে শাইখ বলেন, আমি মনে করি, অনুমতি ছাড়া যে সব বিষয়ে শিক্ষার্থীর কথা বলা-আলোচনা করা নিষেধ, তারা ঐ বিষয়ে বক্তব্য দিবে না। কেননা, কোন বিষয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ওয়ালিউল আমর-নির্দেশ দাতার আনুগত্য করা ওয়াজীব-আবশ্যক। আর জেনে রাখতে হবে যে, ছোট প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যদি কথা বলা-আলোচনা করার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে তারা এমন বিষয়ে বক্তব্য দিবে যা তারা নিজেরা জানে না। এতে মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা এবং জটিলতার সৃষ্টি হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শারীরিক আমল সম্পর্কিত আক্বীদা বিষয়ক অতিরিক্ত কথা বলা হয়। তাই অনুমতি ছাড়া কোন বিষয়ে কথা বলা নিষেধ। তবে কেউ আলোচনার যোগ্য হলে তার জন্য কথা বলা সম্পূর্ণ নিষেধ নয়। এমনকি আমরা এক্ষেত্রে বলি যে, ঐ যোগ্য ব্যক্তির জন্য নির্দেশদাতার আনুগত্যর দরকার নেই। কেননা, অযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে শরী'আত প্রচারণা নিষেধ। কিন্তু শরী'আতের প্রচারকারী যোগ্য কিনা তা বুঝার জন্যই এখানে مَنعٌ নিষেধ শব্দটি শর্তযুক্ত করা হয়েছে। যেমন এখন তোমরা জানো যে, যারা স্বীকৃত প্রাপ্ত আলিম জেনে-বুঝে প্রত্যেকেই তাদের কাছে জানার জন্য এগিয়ে যায়। .... আর যে বিষয়ে নির্দেশদাতার অনুমতি ছাড়া কথা বলা নিষেধ ঐ বিষয়ে কথা বৈধ নয়। অর্থাৎ মাসজিদে অথবা জনসমাবেশে কথা বলা ঠিক নয়। তবে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মাঝে কোন ঘরে অথবা কামরায় আলোচনা হলে তাতে কোন সমস্যা নেই। আর কেউ তাতে বাধা সৃষ্টি করবে না।

১৬. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ইলম অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। যে ইলম অর্জন করতে চায় সে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে শুরু করবে? কোন متن মূল রচনা মুখস্থ করবে? ঐ সব শিক্ষার্থীর ব্যাপারে আপনার দিক-নির্দেশনা কি?

জবাবে শাইখ বলেন, প্রথমে ঐ সব শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনা দানের পূর্বে কোন আলিমের নিকট থেকে আমি ইলম অর্জনের পরামর্শ দিবো। কেননা, আলিমের কাছ থেকে ইলম অর্জনে বৃহৎ দু’টি উপকার লাভ হয়।

প্রথম: ইলম অর্জনের দিক থেকে আলিমই অধিক নিকটবর্তী। কেননা, তার নিকট রয়েছে পর্যবেক্ষণের জ্ঞান এবং বুঝানোর যোগ্যতা। শিক্ষার্থীকে পূর্ণতার সাথে সহজে তিনি শিক্ষা দান করে থাকেন।

দ্বিতীয়: শিক্ষার্থীর ইলম অর্জনে আলিম সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী। অর্থাৎ আলিম ছাড়াই যে ইলম অর্জন করে, সে মূলত গোলকধাঁধার মধ্যেই থাকে এবং সঠিক বিষয় হতে অনেক দূরে অবস্থান করে। এটা এজন্য হয় যে, সে অভিজ্ঞ আলিমের নিকট শিক্ষা অর্জন করেনি। ঐ আলিম ইলম অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে তাকে দিক-নির্দেশনা দিতে পারতেন যা সে পছন্দ করে।

আমি মনে করি, ইলম অর্জনে একজন শাইখের স্বরণাপন্ন হওয়ার ব্যাপারে মানুষের উৎসাহিত হওয়া উচিত। কেননা, কেউ তার শাইখের স্বরণাপন্ন হলে তার জন্য যা কিছু সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐ ব্যাপারে তিনি (শাইখ) দিক-নির্দেশনা দান করবেন। আর এ জবাবে সার্বজনীনতার দিক থেকে আমরা বলবো:

প্রথমত: সব কিছুর পূর্বে আল্লাহর কিতাব মুখস্থ করা দরকার। কেননা, এটাই ছাহাবীগণের রীতি। তারা দশটি আয়াতও এড়িয়ে যেতে না যতক্ষণ না তা জানতেন। আর আয়াতের জ্ঞানার্জন করত তদানুযায়ী আমল করতেন। আর আল্লাহর কালামই হচ্ছে অধিকতর মর্যাদাবান।

দ্বিতীয়: সংক্ষিপ্ত হাদীছের মতন-মূল ইবারত গ্রহণ করবে যা প্রমাণ স্বরূপ সংরক্ষিত থাকবে। যেমন: উমদাতুল আহকাম (**عمدة الأحكام**), বুলূগুল মারাম (**بلوغ المرام**), ইমাম নববীর আরবাঈন (**الأربعين النووية**) এবং অনুরূপ হাদীছ গ্রন্থাবলী।

তৃতীয়: বিধান সম্পর্কিত ফিক্বহের মূল ইবারত মুখস্থ করবে। আর "زاد المستقنع في اختصار المقنع" কিতাবটি মতন-মূল রচনা গ্রহণের দিক থেকে উত্তম বলেই জানি। কেননা, মানছুর ইবনে ইউনূস আল-বহুতী কিতাবটির ব্যাখ্যা করেন। তারপর অনেকেই কিতাবটির এ ব্যাখ্যা ও মূল-ইবারতের অনেক টিকা-টিপ্পনী যোগ করেছেন।

চতুর্থ: ইলমুন নাহু। তোমরা কি জানো নাহু কি? খুব কম সংখ্যক ছাত্রই তা জানে। তুমি এমন ছাত্রকে দেখবে যে, সে কুল্লিয়া তথা উচ্চ স্তরের লেখাপড়া শেষ করেছে অথচ ইলমে নাহুর কিছুই সে জানে না। এ প্রসঙ্গে কবির ছন্দ উল্লেখ করে উদাহরণ পেশ করা হলো:

لا بارك الله في النحو ولا أهله ... إذا كان منسوبا إلى نفطويه

أحرقه الله بنصف اسمه ... وجعل الباقي صراخًا عليه

জবাব হচ্ছে, কবি এখানে নাহু শাস্ত্র শিক্ষার অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি বলবো, ইলমে নাহুর অধ্যায় কঠিন অর্থাৎ ইলমে নাহু শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে তা কঠিনই মনে হবে। কিন্তু শিক্ষার্থী ইলমে নাহুর অধ্যায় পড়তে থাকলে তার জন্য এর সব নিয়ম-কানুনই সহজ হয়ে যাবে। নাহু শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার্থী যারা নাহু শিক্ষায় আগ্রহী, আমি তাদেরকে সম্বোধন করে বলবো যে, তারা যেন শব্দের শেষে ইরাব প্রদানের অনুশীলন করে। আর নাহু শাস্ত্রের মধ্যে النحو الآجرومية কিতাবটিই উত্তম। এটি একটি সংক্ষিপ্ত মূল কিতাব। আমি প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে এ কিতাবটি পড়ার পরামর্শ দিবো। এসব উছুলের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জন করবে।

পঞ্চম: ইলমে তাওহীদ সম্পর্কিত কিতাব। এ বিষয়ে অনেক কিতাব আছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো: শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (রহিমাহুল্লাহ) রচিত 'কিতাবুত তাওহীদ' (**كتاب التوحيد**)। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) রচিত 'আল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বীয়া' (**العقيدة الواسطية**)। এ কিতাবটি বহুল পরিচিত। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।

শিক্ষার্থীর প্রতি আমার ব্যাপক উপদেশ হলো আল্লাহভীতি অর্জন, তার আনুগত্য উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, উত্তম চরিত্র গঠন, শিক্ষাদান ও দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি ইহসান, সকল প্রকার মাধ্যম অবলম্বনে ইলম প্রচারে উৎসাহ প্রদান হোক তা সাংবাদিকতা অথবা কোন ক্ষেত্র অথবা কিতাব রচনা অথবা কোন বার্তা-লিখনী অথবা প্রচার মাধ্যম প্রভৃতির মাঝে যেন শিক্ষার্থীর ইলমের ছাপ-নিদর্শন থেকে যায়। শিক্ষার্থীর প্রতি আমার আরো উপদেশ হচ্ছে, সে যেন কোন বিষয়ে ফায়ছালা প্রদানে ত্বরান্বিত না হয়। কেননা, কতিপয় প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে দেখা যায়, ফাতাওয়া প্রদান ও বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিষয়ে (সিদ্ধান্ত গ্রহণে) তাড়াহুড়া করে। অথচ তারা ব্যতিরেকে অনেক বড় বড় আলিমও ভুল করে

থাকে। এমনকি শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে কতিপয় লোক বলে, আমরা একজন প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে তর্কের খাতিরে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি যে, এটাতো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কথা। প্রতিউত্তরে সে বলে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কে? ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একজন মানুষ আমরাও মানুষ। সুবহানাল্লাহ! এটা ঠিক আছে যে, তিনি মানুষ আর ঐ শিক্ষার্থীও মানুষ। উভয়ে পুরুষ হওয়ার দিক থেকে সমান। কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধির দিক থেকে উভয়ের মাঝে রয়েছে বিশাল ব্যাবধান। ইলমের সম্পর্ক ছাড়া কোন মানুষ বড় হিসাবে গণ্য হয় না। আমি বলবো, বিনয়-নম্রতার সাথে শিক্ষার্থীর শিষ্টাচারিতা অর্জন করা দরকার এবং নিজেকে নিয়ে আশ্চার্য না হওয়াই উচিত। আর নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে জানা থাকা প্রয়োজন।

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আলিমদের কথা নিয়ে বেশি পর্যালোচনা না করা। কেননা, তাদের কথা নিয়ে বেশি পর্যালোচনা করলে এবং ইবনে কুদামার কিতাব ‘ المغني في الفقه ’ ইমাম নববীর কিতাব والمجموع এবং মতভেদ উল্লেখ আছে এমন বড় বড় কিতাব অধ্যয়ন করলে প্রাথমিক শিক্ষার্থী বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বিনষ্ট হবে। শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত ইবারত জানতে হবে। যাতে সে উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারে। গাছে উঠে তার ডাল পালায় ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা করা ভুল।

১৭. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, সংক্ষিপ্তভাবে ইলম অর্জনের পদ্ধতি কি? আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

তার জবাবে ইলম অর্জনের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. আল্লাহর কিতাব মুখস্থ করণে তুমি আগ্রহী হবে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট চিন্তা করে ও বুঝে মুখস্থ করবে। এ কিরা’আতের উপকারীতা যখন তোমার জন্য কাজে আসবে তখন তুমি এর গভিরে প্রবেশ করবে।

২. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছ্বহীহ সুন্নাহ হতে যা সহজ মনে হয় তা মুখস্থ করণে উৎসাহী হবে। আর একারণে বিধি-বিধানের মৌলিক বিষয়গুলো মুখস্থ করতে হবে।

৩. কোন বিষয়কে কেন্দ্রীভূত করে ঐ বিষয়ের উপর অটল থেকে তা অর্জন করবে। কিতাবের যেখানে সেখানে এলোমেলো পাঠ করবে না। এতে সময় অপচয় হবে এবং অন্তর হবে অস্থির।

৪. প্রথমে ছোট কিতাব পড়া আরম্ভ করবে এবং ভালভাবে চিন্তা করে বুঝে নিবে। তারপর এর চেয়ে উচ্চ স্তরের কিতাব পাঠ করবে। এভাবেই অল্প অল্প করে জ্ঞানার্জন হতে থাকবে এমনকি জ্ঞানার্জনে গভিরে প্রবেশ করবে। ফলে আত্মা প্রশান্তি লাভ করবে।

৫. মাসআলা সমূহের উছুল ও নিয়ম কানুন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে। তোমার সামনে পেশ করা হয় এমন প্রত্যেক বিষয় নিয়ে তুমি চিন্তা করবে। কেননা, বলা হয়ে থাকে, যে উছুল হতে বঞ্চিত হলো সে মূলত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা থেকেই বঞ্চিত হলো।

৬. তোমার শাইখ অথবা ইলম ও দীনের দিক থেকে তুমি যাকে বিশস্ত ও নিকটতম মনে করো তার সাথে মাসআলা নিয়ে পর্যালোনা করবে।

১৮. শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) এর কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমানে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার হুকুম কি?

জবাবে তিনি বলেন, প্রয়োজন মনে হলে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের মাধ্যম হিসাবে এ ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। আর প্রয়োজনীয়তা না থাকলে এ ভাষা শিক্ষা করে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। আর এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকাই ভাল। আর লোকেরা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে থাকে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়াহূদীদের ভাষা শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে দাওয়াতের মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতে হবে। নচেৎ তা শিক্ষা করে সময় নষ্ট করবে না।

১৯. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, এমন শিক্ষণীয় চলচ্চিত্র যেখানে নারীরা যুক্ত আছে এবং বিশেষতঃ ইংরেজী ভাষা শিক্ষার চলচ্চিত্র দেখার ব্যাপারে হুকুম কি?

জবাবে শাইখ বলেন, আমি মনে করি, শিক্ষণীয় চলচ্চিত্র দেখা বৈধ। এতে সমস্যা নেই। কেননা, কল্যাণ লাভের উদ্দেশেই তা দেখা হয়। এখানে যদি নারীরা যুক্ত থাকে এবং দর্শক পুরুষ হয় আর ঐ সব পুরুষ তাদেরকে দেখে তাহলে এটা হারাম। এরূপ না হলে তা বৈধ। তবে সর্বাবস্থায় আমি তা অপছন্দ করি। কেননা, এটা দেখার কারণে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর এ চলচ্চিত্রের অনুষ্ঠানে নারীরা কথা বললে শিক্ষার্থীর সামনে একটা পর্দা দিতে হবে যাতে নারীর চেহারা প্রকাশ না পায়। এ অবস্থা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন

প্রশিক্ষণের জন্য পুরুষ লোক পাওয়া যাবে না এবং নারীদের কথা শুনা জরুরী হয়। আর পুরুষ লোক পাওয়া গেলে নারীদের প্রয়োজন হবে না।

২০. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, কতিপয় সৎ যুবকদের নিকট তাক্বলীদ না করার কথাটি বেশি প্রচলিত। ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এর কতিপয় কথার উপর তারা বেশি নির্ভর করে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

জবাবে তিনি বলেন, মূলত এ বিষয়ে আমি গুরুত্বারোপ করি যে, মানুষ তাক্বলীদকে ভিত্তি হিসাবে নির্ধারণ করবে না। কেননা, মুক্বাল্লিদ কখনো ভুল করে। এসত্ত্বেও আমি মনে করি না যে, পূর্ববর্তী আলিমদের কথা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। আমরা বিচ্ছিন্ন হবো না আর প্রত্যেক মাযহাব থেকেই সঠিক বিষয় গ্রহণ করবো। কেননা, যারা তাক্বলীদকে অস্বীকার করে এমন ভাইদের দেখতে পাই তারা কখনো ভ্রষ্টতার পথ বেছে নেয় আর তারা এমন কথা বলে যা পূর্ববর্তী আলিমদের কেউ বলেননি। কিন্তু যখন তাক্বলিদের প্রয়োজন দেখা দিবে তখন তা আবশ্যক। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

যদি তোমরা না জানো তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো *(সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৭)*।

আয়াতটির মাধ্যমে বুঝা যায়, আমরা কোন কিছু না জানলে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা আল্লাহ আমাদের জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আর জানার উদ্দেশে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করার বিষয়টি তাদের কথার উপর নির্ভর করা অন্তর্ভুক্ত করে। নচেৎ জিজ্ঞেস করা উপকারহীন বলে গণ্য হবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, **তাক্বলীদ হচ্ছে মৃত জন্তুর ন্যায়। অপারগ অবস্থায় যা খেতে পারো। নচেৎ তা তোমার জন্য হারাম।**

মানুষের অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে দলীল ভিত্তিক কিতাবাদী পাঠ করতে সক্ষম নয় তখন তাক্বলীদ করা তার জন্য অসুবিধা নেই। কিন্তু সে এমন ব্যক্তির তাক্বলীদ করবে যে ইলম ও আমানতের দিক থেকে হক্বের অধিক নিকটবর্তী। অপর দিকে যদি সে আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ হতে বিধান সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়, সে ক্ষেত্রে তার জন্য তাক্বলীদ দরকার নেই।

২১. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, বিষয় ভিত্তিক বিদ্যা যেমন: চিকিৎসা শাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজন হলে মানুষ এসব বিষয় ভিত্তিক বিদ্যার্জন করবে নাকি শারঈ বিদ্যা?

জবাবে শাইখ বলেন, সন্দেহ নেই যে, শারঈ বিদ্যার্জনই আসল। আর শারঈ বিদ্যার্জন ছাড়া যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

বল, এটাই আমার পথ, আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করি সজ্ঞানে আমি এবং আমার অনুসারীগণও *(সূরা ইউসূফ ১২:১০৮)*।

সুতরাং বুঝা যায়, শারঈ বিদ্যার্জনই আবশ্যক যার মাধ্যমে ব্যক্তির জীবন দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর শারঈ ইলমের ভিত্তি ছাড়া কোন বিষয়ে দাওয়াত দানে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়। আর এ প্রাসঙ্গিকতার দিক থেকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের পূর্বে শারঈ জ্ঞানার্জনের প্রতি ভাইদেরকে উৎসাহিত করা আমি গুরুত্বারোপ করি। এ অর্থ নয় যে, তাদেরকে গভীর জ্ঞানার্জন করতে হবে। কিন্তু কোন বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান না থাকলে ঐ ব্যাপারে তারা কথা বলবে না। কেননা, কোন অজ্ঞাত বিষয়ে কথা বললে তারা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

বল, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না *(সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩৩)*।

শারঈ জ্ঞান দু'প্রকার:

(ক) ফরয: দীন ও পার্থিব প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক।

(খ) ফরযে কেফায়াহ: এখানে শারঈ বিদ্যা এবং শারঈ নয় এমন অন্যান্য বিদ্যা যা মানুষের প্রয়োজন উভয়ের মাঝে সমতা রক্ষা করা সম্ভব। অনুরূপভাবে শারঈ নয় এমন অন্যান্য বিদ্যা তিন প্রকার:

১. ক্ষতিকর বিদ্যা যা শিক্ষা করা হারাম এবং এ বিদ্যার্জনে নিয়োজিত থাকা মানুষের জন্য বৈধ নয় যতক্ষণ তার কুফল থাকবে।

২. উপকারী বিদ্যা, যাতে উপকার নিহিত আছে তা অর্জন করবে।

৩. এমন বিদ্যা যা না জানলে ক্ষতি হবে না এবং তার মাধ্যমে উপকারও লাভ হবে না। এ সব বিদ্যার্জনে সময় নষ্ট করা শিক্ষার্থীর জন্য উচিত নয়। যেমন: ইলমে মানতেক বা তর্ক শাস্ত্র।

২২. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, অধিকাংশ যুবক প্রভাবিত হয়ে সাংস্কৃতিক পুস্তকাদী পাঠ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে এবং উছুলের কিতাবাদী পাঠে গুরুত্ব দেয় না এ ব্যাপারে আপনার উপদেশ কি?

শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) জবাবে বলেন, প্রথমত আমার নিজের জন্য উপদেশ এবং শিক্ষার্থী ভাইদের প্রতি উপদেশ হচ্ছে যে, তারা সালাফদের কিতাবাদী পাঠে মনোযোগী হবে। কেননা, তাদের কিতাবে অনেক কল্যাণ ও জ্ঞান আছে এবং তাদের কিতাব পঠনে অনেক বরকত নিহিত আছে যা জ্ঞাত।

২৩. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা অনেক মানুষকে দেখি যে, কতিপয় শারঈ জ্ঞান তাদের রয়েছে যেমন: দাড়ি মুণ্ডন করা, ধুমপান করা হারাম হওয়ার জ্ঞান অথচ এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা আমল করে না। এর কারণ কি? এ প্রকাশ্য মারাত্মক অপরাধের কি প্রতিকার রয়েছে?

জবাবে তিনি বলেন, এর কারণ হলো: কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। যা সে হারাম মনে করে তা থেকে বিরত থাকতে আল্লাহভীতি অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে এমন দীনি সংযোমশীলতা এ শ্রেণীর মানুষের মাঝে নেই।

আরো কারণ হচ্ছে, বান্দার অন্তরে শয়তান এ ধরনের পাপাচারিতার কুমন্ত্রনা দেয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন,

إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مَثَل ذلك كمثل قوم نزلوا أرضًا فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود ثم إذا جمعوا حطبًا كثيرًا وأضرموا نارًا كثيرًا"

তোমরা ছোট গুনাহ থেকেও বিরত থাকো। কেননা, এ ধরনের গুনাহের উদাহরণ হলো ঐ সম্প্রদায়ের মত যারা কোন এক এলাকায় প্রবেশ করে, অতঃপর তারা এর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে অতঃপর অনেক কাঠ সংগ্রহ করার পর বিশাল অগ্নিকুন্ড প্রজ্জলিত করে।

অনুরূপভাবে মানুষ যে সব গুনাহকে তুচ্ছ মনে তাতে সর্বদা লিপ্ত থাকার কারণে তা কাবীরাহ গুনাহে পরিণত হয়। এজন্য আলিমগণ বলেন, ছোট গুনাহে সদা লিপ্ত থাকলে তা কাবীরাহ গুনাহে পরিণত হয়। আর কাবীরাহ গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে তা মিটে যায়। এজন্য আমি এ শ্রেণীর লোকদের বলি, তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে ভেবে দেখা উচিত। আরো কারণ হলো, সৎকাজের আদেশ কমে যাওয়া এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ না করা। আমাদের প্রত্যেকে কোন অন্যায় কাজ দেখলে সে অন্যায়কারীকে সুপথ দেখাবে এবং তাকে বর্ণনা করে বুঝাবে যে, এটা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিক-নির্দেশনার বিপরীত কর্ম। কেননা, অচিরেই বিবেককে এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে এবং বিবেকের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

২৪.শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও আলিমের করণীয় কি?

জবাবে শাইখ বলেন, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: ١٢٥]

তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর *(সূরা আন-নাহাল ১৬:১২৫)*।

আল্লাহ তা'আলা দাওয়াতের তিনটি পর্যায় নির্ধারণ করেছেন। তা হচ্ছে,

ক. হিকমত-প্রজ্ঞাসহ দাওয়াত দান

খ. উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দান ও

গ. উত্তম পন্থায় তর্কের মাধ্যমে দাওয়াত দান।

যাকে দাওয়াত দেয়া হবে হয়তো তার জ্ঞান নেই, তর্ক-বিতর্ক ও বিরোধীতার করার সক্ষমতাও নেই। এ শ্রেণীর মানুষদেরকে হিকমত-প্রজ্ঞা সহ

দাওয়াত দিতে হবে। হক্বের বর্ণনাই হলো প্রজ্ঞা। আর এক্ষেত্রে যদি হক্ব বর্ণনায় প্রজ্ঞা অবলম্বন করাই সহজ মনে হয় এবং কোন হক্ব কেউ বর্জন করে এবং হক্ব গ্রহণ হতে বিরত থাকে তাহলে তাকে হক্ব গ্রহণের প্রতি উৎসাহ দিতে হবে অথবা ভীতি প্রদর্শন করতে হবে। অবস্থা অনুপাতে উভয়টি প্রযোজ্য হবে। আর যে হক্বকে বর্জন করে এবং হক্ব বর্জনে তর্ক করে তার সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করতে হবে এবং তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে।

যে লোক তার প্রভূর ব্যাপারে ঝগড়া করেছিল তার সাথে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর তর্ক-বিতর্কের দিকে লক্ষ্য কর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}[البقرة: ٢٥٨]

তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইব্রাহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে বিতর্ক করেছে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন? যখন ইব্রাহীম বলল,আমার রব তিনিই যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহীম বলল, নিশ্চয় আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য আনেন। অতএব, তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে আন। ফলে কাফির ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না *(সূরা আল-বাক্বারা ২:২৫৮)।*

এটা কেমন ব্যাপার! মৃত্যুদন্ডের উপযুক্ত এক লোককে হত্যা করার জন্য ফিরআউনের কাছে নিয়ে আসা হলো অতঃপর সে তাকে হত্যা না করে ছেড়ে দিলো। ফিরআউনের ধারণা অনুযায়ী এটাই হলো ঐ লোকের জন্য জীবন ফিরিয়ে দেয়ার অবস্থা। অন্যদিকে অপর এক লোক মৃত্যুদন্ডের উপযুক্ত নয় অথচ সে তাকে হত্যা করলো। তার ধারণা মতে, এটাই হলো ঐ লোকের দান। এখানে এ কথা বলে তর্ক করা সম্ভব যে, মৃত্যুদন্ডের উপযুক্ত লোকটিকে তোমার কাছে নিয়ে আসা হলে তাকে হত্যা না করে তুমি তাকে জীবন দান করোনি। কেননা, পূর্ব হতেই ঐ লোক জীবিত ছিল। কিন্তু হত্যা না করার কারণে সে বেঁচে আছে। অনুরূপভাবে বলা যায়, যে লোক মৃত্যুদন্ডের উপযুক্ত নয় তাকে হত্যা করার কারণে সে মৃত্যু বরণ করে নাই। বরং ঐ লোকের মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র। এজন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ঘটনায় উল্লেখ করেন যে, তার কাছে এক যুবককে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর যুবক

সাক্ষ্য দিবে যে, এ হলো দাজ্জাল যার সম্পর্কে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। অতঃপর দাজ্জাল তাকে হত্যা করে দ্বিখন্ডিত করবে। অতঃপর সে দ্বিখন্ডের মাঝে অবস্থান করে ঐ মৃত যুবককে ডাকবে। অতঃপর ঐ যুবক আলোকময় অবস্থায় হাস্যেজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষ্য দিবে যে, তুই সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের খরব দিয়েছেন। অতঃপর সে তাকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে যাবে কিন্তু তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না। এটাই প্রমাণিত হয় যে, সবকিছুর চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে। কারো সাথে অযথা তর্ক করা সম্ভব কিন্তু ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) দলীল-প্রমাণ পেশ করতে চেয়েছিলেন যার জন্য কোন তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়ার প্রয়োজন হবে না। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর ভাষায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

ইব্রাহীম বলল, নিশ্চয় আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য আনেন। অতএব, তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে আন *(সূরা আল-বাক্বারা ২:২৫৮)।*

অতঃপর জবাব দান থেকে তারা বিরত থাকলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ} [البقرة: ٢٥٨]

কাফির ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে গেল *(সূরা আল-বাক্বারা ২:২৫৮)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: ١٢٥]

তোমরা উত্তম পন্থায় তর্ক করো *(সূরা আন-নাহাল ১৬:১২৫)।*

অর্থাৎ তর্কের নিয়ম অনুসরণ ও শ্রোতাকে তুষ্ট করণে উত্তম পন্থা অবলম্বন করা। আর সক্ষমতা অনুসারে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া আমাদের উপর ওয়াজিব। কিন্তু আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান ফরযে কিফায়াহ বলে গণ্য। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক মানুষ দাওয়াত দানের জন্য প্রস্তুত থাকলে অবশিষ্টদের জন্য তা যথেষ্ট হবে।

যখন দাওয়াত দান হতে লোকজনকে বিমুখ দেখবে এবং এমন কেউ নেই যে, দাওয়াত দিবে তখন এটা 'ফরযে আইন' বলে গণ্য হবে। কেননা, আলিমগণ বলেন, দাঈ ছাড়া দাওয়াত দানে আর কোন লোক না থাকলে সেক্ষেত্রে তা হবে ফরযে আইন।

২৫. শাইখের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, মু‘তাযিলা, জাহমিয়াহ ও খারেজী দল বিদ্যমান নেই তাহলে তাদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জেনে লাভ কি?

জবাবে শাইখ বলেন, এ যুগে বিদ‘আতী দল সম্পর্কে জানার উপকারীতা হচ্ছে, এসব দল যা কিছু গ্রহণ করেছে তা পাওয়া গেলে আমরা প্রত্যাখ্যান করবো। তারা কার্যতঃ বিদ্যামান। যেমন কোন প্রশ্নকারী বলেন, বর্তমানে তাদের কোন অস্তিত্বই নেই, তাদের ইলমের উপর ভিত্তি করতে হবে কেন। কিন্তু আমাদের সকলের নিকট এটা জ্ঞাতব্য যে, মানুষ মনে করে, এসব দলের অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। বিদ‘আত প্রচারে তাদের তৎপরতা রয়েছে। একারণে তাদের মতামত আমাদের জেনে রাখা দরকার। যাতে তাদের মিথ্যা ও হক্ব বুঝতে পারি এবং তারা যে সব বিষয়ে তর্ক করে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি।

২৬. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা শিক্ষার্থীরা অনেক আয়াত মুখস্থ করি, কিন্তু অনেক আয়াত ভুলে যাই। এমতাবস্থায় মুখস্থ করার পর ভুলে যাওয়ার কারণে কি শাস্তি ধার্য করা হবে?

জবাবে শাইখ বলেন, কুরআন ভুলে যাওয়ার দু’টি কারণ আছে:

প্রথম: স্বভাবগত কারণ।

দ্বিতীয়: কুরআন থেকে বিমুখ হওয়া এবং ভ্রুক্ষেপ না করা।

প্রথম কারণে কোন গুনাহ হবে না এবং শাস্তি ধার্য হবে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ছ্বলাতের ইমামতি করতেন তখন আয়াত ভুলে যেতেন। ছ্বলাত শেষে উবাই ইবনে কা‘ব ভুলে যাওয়া আয়াত তাকে স্বরণ করিয়ে দিতেন। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলতেন, "هلا كنت ذكرتنيها" তুমি তা আমাকে কেন স্বরণ করিয়ে দিলে না?[৫৫] তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পাঠ করতে শুনতেন:

"يرحم الله فلانًا فقد ذكرني آية كنت أنسيتها".

আল্লাহ তা‘আলা অমুককে দয়া করুন, সে আমাকে আয়াত স্বরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি ভুলে গেছি।[৫৬]

---

[৫৫] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৯০৭, ইবনে হিব্বান হা/২২৪, ইবনে খুযাইমাহ হা/১৬৪৮।
[৫৬] মুত্তাফাকুন আলাইহি: বুখারী হা/৫০৩৭, মুসলিম হা/৭৮৮।

এটা প্রমাণিত হয় যে, স্বভাবগত কারণে মানুষ ভুলে যেতে পারে এতে তিরস্কারের কিছু নেই। অপরদিকে কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও ভ্রুক্ষেপ না করার কারণে গুনাহ হবে। কতিপয় মানুষকে শয়তান আয়ত্বাধীন করে নেয় এবং এভাবে কুমন্ত্রনা দেয় যে, কুরআন মুখস্থ করো না, তা ভুলে যাবে। এতে গুনাহ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} [النساء: ٧٦] .

তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল *(সূরা আন-নিসা ৪:৭৬)।*

কতিপয় মানুষ উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে দলীল পেশ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: ١٠١]

হে মুমিনগণ, এমন বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তা তোমাদেরকে পীড়া দেবে *(সূরা আল-মায়িদা ৫:১০১)।*

অতঃপর উক্ত আয়াতকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন করা, জেনে নেয়া ও শিক্ষা অর্জন অহেতুক কারণে তারা ছেড়ে দেয়। অথচ এ প্রেক্ষাপট অহী নাযিল হওয়া ও শরীআ'ত প্রনয়ণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। কতিপয় মানুষ এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেননি। অতঃপর তাদের সামনে ঐ জিজ্ঞাসিত বিষয় স্পষ্ট করা হতো। কোন বিষয় গ্রহণ করা অথবা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হতো। কিন্তু এখন বিধি-বিধানের কোন পরিবর্তন নেই। এতে কোন অপূর্ণতাও নেই। সুতরাং এখন জানার উদ্দেশ্যে দীন সম্পর্কে প্রশ্ন করা ওয়াজিব।

২৭. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, যে বিষয়ে মানুষ কিছু জানে এবং অপরকে ঐ বিষয় পালনের আদেশ দেয় অথচ সে নিজে আমল করে না হোক তা ফরয অথবা নফল। যে বিষয়ে সে আমল করে না তা পালনে অন্যকে আদেশ দেয়া কি তার জন্য বৈধ হবে? আর আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য তা পালন করা ওয়াজিব নাকি আমল ছাড়াই তার জন্য দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা বৈধ? অতঃপর দলীল অনুসরণের জন্য সে কি আমলই করবে না যে ব্যাপারে সে আদেশ দিয়েছে?

জবাবে শাইখ বলেন, এখানে দু'টি বিষয়।

প্রথম: যিনি কল্যাণের দিকে আহবান করেন অথচ তিনি নিজে আমল করেন না।

তার ব্যাপারে আমরা আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের বাণী পেশ করবো। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: ٢، ٣] .

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না?! তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ক্রোধের বিষয় *(সূরা আছ-ছাফ ৬১:২,৩)*।

আমি আশ্চর্য হই, ঐ লোক কেমন! যে হক্বের প্রতি ঈমান আনে, সে বিশ্বাস রাখে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ হয়, সে আল্লাহর বান্দা এ বিষয়েও তার বিশ্বাস আছে অথচ সে আমল করে না। এটাই তার আশ্চর্যের বিষয়। এটা তার নির্বোধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। একারণে সে তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হবে। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ}

সুতরাং আমি এ শ্রেণীর লোককে বলবো, যা তুমি জানো এবং যার দিকে তুমি আহবান করো তদানুযায়ী আমল ছেড়ে দেয়ার কারণে তুমি পাপাচারী। যদি তুমি নিজেকে দিয়ে আমল শুরু করতে তাহলে সেটা হতো বিবেক ও প্রজ্ঞার কাজ। অপরদিকে ঐ আদেশদাতার বিরোধীতা করা আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য শুদ্ধ নয়, যদি সে কল্যাণকর কোন কাজের আদেশ দেয় তাহলে সেটা গ্রহণ করা তার জন্য ওয়াজিব। আর যারাই হক্ব বলবেন তাদের কাছ তা গ্রহণ করা ওয়াজিব। বিদ্যার কারণে তাকে অবজ্ঞা করবে না।

২৮. শাইখের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কিভাবে তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করবো যারা বলে যে, মুখস্থ করণের উপর প্রভাব ফেলে এমন কোন কর্মব্যস্ততা পূর্ববর্তী আলিমদের ছিল না। যেমন বর্তমানে এ যুগের আলিমদের কর্মব্যস্ততা রয়েছে। তাদের মধ্যে কতিপয় এমন ছিল যারা কোন ব্যস্ততা ছাড়াই কেবল ইলম অর্জন, তা আয়ত্ব করণ ও ইলমের মজলিশে যোগদানের জন্যই বের হতো। কিন্তু এখন পার্থিব ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েই সময় অতিবাহিত হয়। আর মানুষ এ ব্যস্ততা থেকে বিরত থাকতে কি সক্ষম নয়?

জবাবে শাইখ বলেন, আমি শিক্ষার্থীকে বলবো, ইলম অর্জনের জন্যই যখন নিজেকে তুমি নিয়োজিত করবে তাহলে প্রকৃতপক্ষে তুমি শিক্ষার্থী হিসাবেই গণ্য হও। আর এটা বিশ্বাস করো যে, নির্মাতা যখন প্রসাদ নির্মাণে নিজেকে নিয়োজিত করে তখন সে অন্যকাজে মনোযোগ দেয় না। বরং যা সে নিজে নির্মাণ করবে তার দিকেই গুরুত্বারোপ করে। আর সে মনে করে, এটা করাই তার জন্য ভাল। অনুরূপ তুমি ইলম অর্জনে নিয়োজিত থাকলে সেটাই তোমার জন্য কল্যাণকর। আর তুমি কেবল ইলম অর্জনের পথ বেছে নেয়ার ইচ্ছা করবে, অন্যদিকে মনোযোগ দিবে না। আমার ধারণা মতে, ঈমান, ইখলাছ (একনিষ্ঠতা) ও সৎ নিয়্যাতের উপর কেউ অবিচল থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্যে করেন এবং তাকে এসব পার্থিব ব্যস্ততায় নিয়োজিত রাখেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন *(সূরা আত্ব-ত্বালাক্ব ৬৫:৪)।* তিনি আরো বলেন,

{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না *(সূরা আত্ব-ত্বালাক্ব ৬৫:২-৩)।*

সুতরাং ইলম অর্জনে সৎ নিয়্যাত আবশ্যব; তাহলেই এটা সহজ-সাধ্য হবে।

২৯. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, যারা শারঈ ইলম অর্জন করতে চায় অথচ তারা আলিমের নিকট ইলম অর্জন থেকে দূরে থাকে। কারণ তাদের কাছে উছুল ও সংক্ষিপ্ত কিতাবাদী রয়েছে। তাদের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?

জবাবে শাইখ বলেন, আমি শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিবো যে, তারা যেন ইলম অর্জনে অবিচল থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করে। অতঃপর তারা যেন বিদ্বানগণের শরণাপন্ন হয়। কেননা, নিজে নিজে কতিপয় কিতাব পাঠ করলে তাতে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হবে। তাই সরাসরি আলিমের নিকট হতে ইলম অর্জনে কম সময় ব্যয় হয়। অবশ্য আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যে, যারা বলে, আলিম অথবা শাইখ ছাড়া ইলম অর্জন সম্ভব নয়। এ কথাটি ঠিক

নয়। বাস্তবে তা মিথ্যাই বটে। কিন্তু শাইখের নিকট পাঠ গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর ইলম অর্জনের রাস্তা আলোকিত হয় এবং কম সময়ে তা অর্জন হয়।

৩০. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, আমি একজন শিক্ষার্থী আর আমার পরিবারে পারিপার্শ্বিক বস্তুগত অনেক কাজ আছে। আমার পিতা আমাকে বলে, ইলম অর্জনের চেয়ে পরিবারের জন্য কাজ করা অনেক উত্তম। এমতাবস্থায় আমি কি ইলম অর্জন ছেড়ে দিবো? এক্ষেত্রে পরিবারের জন্য আমার কাজ করা উত্তম নাকি উত্তম নয়?

জবাবে শাইখ বলেন, নিঃসন্দেহে ইলম অর্জন উত্তম। জরুরী অবস্থা ছাড়া এমনটা করা ঠিক নয়। তবে উভয় ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখাও সম্ভব। বিশেষতঃ আর্থিক সংকট দূরিকরণে ভূমিকা পালন করা যেতে পারে। আল-হামদুল্লিাহ আল্লাহ তা‘আলা অনেক মানুষকে সচ্ছলতা দান করেছেন। পরিবারের প্রয়োজন পূরণে তোমার এগিয়ে আসা সম্ভব। তুমি এমন মেয়েকে বিয়ে করতে পারো যার নিকট কিছু সম্পদ রয়েছে। তাহলে তুমি ইলম অর্জনে অবিচল থাকতে পারবে।

৩১. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার বইয়ের পাঠসমূহ পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় রচিত যা শরী‘আতের সাথে সাংঘর্ষিক। আমি জেনে এ চিন্তাধারার পাঠ গ্রহণের মনস্থ করেছি। আমার সনদ প্রাপ্তির পর এ ধরনের লেখাপড়ার মধ্যে মুসলিম উম্মতের জন্য কোন উপকার নিহিত আছে কি? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?

জবাবে শাইখ বলেন, আমি বলবো যে, নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের ইসলাম বিরোধী পাঠ গ্রহণের পর মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যান করবে। এজন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ‘য (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেছিলেন,

"إنك ستأتي قومًا من أهل الكتاب"

শীঘ্রই তুমি আহলে কিতাবের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো।[৫৭]

অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ‘য (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়ামানবাসীর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন। যাতে তাদেরকে দাওয়াত দানের জন্য তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন। এমনিভাবে যেসকল আলিম এ ধরনের পাঠ গ্রহণ

[৫৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৯৫, ১৪৫৮,৪৩৪৭। ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯।

করেছেন; যেমন: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বিভিন্ন বিষয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার লেখা পড়া করেন। অতঃপর তিনি এর মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রতি অনুরাগীদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হন। তুমিও যদি এ পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিষয়কে প্রতিহত করার জন্য তা শিখতে থাকো, সক্ষমতা ও সুরক্ষার মাধ্যমে এ বিষয়সমূহ প্রত্যাখ্যান করার উপর তোমার এমন দৃঢ়তা থাকতে হবে যাতে তুমি এ চিন্তাধারায় প্রভাবিত না হও। তা এভাবে হবে যে, তোমাকে শারঈ গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তোমাকে হতে হবে ইবাদতকারী ও আল্লাহভীরু। তাহলেই আমি আশা করবো, ইনশাল্লাহ এটা তোমার জন্য হবে কল্যাণকর এবং তা মুসলিমদের উপকারে আসবে। অপরদিকে তুমি যদি এ বিষয়ের কোনটিতে সম্পৃক্ত হও যা গ্রহণীয় নয় অথবা তোমার নিকট দলীল-প্রমাণ না থাকে তাহলে তুমি এ পথ অনুসরণ করবে না। এরূপই তুমি যদি বুঝতে পারো, তোমার দৃঢ় বিশ্বাস নেই এবং তা প্রতিহত করণে তোমার শক্ত অবস্থানও নেই তাহলে ইঙ্গিতে বলবো, এ বিষয়সমূহ ছেড়ে দেয়া তোমার উপর আবশ্যক। কেননা, এ অবস্থায় তা মারাত্মক বলে গণ্য হবে। আর শঙ্কার সাথে বিপদে পা বাড়ানো কোন মানুষের উচিত নয়।

৩২. শাইখের নিকট আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি একজন ছাত্র। আমি ভাল ছাত্র হিসাবে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পছন্দ করি। এটা আমার ভাল নিয়্যাত । সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যাওয়ায় খুশি হওয়া এবং নিম্ন অবস্থানে থাকায় দুঃখিত হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইখলাছ (একনিষ্ঠতার) কোন প্রভাব আছে কি?

জবাবে শাইখ বলেন, ইনশাল্লাহ জ্ঞাতব্য যে, এখানে ইখলাছের প্রভাব নেই। কেননা, এটা স্বভাবগত বিষয়। কারণ মানুষ ভাল কিছুর মাধ্যমে খুশি হয় এবং মন্দের দ্বারা দুঃখিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, যা মানুষের জন্য যথাযথ নয় তা খারাপ এমন বিষয়ে দুঃখিত হওয়াই আবশ্যক। অনুরূপভাবে ভাল বিষয়ে খুশি হওয়া আবশ্যক। তাই এ বিষয়ে তোমার ইখলাছে প্রভাব ফেলবে না যদি তোমার নিয়্যাত ভাল হয় যেমনটা তুমি বলছো। অপরদিকে কেবল সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছা ও সনদপত্র অর্জন কেন্দ্রীক চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত থাকো তাহলে এটি হবে অন্য বিষয়। উমার ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবীদেরকে প্রশ্ন করলেন, গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার সাথে মুমিনের তুলনা করা যায়। ছাহাবীগণ জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগলো। ইবনে উমার বলেন,

আমার ধারণা হলো সেটি হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি ছোট মানুষ হওয়ায় তা বলতে পছন্দ করিনি।[৫৮]

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পুত্রকে বলেন, আমি আশা করছিলাম যে, তুমিই উত্তরটা বলে দিবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের আনন্দ তার সফলতার সাথে জড়িত। এরূপ আনন্দের বিষয় সামনে আসলে তা প্রকাশ করাতে অসুবিধা নেই।

৩৩. শাইখের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ইংরেজী ভাষা শিক্ষা অর্জন করে বিশেষত আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানে তা ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

জবাবে শাইখ বলেন, আমরা মনে করি, ইংরেজী ভাষা শিক্ষা নিঃসন্দেহে একটি মাধ্যম। ভাল উদ্দেশ্যে এ ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা মন্দ নয়। আর উদ্দেশ্যে মন্দ হলে তা প্রয়োগ করাও মন্দ বটে। তবে সাধারণত আরবী ভাষার পরিবর্তে এটাকে গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা আবশ্যক। তা ব্যবহার করা সাধারণত বৈধ নয়। আমরা শুনে থাকি যে, কতিপয় নির্বোধ আরবী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা প্রয়োগ করে। কতিপয় অনুরাগী নির্বোধ রয়েছে যাদেরকে আমি অন্যের পাপের কারণ মনে করি, তারা তাদের সন্তানদেরকে অমুসলিমের কাছে শিক্ষা অর্জন করতে পাঠায়। ঐ অমুসলিম তাদেরকে বিদায়ী শুভেচ্ছা দেয় শিক্ষা দেয় বাই বাই বলে। এরূপ অন্যন্য শব্দাবলী শিখায়। আরবী ভাষা হলো কুরআনের ভাষা। অন্য ভাষার সাথে এ মর্যাদাপূর্ণ ভাষার পরিবর্তন নিষিদ্ধ। সালাফদের বিশুদ্ধ মত হলো এ ভাষার সাথে অনারবী ভাষার পরিবর্তন নিষিদ্ধ। তবে ইংরেজী ভাষা দাওয়াতের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে কখনো কখনো তা প্রয়োগ করা আবশ্যক। আমি এ ভাষা জানি না। আমি মনে করি, যদি তা শিখতাম তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারতাম।

আমার অন্তরে যা আছে তার পূর্ণ অনুবাদ সম্ভব নয়। জেদ্দা বিমান বন্দর মসজিদে ‘তাওঈয়াহ ইসলামিয়া’ লোকদের সাথে ঘটে যাওয়া একটা কাহিনী তোমাদের সামনে বর্ণনা করছি, ফজরের ছ্বলাত আদায়ের পর التيجاني মাযহাব সম্পর্কে আলোচনায় লিপ্ত হই। এটি মূলত বাতিল-মিথ্যা মাযহাব। এ মাযহাব পন্থীরা ইসলাম অস্বীকার করে। এ মাযহাব সম্পর্কে যা জানি তা বলতে আরম্ভ করলাম।

[৫৮] ছ্বহীহ বুখারী ৬২,৬১,১৩১, ছ্বহীহ মুসলিম ২৮১১।

ইতিমধ্যে আমার কাছে এক লোক এসে বললো, الهوسا নামক ভাষা অনুবাদের জন্য আমি আপনার অনুমতি চাই। আমি বললাম, অসুবিধা নেই অনুবাদ করুন। আরেক লোক দ্রুত প্রবেশ করে বললো, এ লোক যিনি আপনার পক্ষ থেকে অনুবাদ করবেন তিনি التيجانية ভাষার প্রশংসা করেন। আমি এ কথা শুনে অবাক হলাম এবং পাঠ করলাম: إنا لله وإنا إليه راجعون যদি আমি এ ভাষা জানতাম, তাহলে আমি তাদের প্রতারণার মুখোমুখী হতাম না। মোদ্দা কথা হলো তুমি যার সাথে কথা বলবে যোগাযোগ রক্ষায় তার ভাষা জানা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: ٤] .

আমি প্রত্যেক রসূলকে তার কওমের ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের নিকট বর্ণনা দেয় *(সূরা ইবরাহীম ১৪:৪)*।

৩৪. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, আমি নির্দিষ্ট বিষয় রসায়নের ছাত্র। আমি বিভিন্ন বিষয় ও পাঠ সমূহ পর্যালোচনা করি, এ ক্ষেত্রে এমন বিষয় উদ্ভূত হয় যার মাধ্যমে আমি নিজে উপকৃত হই এবং অন্যের উপকার সাধনে যে কোন ক্ষেত্রে জ্ঞান চর্চার সাথে কর্মরত থাকতে পারি হোক তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা শিল্প-কারখানা এ অবস্থায় শারঈ জ্ঞান চর্চা থেকে আমার বঞ্চিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় আমি উভয়ের মাঝে কিভাবে সমতা বজায় রাখবো?

জবাবে শাইখ বলেন, আমি মনে করি, উভয় ইলম চর্চার মাঝে সমন্বয়সাধন এভাবে হওয়া সম্ভব যে, তুমি শারঈ জ্ঞান চর্চাকেই কেন্দ্রীভূত করবে। এটাই হবে তোমার নিকট মৌলিক বিষয়। আর অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান চর্চা অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হবে। অতঃপর তোমার ও জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে এ দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞান চর্চায় তুমি মনোনিবেশ করতে পারো। যেমন এ জ্ঞান চর্চায় তুমি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ হিকমত-প্রজ্ঞা প্রমাণ করবে। আর সব কিছুর কারণ সমূহের মাঝে তুমি বন্ধন খুঁজতে থাকবে। আর এমন বিষয়ে পৌঁছবে যা আমরা জানি না। আর এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই। আমি বলবো, শারঈ জ্ঞান চর্চায় অটল থাকো এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করতে পারো। সর্বপরি শারঈ জ্ঞান চর্চাকে কেন্দ্রীভূত করবে।

৩৫. শাইখের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কুরআনের কোন তাফসীর অধ্যয়নের পরামর্শ দিবেন? মানুষ কুরআন মুখস্থ করার পর তা ভুলে যায় এ কারণে কি শাস্তি

ধার্য হবে? মানুষ কিভাবে মুখস্থ করবে এবং যা মুখস্থ করেছে তা সংরক্ষণ করবে কিভাবে?

জবাবে শাইখ বলেন, কুরআনের বিভিন্ন জ্ঞান রয়েছে। আর প্রত্যেক মুফাস্‌সির এ জ্ঞানের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর করে একটা পক্ষ অবলম্বন করেছেন। আর বিভিন্ন দিক থেকে তাফসীর করার কারণে সব তাফসীর একই রকম হওয়া সম্ভব নয়।

التفسير الأثري অর্থাৎ ছাহাবী ও তাবেঈনগণ যে তাফসীর করেছেন ঐ তাফসীর কেন্দ্র করে কতিপয় আলিম তাফসীর করেন। যেমন: তাফসীর ইবনে জারির ও তাফসীর ইবনে কাছির।

আবার কেউ চিন্তাধারার আলোকে তাফসীর করেন। যেমন: যামাখশারীর তাফসীর। আমি মনে করি, প্রথমত আয়াতের তাফসীর নিজে বুঝতে হবে। অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি করে নিজে বুঝতে হবে যে, এটাই আয়াতের অর্থ। অতঃপর আলিমগণ ঐ আয়াতের ব্যাপারে যা লিখেছেন তা পর্যালোচনা করতে হবে। কেননা, এটা তাফসীরের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার উপকারে আসবে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্পষ্ট আরবী ভাষার লোকদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

{بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ}

সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। *(সূরা আশ শুয়ারা ২৬:১৯৫)*

আর ছাহাবীদের তাফসীরের দিকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। কেননা, তারা মানুষের মধ্যে হতে কুরআনের অর্থ বেশি বুঝতেন। এরপর তাবেঈ মুফাস্‌সিরগণের লিখিত তাফসীর অধ্যয়ন করতে হবে। বিভিন্ন তাফসীর রচিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ আল্লাহ তা'আলার কালামের দোষ-ত্রুটি বের করতে পারেনি। এটা মনে করা হয় যে, মানুষ আয়াতের তাফসীর বারবার অধ্যয়ন করবে। অতঃপর মুফাস্‌সিরগণের কথা পর্যালোচনা করবে। তাতে কুরআনের অনুকূলে কথা পাওয়া গেলে সেটাই হবে সম্ভবপর কুরআনের তাফসীর এবং তা গ্রহণ করা মানুষের জন্য সহজ বলে গণ্য হবে। অপরদিকে কুরআনের বিপরীত কিছু পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে সঠিক তাফসীরের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

আর ব্যক্তি বিশেষে কুরআন মুখস্থ করার পদ্ধতিও ভিন্ন হয়ে থাকে। কিছু মানুষ একটা একটা মুখস্থ করে। তা এভাবে যে, প্রথমে একটি আয়াত মুখস্থ করে পাঠ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ঐ আয়াত পুনরাবৃত্তি করে মুখস্থ করতে থাকে। অতঃপর অন্য আয়াত মুখস্থ করে এভাবে অষ্টমাংশ অথবা চতুর্থাংশ এবং এরূপই বাকি অংশ পরিপূর্ণভাবে মুখস্থ করে। আবার কেউ এক অষ্টমাংশ সম্পূর্ণ মুখস্থ করে পুনরাবৃত্তি করতে থাকে এভাবে তা মুখস্থ হয়। মুখস্থ করার ব্যাপারে কোন নিয়ম কানুন বর্ণনা করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। আমরা মানুষকে বলবো, কুরআনের যতটুকু মুখস্থ করা তোমার জন্য উপযোগী তা তুমি কাজে লাগাও। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তোমার নিকট জ্ঞান থাকতে হবে। যখন যা মুখস্থ করার ইচ্ছা করবে সে দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। আমি মনে করি, মানুষ যা কিছু মুখস্থ করবে তা সকাল সকাল পাঠ করবে, জ্ঞানার্জনে এটা করাই উত্তম। কেননা, দিনের প্রথমভাগে যা কিছু মুখস্থ করা হয় তা অনেক কাজে আসে। এটা আমি নিজেও করি। এটা ভালভাবে মুখস্থ করণের উপযোগী সময়।

মুখস্থ করে ভুলে যাওয়ার কারণে শাস্তি ধার্য হওয়া:

ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কোন আয়াত মুখস্থ করার পর তা ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। এ কথা দ্বারা ঐসব লোক উদ্দেশ্যে যারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এমনকি তা বর্জন করে। অপরদিকে স্বভাবগত অথবা অন্যান্য কারণে যারা কুরআন ভুলে যায় কুরআন মুখস্থ করণে মনোনিবেশ করা তাদের উপর ওয়াজিব। এ ধরনের ভুলে যাওয়ায় তাদের গুনাহ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না *(সূরা আল-বাক্বারা ২:২৮৬)।*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত, ছাহাবীদের নিয়ে ছ্বলাত আদায়কালে তিনি আয়াত ভুলে গেলেন, ছ্বলাত শেষে এক ছাহাবী তা স্বরণ করিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বললেন,

"هلا كنت ذكرتني بها"

ঐ আয়াত কেন তুমি আমাকে স্বরণ করিয়ে দাওনি।

অবহেলা হেতু ও মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে যারা ভুলে যায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও পাপী। পক্ষান্তরে কোন সঙ্গত কারণে যারা ভুলে যায় তাতে মনোনিবেশ করা তাদের জন্য ওয়াজিব। এরূপ স্বভাবগত ভুলে যাওয়ায় কোন পাপ হবে না।

৩৬. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ফিকহুস সুন্নাহ কিতাব সম্পর্কে আপনার মত কি?

জবাবে শাইখ বলেন, নিঃসন্দেহে তা উত্তম কিতাব। কেননা, এতে দলীল সম্মত অনেক মাসআলা রয়েছে। তবে তা ত্রুটিমুক্ত নয়। যেমন ইবনে রজব (রহিমাহুল্লাহ) القواعد الفقهية কিতাবের ভূমিকায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা কেবল তার কিতাব সংরক্ষণ করেছেন অন্য কিতাব নয়। তবে লেখকের কিতাবে অনেক বেশি সঠিক বিষয় উল্লেখ থাকার কারণে তার সামান্য ভুল-ত্রুটি ক্ষমার যোগ্য। নিঃসন্দেহে কিতাবটি উপকারী। আমি মনে করি না যে, ছ্বহীহ ও দ্বঈফ পার্থক্য করণে শিক্ষার্থী ছাড়া অন্য কেউ এ কিতাবটি সংগ্রহ করবে। কেননা, এ কিতাবে অনেক দ্বঈফ মাসআলা আছে। যেমন: ছ্বলাতুত তাসবিহ আদায় মোবাহ হওয়ার ব্যাপারে কথা আছে। ছ্বলাতুত তাসবিহ সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ মিথ্যা। তিনি আরো বলেন, ইমামদের কেউ এটাকে বৈধ বলেননি। ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হাদীছটি মুনকার। এ কিতাবে উল্লেখিত বিপরীত বিষয় মিলিয়ে দেখা তাদের জন্য আবশ্যক যারা শিক্ষার্থী নয়। কেবল এ কিতাবের উপর তারা নির্ভর করবে না।

৩৭. শাইখের নিকট আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমানে পরীক্ষামূলক কিছু জ্ঞান বিদ্যা হিসাবে চালু আছে। এমনকি মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে علمي ও أدبي নামে বিদ্যা চালু আছে। এ ধরনের প্রকার কি সঠিক? প্রতিষ্ঠানে এধরনের জ্ঞান শিক্ষা করা ছাত্রদের ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। এটা কি ভবিষ্যতে তাদের উপর কোন প্রভাব ফেলবে?

জবাবে শাইখ বলেন, علمي ও أدبي নামকরণ পরিভাষাগত বিষয়। আর পরিভাষায় কোন সমস্যা নেই। কেননা, তারা মনে করে, বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান বস্তুগত, জীব, উদ্ভিদ এবং অনুরূপ বিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত। তবে আমাদের এটা বুঝা আবশ্যক যে, এসব ঐ বিদ্যা নয় যা অর্জনে উৎসাহ দেয়া এবং ছাত্রদের প্রশংসা করা যেতে পারে। মূলত যে জ্ঞান অর্জনকারীদের আল্লাহ তা'আলা প্রশংসা করেছেন সেটাই হলো বিদ্যা। প্রশংসামূলক এ জ্ঞান অর্জনকারীরাই

আল্লাহভীরু। আর সেটাই মূলত শারঈ জ্ঞান। আর এটা ব্যতিত অন্যান্য জ্ঞান উপকারী হয়ে থাকলে তা অর্জন করা যেতে পারে। তবে উপকার সাধনই এ জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে হতে হবে। পক্ষান্তরে এটা ক্ষতিকর হলে তা অর্জন থেকে বিরত থাকাই ভাল। আর যদি উপকার ও ক্ষতি কোনটিই না থাকে তাহলে এ জ্ঞানার্জনে সময় নষ্ট করা মানুষের জন্য উচিত হবে না।

৩৮. শাইখের কাছে আমার প্রশ্ন হলো, শারঈ জ্ঞান ব্যতিত অন্যান্য জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত থাকা অথবা কর্মে ব্যস্ত থাকা কিংবা অন্য কোন বিষয়ে মগ্ন থাকায় ইলম অর্জন করতে না পারা কারো জন্য কৈফিয়ত হিসাবে গণ্য হবে কি?

জবাবে তিনি বলেন, শারঈ জ্ঞানার্জন ফরযে কিফায়াহ। যথেষ্ঠ সংখ্যক মানুষ এ জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত থাকলে অবশিষ্টদের ক্ষেত্রে তা যথাযথ। আর যে জ্ঞান ফরযে আইন তা অর্জন করা মানুষের জন্য আবশ্যক। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে চাইলে ইবাদতের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা আবশ্যক। ইবাদত পালনের সাথে পরিবারের প্রয়োজন পূরণ অথবা আবশ্যকীয় বিভিন্ন ব্যয়ভার বহনে কর্মে ব্যস্ত থাকায় আপত্তি নেই বলে মনে করি। তবে সাধ্যানুযায়ী শারঈ জ্ঞানার্জন করা উচিত।

৩৯. শাইখের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} এ আয়াতে العلماء দ্বারা উদ্দেশ্যে কি?

জবাবে শাইখ বলেন, আল্লাহভীতি অর্জনে যাদের জ্ঞান আছে এখানে আলিম দ্বারা তারাই উদ্দেশ্যে। কেবল বস্তুগত জ্ঞান যেমন: জ্যোতির্বিদ্যা এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয় অথবা বিস্ময়কর বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান যারা অর্জন করেছে তারা উদ্দেশ্যে নয়। অবশ্য বাস্তবে বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান আমরা অস্বীকার করি না। শেষ যুগে কুরআনে বিজ্ঞানের অনেক তথ্য প্রকাশ পেয়েছে আমরা তা অস্বীকার করি না। কিছু মানুষ বিস্ময়কর বিজ্ঞান সম্পর্কে বাড়াবাড়ি মূলক কথা বলে। এমনকি আমরা দেখেছি, মানুষ কুরআনকে গণিতের কিতাব হিসাবে নির্ধারণ করে যা ভুল। আমরা বলবো, বিস্ময়কর বিজ্ঞান সাব্যস্ত করণে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। কেননা, চিন্তাধারার আলোকে বিজ্ঞান সাব্যস্ত হয় এবং চিন্তাধারায় ভিন্নতা থাকতে পারে। এসব চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে কুরআনকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হলে স্পষ্ট বর্ণনার পর ঐ চিন্তা-গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি ভুল প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ কুরআনের অর্থ ভুল মনে হবে (নাউযুবিল্লাহ)। ফলে তা মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হবে। হে ভাই সকল! তোমরা কুরআনের ঐ বর্ণনায় মনোযোগ দাও যা ইবাদত ও আচার-ব্যবহারে মানুষের উপকারে আসবে। এজন্য কুরআনে সূক্ষ্ম ও

গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। যেমন: পানাহার, উঠাবসা ও প্রবেশ করা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বস্তুগত জ্ঞান কি সব কিছুর নিয়ম-কানুনে কাজে আসবে? এ জন্য আমি মনে করি, বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োজিত থাকার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করা দরকার। আর ইবাদত বাস্তবায়ন করাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণেই কুরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦] .

আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার 'ইবাদত করবে *(সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬)।*

বস্তুবাদী জ্ঞানীরা যে বিষয়ে উপনিত হয় সে ব্যাপারে আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে। যদি তারা হিদায়াতের জ্ঞান পেয়ে থাকে, আল্লাহকে ভয় করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তারা আল্লাহভীরু মুসলিম আলিম হিসাবেই গণ্য হবে। আর যদি কুফরীর উপরই অবিচল থাকে এবং বলে যে, এ পৃথিবী সৃষ্ট। প্রথমে ঈমানের কথা থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে এ কথা তাদের কোন কাজে আসবে না। কারণ প্রত্যেকেই জানে যে, পৃথিবী সৃষ্ট। এখানে তিনটি কথা আছে পৃথিবী নিজেই সৃষ্ট অথবা হঠাৎ করে তার অস্তিত্ব হয়েছে অথবা স্রষ্টা তা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই হলেন আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং এমনিতেই পৃথিবী সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। কেননা, কোন জিনিস নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ পূর্বে কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। তাহলে কিভাবে কোন বস্তু নিজে নিজে সৃষ্টি হবে? আর হঠাৎ করে পৃথিবী সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। কারণ প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য একজন স্রষ্টা আবশ্যক।

৪০.শাইখের নিকট প্রশ্ন হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গণিতশাস্ত্র শিক্ষা দেয়া কি বৈধ? এতে কি কোন প্রতিদান আছে নাকি নেই?

জবাবে শাইখ বলেন, মুসলিমদের পারিপার্শ্বিক জীবনে গণিতশাস্ত্র উপকারে আসলে এবং কেউ এর মাধ্যমে মানুষের উপকারের নিয়্যাত করলে তার নিয়্যাত অনুযায়ী তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। কিন্তু এটা শারঈ জ্ঞানের মত নয়। এটা মুবাহ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত মাধ্যম হতে পারে। কেননা, শরীয়তে মুবাহ বিষয়ের নিয়ম ব্যাপকতর। কোন বৈধ বস্তু বা বিষয় কখনো হারাম, কখনো মাকরূহ আবার কখনো মুসতাহাব এবং ওয়াজিব বলে গণ্য হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলবো, ব্যবসার মৌলিকত্ব হচ্ছে তা হালাল। কিন্তু তা কখনো মাকরূহ হয়ে থাকে। কেউ তার জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য তোমার কাছ থেকে

খাদ্যপানীয় ক্রয় করতে চাইলে এ ক্ষেত্রে বিক্রয়ের হুকুম কি? এক্ষেত্রে তা ওয়াজিব। আর কেউ মদ তৈরীর জন্য তোমার কাছ থেকে আঙ্গুর ক্রয় করতে চাইলে এ ক্ষেত্রে তা বিক্রয় হারাম। আবার কেউ উযূর জন্য পানি ক্রয় করতে চাইলে তা বিক্রি করা ওয়াজিব। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে আমি বলবো, যখন কোন বৈধ বিষয় শরী‘আত সম্মত কোন কাজের মাধ্যম হয় তখন তা শরী‘আত সম্মত বলেই গণ্য হয়। আর হারাম কাজের মাধ্যম হলে তা হারাম বলেই গণ্য হয়।

৪১. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, কতিপয় ছাত্র চিকিৎসক হতে চায় এবং অন্যান্য জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছুক। কিন্তু এখানে অন্যান্য বিষয় যুক্ত হওয়ার প্রতিবন্ধকতা আছে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যে বহিঃদেশে ভ্রমণের বৈধতা আছে কি? ঐ সব ছাত্রদের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?

জবাবে শাইখ বলেন, চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য ঐ সব যুবকদের আমার পরামর্শ রইলো। কেননা, আমাদের দেশে চিকিৎসকের প্রবল চাহিদা আছে।

কতিপয় শর্তসাপেক্ষে কাফিরদের রাষ্ট্রে ভ্রমণ করা বৈধ মনে করি, আর তা হলো

প্রথম: মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করবে তার মাধ্যমে সন্দেহ নিরসন করতে হবে। কেননা, কাফিররা চায় মুসলিমদের সন্তানদের মাঝে সন্দেহ প্রবেশ করুক। এভাবে তাদের দীন থেকে কাফিররা তাদেরকে বিচ্যুত করে।

দ্বিতীয়: দীনের জ্ঞান ও আমলের মাধ্যমে কু-প্রবৃত্তিকে দমন করতে হবে, দুর্বল কোন দীনের প্রতি ধাবিত হওয়া যাবে না। নচেৎ কু-প্রবৃত্তি জয় লাভ করবে আর এটা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে।

তৃতীয়: যে বিষয়ে পড়তে ইচ্ছুক ঐ নির্দিষ্ট বিষয় ইসলামী রাষ্ট্রে না থাকলে কাফির রাষ্ট্রে ভ্রমণের প্রয়োজন হতে পারে।

এ তিনটি শর্ত বাস্তবায়ন হলেই ভ্রমণ করা যেতে পারে। এর কোন একটি ভঙ্গ হলে ভ্রমণ করবে না। কেননা, অন্য সব কিছুর চেয়ে দীনের সংরক্ষণই গুরুত্বপূর্ণ।

৪২. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, আরবী ভাষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তা শিক্ষা করা হতে অনেক শিক্ষার্থী মুখ ফিরিয়ে নেয়। এরূপ হওয়ার কারণ কি?

জবাবে শাইখ বলেন, হ্যাঁ, আরবী ভাষা বুঝা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হোক তা قواعدالإعراب তথা শব্দের শেষে ই'রাব (কারক চিহ্ন) প্রদানের নিয়ম-পদ্ধতি অথবা قواعد البلاغة (অলংকার শাস্ত্রীয় নিয়ম)। সবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আল-হামদুলিল্লাহ আমরা মূলত আরব জাতি। তাই قواعد اللغة العربية ব্যতিত অন্য কিছু শিক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু মানুষের উচিত হবে আরবী ভাষার নিয়ম-পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা করা। তাই আরবী ভাষার সব নিয়ম-কানুন শিক্ষা করার প্রতি আমি শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবো।

৪৩. শাইখের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কোনটি উত্তম কাজ: আল্লাহর দিকে দাওয়াতের জন্য বের হওয়া নাকি ইলম অর্জন করা?

শাইখের জবাব হচ্ছে, ইলম অর্জনের জন্য বের হওয়াই উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর ইলম অর্জন অবস্থায় দাওয়াত দেয়া শিক্ষার্থীর জন্য সম্ভব। আর ইলম ছাড়া আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়াও সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} [يوسف: ١٠٨]

বল, এটা আমার পথ, আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও *(সূরা ইউসূফ ১২:১০৮)।*

সুতরাং বলি, কিভাবে ইলম ছাড়া দাওয়াত দেয়া সম্ভব? তাই ইলম ব্যতিত কেউ কখনোই দাওয়াত দিতে পারে না। আর যারা ইলম ছাড়া দাওয়াত দেয় তারা সফলতা লাভ করতে পারে না।

৪৪. শাইখের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, ইলমের আপদ হচ্ছে ভুলে যাওয়া; এমন কোন বিষয় বা পদ্ধতি আছে কি যা অনুসরণে ইলম সংরক্ষিত হয়?

জবাবে শাইখ বলেন, জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ পথ খুঁজে পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} [محمد: ١٧] .

যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদের হেদায়াত প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান করেন *(সূরা মুহাম্মদ ৪৭:১৭)।*

ইলম অর্জনের চিন্তা-ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। বারবার মুখস্থ ও পর্যালোচনা করতে থাকবে। যে কোন আমলের ক্ষেত্রে হুকুম ও দলীল বের করে তা সম্পন্ন করবে। কেবল অবসরে ইলম অর্জন করবে না। এ কারণে আলিমগণ বলেন, তোমাকে অল্প জ্ঞান দান করা হলে তুমি এর সবটুকুই দান করো। আর তোমাকে কিছুই দেয়া না হলে তুমি অল্প দান করো। সুতরাং রাত-দিন সব সময় তুমি ইলম অর্জনে নিয়োজিত থাকো। তুমি যা জানো তা পর্যালোচনা করে আমল করো এবং সমতা বজায় রাখো। এভাবেই ইলম স্থায়ী হয়।

৪৫. শাইখের নিকট আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যে সব শিক্ষার্থী ইলম অর্জনে অবহেলা করে এবং ইলম অর্জনে চেষ্টা-সাধনায় রত না থাকায় তাদের উপর এর কু-প্রভাব রয়েছে কি? এ ব্যাপারে আপনার দিক-নির্দেশনা কি?

জবাবে শাইখ বলেন, ছাত্রদের উচিত হবে ইলম অর্জনে সর্বাধিক চেষ্টা বজায় রাখা। যাতে তারা দৃঢ়তার সাথে ইলম অর্জনে সক্ষম হয়। জ্ঞানার্জনের গভীরে পৌঁছতে পারে। তা এভাবে সম্ভব যে, তারা অল্প অল্প করে জ্ঞানার্জনে চেষ্টা করবে। ফলে জ্ঞানার্জন তাদের জন্য সহজ হবে এবং গভীরতর জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবে আর ইলম অর্জনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে। হে শিক্ষার্থীরা! তোমরা ইলম অর্জনে অবহেলা করলে এবং অমনোযোগী হলে সময় তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না। চর্চা না করায় পঠনে জটিলতা সৃষ্টি হবে। এরূপ হলে ইলম অর্জনের চিন্তা-ভাবনায় তোমরা হবে অক্ষম। ফলে অনুশোচনা তোমাদের কোন কাজেই আসবে না।

৪৬. শাইখের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যারা শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত তাদের জন্য আপনার দিক-নির্দেশনা কি যার দ্বারা তারা উপকৃত হতে পারে ?

জবাবে শাইখ বলেন, আমরা বলবো, শিক্ষা দানের সাথে সম্পৃক্ত থাকা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষকরা ছাত্রদের এমন জ্ঞান দান করেন যা তাদের অন্তরে স্থায়ী হয়। ছাত্রদের সামনে আসার পূর্বে এবং তাদের প্রশ্ন ও পর্যালোচনা ছাড়া কোন শিক্ষকই কর্তব্যবোধ বুঝে উঠবে না। জ্ঞান ও তত্ত্বধানের দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষকই ছাত্রদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জ্ঞানের দিক শক্তিশালী হলে একজন শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তার দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে শক্তিশালী বলা সঙ্গত নয়। কেননা, শিক্ষকের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলে ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর দানে জটিলতার সৃষ্টি হবে। যদি উত্তর ভুল হয় তাহলে ছাত্ররা পরবর্তীতে তার উপর নির্ভর করবে না। শিক্ষক যদি ছাত্রদের প্রশ্ন উপেক্ষা করেন তাহলে কখনোই তারা ঐ শিক্ষকের সাথে সিদ্ধান্তে একমত হবে না।

এজন্য শিক্ষকের উচিত প্রস্তুত থাকা, উদ্বেগ গ্রহণ করা, দায়িত্ব বুঝে নেয়া এবং ধৈর্যশীল হওয়া। শিক্ষক ছাত্রের প্রশ্নের মুখোমুখী হলে তিনি যদি গভীর জ্ঞানী হন তাহলে সহজেই উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। নচেৎ হিতে বিপরীত হবে।

৪৭.শাইখের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, কোন শিক্ষার্থী আল্লাহর রাস্তায় ইলম অর্জনের জন্য তার সঙ্গীদের সাথে বের হতে চায়। কিন্তু বের হওয়ার মাঝে তার প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তার পরিবার, পিতা-মাতা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ইলম অর্জনের জন্য বের হওয়ার হুকুম কি?

জবাবে শাইখ বলেন, যদি তাদের নিকট অবস্থান করাই ঐ শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক হয় তাহলে থেকে যাওয়াই উত্তম। অবশ্য তাদের সাথে অবস্থান করেও ইলম অর্জন সম্ভব। কেননা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চেয়ে পিতা-মাতার খেদমত অগ্রগণ্য। আর জ্ঞানার্জন জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। পিতা-মাতা সন্তানের অভিমুখী হলে তাদের খেদমতই হবে অগ্রগণ্য। আর এমনটা না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলম অর্জনের জন্য সন্তানের বের হওয়াতে অসুবিধা নেই। পিতা-মাতার দিকে খেয়াল রাখা ও সাথে থাকা হচ্ছে তাদের হক্ব। এটা যেন সন্তান ভুলে না যায়। আর শারঈ জ্ঞানার্জনে পিতা-মাতার অনিহা থাকলে সেক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য নেই। এ জ্ঞানার্জনের জন্য বের হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। কেননা, শারঈ জ্ঞানার্জনে তাদের অনিহা আছে।

৪৮. শাইখের নিকট প্রশ্ন হলো, আলিম ছাড়াই শুধু কিতাব পড়ে ইলম অর্জন বৈধ কি? বিশেষত যখন আলিমদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইলম অর্জন কঠিন হয়ে যায়। আর যখন কেউ বলে যে, কিতাবই যার শাইখ হয় সে সঠিকতায় পৌঁছতে বেশি ভুল করে। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?

জবাবে শাইখ বলেন, নিঃসন্দেহে আলিমদের শরণাপন্ন হয়ে এবং কিতাবাদী পাঠ করে উভয় পন্থায় ইলম অর্জন করবে। কেননা, আলিমের কিতাবই যেন স্বয়ং আলিম। আলিম তার কিতাব হতেই তোমাকে পাঠদান করবে। যদি সরাসরি আলিমের নিকট ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধকতা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিতাব হতেই ইলম অর্জন করবে। তবে কিতাব পাঠ করে ইলম অর্জনের চেয়ে সরাসরি আলিমের কাছ থেকে ইলম অর্জনের পন্থাই উত্তম। কেননা, কিতাব পাঠ করত যারা ইলম অর্জন করে তাদেরকে বেশি পরিশ্রম করতে হয় এবং অত্যাধিক চেষ্টা-সাধনায় নিয়োজিত থাকতে হয়। এ সত্ত্বেও কিছু বিষয় তাদের নিকট অস্পষ্ট থেকে যায়। যেমন আলিমগণ ও রক্ষণশীল পন্ডিতেরা শরী‘আতের নিয়ম-পদ্ধতি সুবিন্যস্ত করেন। তাই সম্ভবপর আলিমগণের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই

শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক। অপরদিকে যারা প্রমাণ স্বরূপ বলে যে, কিতাব পাঠ করে ইলম অর্জন করলে বেশি ভুল হয়, তাদের একথা সঠিক নয়। আবার অগ্রহণযোগ্যও নয়। কেননা, যারা কেবল কিতাব হতে ইলম অর্জন করে তারা সন্দেহ মূলক বেশি ভুল দেখতে পায়। তবে যারা বিশস্ততা, আমানাত ও ইলমের দিক হতে প্রসিদ্ধ বলে গণ্য তাদের কিতাব পাঠ করত ইলম অর্জন করলে ভুল বেশি হওয়ার সম্ভবনা নেই। বরং তারা যা বলেছেন তার অধিকাংশই সঠিক বলে বিবেচিত।

৪৯. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞানগত নতুন চিন্তাধারার আলোকে কুরআনের তাফসীর করা বৈধ হবে কি?

জবাবে শাইখ বলেন, জ্ঞানগত চিন্তাধারার আলোকে তাফসীর করা মারাত্মক অন্যায়। এ চিন্তাধারায় তাফসীর করলে এর বিপরীত মতবাদ সৃষ্টি হবে। সুতরাং এ অবস্থায় ইসলামের শত্রুদের চোখে কুরআন অশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। অপরদিকে মুসলিমদের দৃষ্টিতে এ তাফসীরের ব্যাপারে তাদের কথা হলো, কল্পনা প্রসূত যারা কুরআনের তাফসীর করেন তাদের তাফসীর ভুল বলে গণ্য। ইসলামের শত্রুরা এর মাধ্যমে গোলযোগ সৃষ্টির ইচ্ছা করে। এজন্য এধরনের জ্ঞানগত তাফসীরের ব্যাপারে চুড়ান্ত পর্যায়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। যাতে অপব্যাখ্যারোধ করতে পারি। তাফসীরের আলোকে বাস্তবে কোন বিষয় সাব্যস্ত হলেও এটা বলার প্রয়োজন নেই যে, কুরআনের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত হয়েছে। মূলত আল্লাহর ইবাদত, চরিত্রগঠন ও চিন্তা-গবেষণার জন্যই কুরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: ٢٩]

আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে *(সূরা ছ্বাদ ৩৮:২৯)*।

অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে তাফসীর করা হলে তা তাফসীর হিসাবে গণ্য হবে না। এটা হবে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যের বিপরীতে গুরুতর মারাত্মক ভুল। এ ব্যাপারে কুরআনে দৃষ্টান্ত রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ} [الرحمن: ٣٣]

হে জিন ও মানবজাতি, যদি তোমরা আসমানসমূহ ও যমীনের সীমানা থেকে বের হতে পারো, তাহলে বের হও। কিন্তু তোমরা তো (আল্লাহর দেয়া) শক্তি ছাড়া বের হতে পারবে না *(সূরা আর-রহমান ৫৫:৩৩)*।

মানুষ যখন চাঁদের মাটিতে পা রাখলো তখন কতিপয় মুফাস্‌সির এ আয়াতের তাফসীর করে যে, যা কিছু ঘটে সে ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তারা বলে, এখানে السلطان শব্দ দ্বারা ইলম-জ্ঞান উদ্দেশ্যে। আর মানুষ তাদের জ্ঞান ব্যবহার করে পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করেছে। এটা ভুল ব্যাখ্যা। এভাবে কুরআনের তাফসীর করা বৈধ নয়। এভাবে তাফসীর করা হলে প্রেক্ষাপট তৈরি হবে যে, আল্লাহ তা‘আলা এটাই ইচ্ছা করেছেন। এ অবস্থায় বিপরীত তাফসীর বৃহত্তর স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য হলে এ ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। মূলত আয়াতটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যাবে তা বাতিল-পরিত্যাজ্য তাফসীর। কেননা, আয়াতটি মানুষের অবস্থাদী ও তাদের কর্মের শেষ পরণতি সম্পর্কে নাযিল হয়। যেমন সূরা আর-রহমানের নিম্নের আয়াতের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن: ٢٦ – ٢٨] .

যমীনের উপর যা কিছু রয়েছে, সবই ধ্বংশশীল। আর থেকে যাবে শুধু মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? *(সূরা আর-রহমান ৫৫:২৬,২৭,২৮)*।

আমরা ঐ সকল মানুষের কাছে জানতে চাই তারা কি আকাশ রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে যেতে পারবে? এর জবাব হচ্ছে, পারবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الرحمن: ٣٣] .

যদি তোমরা আসমানসমূহ ও যমীনের সীমানা থেকে বের হতে পারো, তাহলে বের হও *(সূরা আর-রহমান ৫৫:৩৩)*।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের প্রতি অগ্নিশিখা ও কালো ধোঁয়া (বাধা স্বরূপ) প্রেরণ করা হয়েছে কি?

জবাব হচ্ছে, প্রেরণ করা হয়নি। কেননা, ঐসব মুফাস্‌সির যে তাফসীর করে তা সঠিক নয়। আমরা বলবো, তারা যে বিষয়ে উপনিত হয়েছে তা কেবল তাদের

অভিজ্ঞতার আলোকেই সম্ভব হয়েছে যা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ভাব উদ্ঘাটনের জন্য আমরা যে বিকৃত অর্থ গ্রহণ করছি তা সঠিক নয়, বৈধ নয়।

৫০. শাইখের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের কথার উপর নির্ভর করা ছাত্রদের জন্য ভুল যা ক্ষতিকর। কোন মতামত গ্রহণ অথবা নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ ব্যতীতই কি তারা পাঠ বুঝবে? বিধি-বিধান সম্পর্কিত সমস্যা সৃষ্টি হবে কিনা?

জবাবে শাইখ বলেন, মানুষ যদি নির্দিষ্ট মাযহাবকে এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে যে, তার নিজের অথবা অন্য কোন মাযহাবে সঠিক বিষয় থাকলে সে তার মুখাপেক্ষী নয়। অবস্থা এমন হলে মাযহাবের অনুসরণ করা বৈধ হবে না। আমি এটা সমর্থন করি না। তবে উপকৃত হওয়ার প্রত্যাশায় মানুষ কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করতে চাইলে ঐ মাযহাবের নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি কুরআন-সুন্নাহর সাথে মিলাতে হবে। এক্ষেত্রে যদি অন্য মাযহাবের অগ্রাধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তাহলে ঐ মাযহাবের সঠিক বিষয় গ্রহণ করবে। এতে অসুবিধা নেই। মুহাক্কিক আলিম যেমন: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এবং অন্যান্যরা এ নীতিই অবলম্বন করেছেন। তাদেরও নির্দিষ্ট মাযহাব ছিল। কিন্তু সঠিক দলীল স্পষ্ট হলে তারা ঐ দলীল-প্রমাণের বিরোধীতায় লিপ্ত হননি, বরং তা গ্রহণ করেছেন।

৫১. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, "**كل أمر ذي بال لم يبدأ بيسم الله**" অর্থাৎ যে কাজে বিসমিল্লাহ বলা হয়নি তা অসম্পূর্ণ।[৫৯] এটা কি ছ্বহীহ হাদীছ? আলিমগণের কিতাবে এটা বেশি বেশি উল্লেখ হতে দেখা যায়। কারণ কি?

জবাবে শাইখ বলেন, এ হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আলিমগণের মতামত আছে। কতিপয় বিদ্বান এটাকে ছ্বহীহ ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যেমন: ইমাম নববী। আর কতিপয় আলিম বলেছেন, এটা দ্বঈফ। তবে হাদীছটি গ্রহণের ব্যাপারে আলিমগণ একমত। এজন্য তাদের কিতাবে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। আর প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিসমিল্লাহ পাঠ করা অথবা শুরুতে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা উচিত।

৫২.শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে ইশার পর মানুষকে প্রশিক্ষণে লিপ্ত রাখা , দিক-নির্দেশনা দান করা এবং উপদেশ দেয়ায় কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের

---

[৫৯] ইবনু মাজাহ হা/১৮৯৪।

ছ্বলাত আদায় সম্ভব হয় না অথবা তাদেরকে থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাহাজ্জুদ আদায় পূর্ণ হয়, এ দু’টির মধ্যে কোনটি উত্তম?

জবাবে শাইখ বলেন, রাতের নফল ইবাদত বন্দেগীর চেয়ে ইলম অর্জনে লিপ্ত থাকা উত্তম। ইলম অর্জন সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"لا يَعدلُهُ شيء لمن صحت نيته"

ইলম অর্জনের জন্য যে সঠিক নিয়্যাত করেছে কোন কিছুই তার সমপরিমাণ হবে না।

তার শিষ্যরা জিজ্ঞেস করলো, কিভাবে তা হয়? তিনি বলেন, শিক্ষার্থী নিজের এবং অন্যের অজ্ঞতা দূর করার জন্য নিয়্যাত করে। নিজে শিখা অথবা অন্যকে শিক্ষা দেয়ার কাজে মানুষ রাতের প্রথমাংশে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম অর্জনে লিপ্ত থাকে তাহলে ইলম অর্জনের এ রাতই তাদের জন্য উত্তম। রাত জেগে ইবাদত করা ও ইলম অর্জনে প্রতিযোগিতা হলে এক্ষেত্রে শারঈ জ্ঞান অর্জন করাই উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। এজন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ হুরাইরাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) কে তার ঘুমানোর আগে বিতর ছ্বলাত আদায়ের নির্দেশ দেন। আলিমগণ বলেন, এর কারণ হলো, আবূ হুরাইরাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাতের প্রথমাংশে হাদীছ মুখস্থ করতেন এবং শেষাংশে ঘুমাতেন। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঘুমানোর আগে বিতর ছ্বলাত আদায়ের নির্দেশ দেন।[৬০]

৫৩. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, যে সকল শিক্ষক বিশেষত দীনি ক্ষেত্রে ভুল করেন, তাদের ব্যাপারে আমার করণীয় কি? সঠিক জবাব পেতে আমি কি তার উপর নির্ভর করতে পারি?

জবাবে শাইখ বলেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিছু শিক্ষক রয়েছেন যাদের দ্বারা ভুল সংঘটিত হলে তারা ঐ ভুলকে কারো জন্য ভুল হিসাবে গণ্য করতে চান না। এটা ঠিক নয়। মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। ভুল হওয়ার পর সতর্ক হলে তা আল্লাহর নিআ’মত হিসাবেই গণ্য। যাতে কেউ ঐ ভুলের কারণে প্রতারিত না হয়। ছাত্রদের বিচক্ষণতা বজায় রাখা উচিত। সকল শিক্ষার্থীর সামনে যেন কোন শিক্ষার্থী ঐ ভুলকারী শিক্ষককে প্রত্যাখ্যান না করে। তাহলে এটা হবে শিষ্টাচার বিরোধী কাজ। পাঠদান শেষে ঘটে যাওয়া ভুল সম্পর্কে শিক্ষককে অবগত করা

---

[৬০] ছ্বহীহ বুখারী হা/১১৭৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭২১।

যেতে পারে। শিক্ষক ভুল বুঝতে পারলে পাঠদানের সময় সরাসরি তিনি ছাত্রদের সামনে তা ব্যক্ত করবেন। আর যদি তিনি ভুল না বুঝেন তাহলে পাঠদানের সময় ছাত্ররা তা স্বরণ করিয়ে দিবে। তা এভাবে যে, ছাত্র বলবে, হে শিক্ষক! আপনি এটা এটা বলেছেন অথচ এটা ঠিক নয়।

৫৪. শাইখের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, ক্লাশে অথবা বাইরে অমুসলিম শিক্ষককে সালাম দেয়া বৈধ হবে কি?

জবাবে শাইখ বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন,

"لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام"

তোমরা ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের আগে বাড়িয়ে সালাম করো না।[৬১]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশ দিয়ে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা অতিক্রম করার সময় বলতো السام عليكم

السام অর্থ হলো তোমার মৃত্যু হোক। তাদের প্রতিউত্তরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে وعليكم বলতে শিক্ষা দিলেন। অর্থাৎ তোমাদের উপরও।[৬২] সুতরাং তোমরা আগ বাড়িয়ে সালাম দিও না। যখন অমুসলিম আগ বাড়িয়ে সালাম দিবে তখন وعليكم বলে তোমরা উত্তর দিবে। ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) في أحكام أهل الذمة আহলুয যিম্মার বিধি-বিধান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে, আমরা যদি বুঝতে পারি যে, কাফিররা السلام عليكم বলেছে, তাহলে আমরা وعليكم السلام বলে জবাব দিবো।

৫৫. শাইখের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলিমদের উপকার সাধনে আমার সামনে অনেক জ্ঞানগত অনুষদ আছে, আমি ঐ সব অনুষদের কোনটিতে ভর্তি হবো নাকি শারঈ কোন অনুষদে ভর্তি হবো?

জবাবে শাইখ বলেন, আমি মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনি অনুষদে ভর্তি হওয়াই উত্তম। তবে অন্যান্য অনুষদে অল্প সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হতে পারে। বিশেষত

---

[৬১] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১৬৭।
[৬২] ছ্বহীহ বুখারী হা/ ৬০৬৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১৬৪।

যাদের দীনি বিষয় অধ্যয়নের উৎসাহ রয়েছে তাদের জন্য শারঈ অনুষদে ভর্তি হওয়াই উত্তম।

৫৬. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ফাতওয়া হতে আলিমদের ক্ষ্যান্ত হওয়ার কারণ কি?

জবাবে শাইখ বলেন, ফাতওয়া দানে সক্ষম এমন আলিম ফাতওয়া থেকে বিরত থাকে অথচ তার ফাতওয়া প্রদানের উপর জ্ঞান রয়েছে। ঐ আলিমের নিকট দলীলের বৈপরীত্যে পরিলক্ষিত হওয়ার কারণে তিনি বিরত থাকতে পারেন। কখনো ঐ আলিমের এ ধারণা হতে পারে যে, কোন মুফতির ফাতওয়ায় প্রতারণা রয়েছে। কেননা, এমন কতিপয় মুফতি আছে যারা হক্বের উদ্দেশ্যে ফাতওয়া প্রদান করে না। এসব মুফতি ফাতওয়া নিয়ে ছলনা করতে চায়। তাই এ বিষয়টি দু'একজন করে সব ফাতওয়া দানকারী হক্বপন্থী আলিমের দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে তারা ফাতওয়া থেকে বিরত থাকে অথবা প্রশ্নকারীর জবাব দান থেকে মুখফিরিয়ে নেয় অথবা তার এটা প্রবল ধারণা রয়েছে যে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের জন্য মুফতি ফাতওয়া নিয়ে ছলনা করতে পারে। অথবা সে কতিপয় মানুষের কথাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করতে চায়। এটাই সবচেয়ে মারাত্মক। ঐ প্রতারক মুফতি এ ছলনাময় পন্থা অবলম্বন করে বলে, অমুক অমুক আলিম এটা এটা বলেছেন। একারণে হয়তো হক্বপন্থী আলিম ফাতওয়া থেকে বিরত থাকেন।

৫৭. শাইখের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, কিছু মানুষ ইলম ছাড়াই ফাতওয়া প্রদান করে তাদের ব্যাপারে হুকুম কি?

জবাবে শাইখ বলেন, এ ধরনের কাজ মারাত্মক ক্ষতিকর ও মহা অন্যায়। ইলম ছাড়া কথা বলার কারণে আল্লাহর সাথে শিরক স্থাপন করা হয় এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: ٣٣]

বল, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না (সূরা আল-আরাফ ৭:৩৩)।

আয়াতের ভাষ্যে আল্লাহ তা'আলার সত্তা, তার গুণাবলী, তার কর্মসমূহ ও শারঈ বিষয়াদী অন্তর্ভুক্ত। শারঈ কোন বিষয় নিশ্চিত না জানা পর্যন্ত ঐ ব্যাপারে ফাতওয়া প্রদান করা কারো জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহর নছে (মূলপাঠে) যা বুঝানো হয়েছে তা দক্ষতা ও মেধা দ্বারা সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব হলে ফাতওয়া দেয়া যেতে পারে। আর মুফতি হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণাকারী ও রসূল ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে প্রচারকারী মাত্র। মুফতি যদি এমন কোন কথা বলেন যা তিনি জানেন না অথবা দলীল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, ইজতেহাদ ও গবেষণার পর যে ব্যাপারে তার প্রবল ধারণা নেই ঐ বিষয়ে কথা বললে তা আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরোধী হবে এবং তা জ্ঞানহীন কথা হিসাবেই গণ্য হবে। এভাবে বলার কারণে শাস্তি ধার্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ} [العنكبوت: ٦٨] .

আর সে ব্যক্তির চেয়ে যালিম আর কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার নিকট সত্য আসার পর তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? জাহান্নামের মধ্যেই কি কাফিরদের আবাস নয়? *(সূরা আল আনকাবুত ২৯:৬৮)*

৫৮. শাইখের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআন হিফয করার কোন দু'আ আছে কি? আর কুরআন হিফয করার পদ্ধতি কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, একটি হাদীছ ছাড়া কুরআন হিফয করার কোন দু'আ আমার জানা নেই। নাবী ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি আলী ইবনে আবি তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দু'আ শিখিয়ে দেন।[৬৩] হাদীছটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কথা রয়েছে। ইবনে কাছির (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছটি স্পষ্ট গরিব এবং মুনকারও বটে। ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছটি منكر شاذ (মুনকার শায)। তবে হিফয করার পদ্ধতি হচ্ছে মানুষ হিফয অব্যাহত রাখবে। এক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতি আছে।

প্রথমত: যথাসম্ভব একটি অথবা দু'তিনটি করে আয়াত মুখস্থ করবে।

দ্বিতীয়ত: একটি করে পৃষ্ঠা মুখস্থ করা যেতে পারে।

---

[৬৩] হাদীছটি জাল: তিরমিযী হা/৩৫৭০।

মানুষ বিভিন্নভাবে কুরআন মুখস্থ করে। কতিপয় মানুষ একটি করে পৃষ্ঠা মুখস্থ করা উত্তম মনে করে যতক্ষণ মুখস্থ না হয় তা পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। আবার কেউ একটি করে আয়াত মুখস্থ করে তা বারবার পড়তে থাকে অতঃপর তা মুখস্থ হলে অন্য আয়াত মুখস্থ করতে থাকে। এভাবেই মুখস্থ পূর্ণ হতে থাকে। প্রথম অথবা দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত হবে। ভালভাবে মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত অন্য আয়াত বা পৃষ্ঠা মুখস্থ করবে না। প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট অংশ মুখস্থ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া উচিত। ঐ নির্দিষ্ট অংশ মুখস্থ হলেই নতুন পাঠ মুখস্থ আরম্ভ করবে।

৫৯. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, আমি শারঈ জ্ঞানার্জন করতে ইচ্ছুক। আমি তা শুরু করতে চাই কিন্তু কিভাবে তা শুরু করবো এ ব্যাপারে আমাকে আপনি কি উপদেশ দিবেন?

জবাবে শাইখ বলেন, শিক্ষার্থীর জন্য উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে:

(১) আল্লাহর কিতাব বুঝার জন্য নির্ভরযোগ্য তাফসীর অধ্যয়ন শুরু করবে। যেমন: তাফসীর ইবনে কাছির ও তাফসীরে বাগাভি।

(২) অতঃপর নির্ভরযোগ্য ছ্বহীহ হাদীছ অধ্যয়ন করবে। যেমন: বুলুগুল মারাম, মুনতাক্বি এবং আবশ্যকীয় ছ্বহীহ হাদীছের মূল কিতাবসমূহ। যেমন: ছ্বহীহ বুখারী, ছ্বহীহ মুসলিম।

(৩) সঠিক আক্বীদার কিতাবসমূহও অধ্যয়ন করবে। যেমন: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) রচিত আক্বীদা আল-ওয়াসেত্বীয়া।

(৪) অতঃপর ফিক্বহের সংক্ষিপ্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করবে যাতে কুরআন-সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী মাযহাবের মাসআলাসমূহ বুঝা যায়।

এরপর গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যামূলক কিতাব অধ্যয়ন করবে যাতে ইলম বৃদ্ধি পায়।

৬০.শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, আমল পরিত্যাগ করে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া কারো জন্য বৈধ হবে কি যাতে সে তার পিতা-ভাই পরিবারের জন্য মর্যাদার কারণ হয়?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নিঃসন্দেহে আমলের চেয়ে ইলম অর্জন করা উত্তম। বরং এটা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে ইসলামী সমাজে বিদ'আত প্রকাশ পেয়েছে, তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে এবং দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যারা ইলম ছাড়া ফাতওয়া দেয় তাদের মাঝে রয়েছে অনেক অজ্ঞতা। আর অনেক মানুষ বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে। নিচের তিনটি বিষয়ে নবীন শিক্ষার্থীদেরকে উৎসুক হতে বাধ্য করা হচ্ছে।

প্রথমত: নিকৃষ্ট বিদ‘আত প্রকাশ পাওয়া।

দ্বিতীয়ত: ইলম ছাড়াই কতিপয় মানুষের ফাতওয়া প্রদান করা।

তৃতীয়ত: কখনো আলিমদের নিকট স্পষ্ট এমন বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে বেশি বেশি তর্কে লিপ্ত হওয়া। আর যে বিষয়ে তর্ক করা হয় ঐ ব্যাপারে ইলম ছাড়াই ফাতওয়া দেয়া।

এ প্রেক্ষিতে আমাদেরকে এমন আলিমের শরণাপন্ন হতে হবে যাদের রয়েছে পর্যবেক্ষণের যথার্থ গভীর জ্ঞান এবং আল্লাহর দীন সম্পর্কে সুক্ষ্ম বুঝ। আর রয়েছে আল্লাহর বান্দাদেরকে দিক-নির্দেশনা দানে হিকমত-প্রজ্ঞা। কেননা, বর্তমানে অনেকেই কোন মাসআলা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে চলেছে। অথচ মস্তিস্ক প্রসূত চিন্তাধারার জ্ঞান মানুষের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইলম ছাড়া এভাবে ফাতওয়া দেয়া মারাত্মক অনিষ্ট সাধনের মাধ্যম বলে গণ্য হয় যার অনিষ্টতার সীমারেখা আল্লাহ ব্যতিত কারো জানা নেই। শিক্ষার জন্য ছাহাবীগণ কখনো এমন বিষয় পালন করতে বাধ্য হতেন যা নছ দ্বারা আবশ্যকতা বুঝায় না। উমার ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিন তালাক্ব সম্পন্ন করা আবশ্যক করেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে, আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর শাসনামলে ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতকালে প্রথম দু’বছর পর্যন্ত তিন তালাক্ব এক তালাক্ব হিসাবে সাব্যস্ত হতো। কিন্তু একই বৈঠকে তিন তালাক্ব দেয়া হারাম। কেননা, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার সীমারেখা অতিক্রম করা হয়। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি লোকদের দেখেছি যে, তারা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে যাতে তাদের ধৈর্যের (ও সুযোগ গ্রহণের) অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করে দেই (তবে তা-ই কল্যাণকর হবে)। সুতরাং তিনি তাদের জন্য বাস্তবায়ন ও কার্যকর সাব্যস্ত করলেন।[৬৪]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে, আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর শাসনামলে ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতকালে প্রথম দু’বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিন

[৬৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৭২।

তালাক্বকে তিন তালাক্ব হিসাবেই তিনি সাব্যস্ত করেন; এক তালাক্ব নয়। তিনি মানুষের জন্য পৃথকভাবে তিন তালাক্ব আবশ্যক করে দেন। প্রথম দু'যুগে এক তালাক্বের পর মানুষ যদি তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইতো তাহলে বিশুদ্ধ পন্থায় ফিরিয়ে নিতে পারতো। কিন্তু তিনি মনে করলেন যে, তিন তালাক্ব সম্পন্ন করাই ভাল এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতেও তিনি মানুষকে নিষেধ করেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে কাপড়ের এক পার্শ্বে খেজুরের ডাল দ্বারা চল্লিশ বেত্রাঘাত করে অথবা জুতা পিটিয়ে মদপানকারীকে শাস্তি দেয়া হতো। আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর যুগেও এরূপ করা হতো। মদপান বৃদ্ধি পেলে তিনি ছাহাবীদেরকে সমবেত করে তাদের কাছে পরামর্শ চান। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সর্বনিম্ন শাস্তি হওয়া উচিত আশি বেত্রাঘাত। অতঃপর তিনি মদপানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন।[৬৫] আসলে এসবই হলো মানুষকে সংশোধন করার বিধান। সুতরাং কোন মুসলিম অথবা মুফতি অথবা আলিমের উচিত হবে মানুষের অবস্থাদী নিরীক্ষণ করা এবং তাদের জন্য কল্যাণকর বিষয় ভেবে দেখা।

৬১. শাইখের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা কি দলীল নিয়ে পর্যালোচনা করত ইলম অর্জন করবে নাকি ইমামদের কোন মাযহাবের অনুসরণ করবে? এ ব্যাপারে আপনার মত কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা ইলম অর্জনে যথাসম্ভব দলীল নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এখানে দলীল খুঁজে পাওয়াই উদ্দেশ্যে। ফলত দলীল অনুসন্ধানের উপর শিক্ষার্থীর অনুশীলন বজায় থাকবে এবং দলীল উপস্থাপনের পদ্ধতিও তারা জানবে। আর এভাবে তারা দেখে-শুনে দলীলসহ আল্লাহর দিকে অগ্রগামী হবে। বাধ্যগত অবস্থা ব্যতিরেকে কারো জন্য তাক্বলীদ করা বৈধ নয়। অবস্থা যদি এমন হয় যে, পর্যালোচনার পরও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হলো না। তাৎক্ষণিক নতুন কোন বিষয় জানার প্রয়োজনবোধ হলো কিন্তু চাহিদা শেষ হওয়ার আগে দলীলসহ হুকুম জানা সম্ভব হলো না; তাহলে এমতাবস্থায় তাক্বলীদ করা যেতে পারে, তবে দলীল স্পষ্ট হলে সে দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর মুফতিদের মাঝে মতভেদ হলে কখনো বলা হবে, এটা উত্তম, এটা সহজ। এসব উক্তি আল্লাহ তা'আলার বাণীর সাথে সামঞ্জস্যতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[৬৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭৭২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৬।

{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]

আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না *(সূরা আল-বাক্বারা ২:১৮৫)*।

আবার কখনো বলা হবে, এটা কঠিন হিসাবেই নেয়া হবে। কেননা, সন্দেহ ছাড়াই এতে সতর্কতা রয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".

যে সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকে সে মূলত তার দীন ও মান-ইজ্জতকেই রক্ষা করে।[৬৬]

সুতরাং প্রবল ধারণায় কোন বিষয় সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী হলে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে অধিক জানা ও সতর্ক থাকার কারণে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্যতা বজায় থাকবে।

৬২. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, কোন কোন কিতাব অধ্যয়নের পরামর্শ দিবেন? আমরা আপনার নিকট শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনা কামনা করছি।

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কিতাবসমূহের মধ্যে যা অধ্যয়ন করা উত্তম তা হচ্ছে নির্ভরযোগ্য তাফসীরের কিতাবসমূহ যেমন: **تفسير ابن كثير** তাফসীরে ইবনে কাসীর ও শাইখ আব্দুর রহমান সা‘দী (রহিমাহুল্লাহ) এর কিতাব। আর হাদীছের কিতাবের মধ্যে উত্তম হলো: ফাতহুল বারী শারহু ছ্বহীহ বুখারী, ছ্বুবুলুস সালাম শারহু বুলুগুল মারাম, নাইলুল আওত্বার, রিয়াযুছ ছ্বালেহীন ইত্যাদি।

উপকারী ইলম অর্জন, সৎ আমল করা ও উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য আমরা শিক্ষার্থীদেরকে উপদেশ দিবো। আর দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে যা কিছু উত্তম ও কল্যাণকর তা অর্জনে সময় ব্যয় করবে। নিজেদেরকে ভাল কাজে নিয়োজিত রাখবে। যে সব ক্ষেত্রে পার্থিব ও পরকালিন স্বার্থকতা ও সৌভাগ্য নিহিত আছে তাতে ধৈর্য ধারণ করবে।

৬৩. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, বয়স্কদের মধ্যে যারা ইলম অর্জন শুরু করতে চায় তাদের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি? কোন শাইখের শরণাপন্ন

---

[৬৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৯৯, আবূ দাউদ হা/৩৩২৯, তিরমিযী হা/ ১২০৫।

হওয়া ও সাক্ষাত করা তাদের পক্ষে সম্ভব না হলে এক্ষেত্রে শাইখ ছাড়া ইলম অর্জন তাদের কোন কাজে আসবে কি?

জবাবে শাইখ বলেন, যারা ইলম অর্জনের দিকে অগ্রসর হয় তাদেরকে যেন আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন, আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট এ প্রার্থনাই করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইলম অর্জন কঠিন কাজ; তা অর্জনে কঠোর চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন হয়। কেননা, আমরা জানি যে, যাদের বয়স বেশি সাধারণত তাদের শারীরিক কাঠামো বর্ধিত হয় কিন্তু তাদের বুঝ শক্তি তুলনা মূলক কমে যায়। ইলম অর্জনে ইচ্ছুক এ বয়স্ক ব্যক্তি এমন একজন আলিম নির্বাচন করবেন যিনি ইলমের দিক থেকে বিশ্বস্ত। যাতে তিনি ঐ আলিমের নিকট ইলম অর্জন করতে পারেন। কেননা, শাইখদের শরণাপন্ন হয়ে ইলম অর্জন অধিকতর সফল ও সহজ হয়। আর এভাবেই তিনি অধিক সফল হবেন। শাইখ হচ্ছেন জ্ঞানগত দিক থেকে সুপরিসর। বিশেষত ইলমুন নাহু, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহসহ অন্যান্য বিষয়ের উপকারী জ্ঞান যার রয়েছে বিশটা কিতাব অধ্যয়নের চেয়ে ঐ শাইখের নিকট সহজে ইলম অর্জন করা যায় এবং এতে কম সময় ব্যয় হয়। আর এভাবে অধিক নিরাপদে ইলম অর্জন করা যায়। কখনো এমন হয় যে, শিক্ষার্থী যে কিতাবের উপর নির্ভর করে ঐ কিতাবের লেখকের মতাদর্শ দলীল-প্রমাণ অথবা বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সালাফদের রীতি-পদ্ধতি বিরোধী হয়। সুতরাং ইলম অর্জনে ইচ্ছুক এ বয়স্ক ব্যক্তির জন্য আমাদের পরামর্শ থাকবে যে, তিনি কোন একজন বিশ্বস্ত শাইখের শরণাপন্ন হয়ে তার নিকট থেকে ইলম অর্জন করবেন। এটাই তার জন্য অধিকতর সফলতা বয়ে আনবে। এতে সে নিরাশ হবে না। আর সে একথাও বলবে না, 'আমিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছি' আমি ইলম অর্জন থেকে বঞ্চিত।

একটা ঘটনা স্বরণ হলো, জৈনক লোক যুহর ছ্বলাতের পর মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়ে। এরপর একজন লোক তাকে বলে, তুমি দু'রাকাআ'ত ছ্বলাত আদায় করে বসো। অতঃপর সে দু'রাকাআ'ত ছ্বলাত আদায় করে বসে। আবার আছর ছ্বলাতের পর একদিন সে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাআ'ত ছ্বলাত আদায়ের জন্য তাকবির দেয়। অতঃপর লোকটি বলে, তুমি ছ্বলাত আদায় করো না; এটা নিষিদ্ধ সময়। তোমার জন্য ইলম অর্জন করা আবশ্যক। এ কথা শুনে সে ইলম অর্জন শুরু করে। এমনকি সে ইমাম হয়ে যায়। ছ্বলাত আদায় করা বা না করার এ অজ্ঞতা ছিল তার ইলম না থাকার কারণে। আল্লাহ তা'আলা শিক্ষার্থীর উত্তম নিয়্যাতের কারণে তার উপর অনুগ্রহ করেন। ফলে শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হয়।

৬৪. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ইলম অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য কোন কোন বই অধ্যয়নের পরামর্শ দিবেন? বিশেষ করে আক্বীদা বিষয়ক বই পঠন সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আক্বীদা বিষয়ক কিতাবসমূহের মধ্যে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) রচিত আল-আক্বীদা আল ওয়াসেত্বিয়া (**العقيدة الواسطية**) বইটি উত্তম। বইটি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'তের আক্বীদা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সার নির্যাস হিসাবেই সুপরিচিত। বইটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন।[৬৭] প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা ঐ ব্যাখ্যা বুঝার প্রয়োজবোধ করবে। আক্বীদা সংক্রান্ত আরেকটি সুবিন্যস্ত কিতাব হলো كتاب عقيدة السفاريني এ কিতাবে এমন কিছু কথা আছে যা প্রকাশ্যে সালাফদের রীতি বিরোধী।

وليس ربنا بجوهر ولا عرض ... ولا جسم تعالى في العلى

অর্থাৎ আমাদের রব বস্তু নন, তাকে প্রদর্শন করা যায় না......আর তিনি উচ্চে দেহধারী নন।

এসবই সালাফদের রীতি বিরোধী কথা। কোন শিক্ষার্থী বিচক্ষণ শাইখের নিকট আক্বীদা বিষয়ক পাঠ গ্রহণ করলে সালাফদের মানহায-রীতি বিরোধী কথা তার নিকট স্পষ্ট হবে যা ঐ শিক্ষার্থীর জন্য উপকারী।

আর শিক্ষার্থী ছোট হলে ‘উমদাতুল আহকাম’ (**عمدة الأحكام**) মুখস্থ করবে, যা বুখারী ও মুসলিমের সংক্ষিপ্ত সংকলন। এক্ষেত্রে হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে পর্যালোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হবে না।

আর পরিভাষাগত জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বিরচিত **نخبة الفكر** গ্রন্থের তিন-চারটি পৃষ্ঠা মুখস্থ করবে যা স্মৃতিপটে স্থায়ী হওয়ায় উপণিত বয়সে এর উপকারীতা লাভ করবে।

আর তাফসীরের ক্ষেত্রে ‘তাফসীর ইবনে কাছির’ (**تفسير ابن كثير**) অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থ এবং আব্দুর রহমান নাছির আস-সা‘দী এর তাফসীর (**وتفسير الشيخ**

৬৭. বইটির ব্যাখ্যা মাকতাবাতুস সুন্নাহ হতে বের হয়েছে: ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান রচিত-শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসেত্বীয়া।

(**عبد الرحمن بن ناصر السعدي**) গ্রন্থটিও সহজ ও নির্ভরযোগ্য। শিক্ষার্থীরা এ দু'টি কিতাব অধ্যয়ন শুরু করবে তারপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক কিতাব পাঠ করবে।

ফিক্বহের কিতাবসমূহের মধ্যে **زاد المستقنع** গ্রন্থটি ভাল। যা সংক্ষিপ্ত ও বরকত পূর্ণ। আব্দুর রহমান আস-সা'দী এটির মূলপাঠ মুখস্থ করার পরামর্শ দেন।

নাহু শাস্ত্রে الأجرومية নামক গ্রন্থটি ভাল। এ সংক্ষিপ্ত কিতাবটি শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করবে। এরপর নাহুর সার সংক্ষেপ ألفية ابن مالك গ্রন্থটি পাঠ করবে যা শিক্ষার্থীদের জন্য উপকারী। আর সীরাত গ্রন্থের মধ্যে ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বিরচিত **زاد المعاد** গ্রন্থটি ভাল। বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনেক বিধান সাব্যস্ত করণসহ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের যাবতীয় অবস্থা গ্রন্থটিতে তুলে ধরা হয়েছে। আর উছুল ফিক্বহের ক্ষেত্রে বলবো, বিষয়টি কঠিন। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য الأصول من علم الأصول নামক সংক্ষিপ্ত কিতাব রচিত হয়েছে।

ফারায়িযের ক্ষেত্রে البرهانية নামক কিতাবটি সংক্ষিপ্ত ও উপকারী যা সব ফারায়িয গ্রন্থের পরিপূরক। গ্রন্থটির লেখক মুহাম্মাদ আল-বুরহানী (রাহিমাহুল্লাহ)।

৬৫.শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, যে শিক্ষার্থী কোন কিছু পাঠ করে অথবা শিখে কিন্তু ভুলে যায় তার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?

জবাবে শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মানুষ যা কিছু শিখে তদানুযায়ী আমল করা দরকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ}

যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদের হেদায়াত প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান করেন *(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৭)*। তিনি আরো বলেন,

{وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى}

যারা সঠিক পথে চলে আল্লাহ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেন *(সূরা মারইয়াম ১৯:৭৬)।*

মানুষ তার ইলম অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ তা‘আলা তার ইলম ও বুঝ শক্তি বৃদ্ধি করে দেন। {زَادَهُمْ هُدًى} এ আয়াতাংশের সাধারণ অর্থ থেকে এটা বুঝা যায়।

ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার মুখস্থ শক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে আমি আমার শিক্ষকের নিকট অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি আমাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন এবং তিনি বলেন, ইলম হচ্ছে নুর-আলো; আল্লাহ তা‘আলা কোন পাপী তার আলো দান করেন না। যে বিদ্যার দ্বারা কুফরী হয় তা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, মানুষ নানাবিধ অনর্থক চিন্তায় মগ্ন থেকে আনন্দবোধ করে ফলে তার ইলম অর্জনের সক্ষমতা দুর্বল হয়। মুখস্থ শক্তি অটুট রাখার আরো পদ্ধতি হলো যে, হক্ব জানার উদ্দেশ্যে সহপাঠীদের সাথে বেশি বেশি আলোচনা করতে হবে। পরস্পরকে পরাভূত করার উদ্দেশ্যে যেন আলোচনা না হয়। এভাবে হক্ব জানার একনিষ্ঠতা বজায় থাকলে নিঃসন্দেহে মুখস্থ শক্তি অটুট থাকবে ইনশাল্লাহ।

৬৬. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ফাতাওয়ার ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায় এমনকি অযোগ্য ছোটরাও ফাতাওয়া দেয়। এ সম্পর্কে আপনার পরামর্শ কি?

জবাবে শাইখ বলেন, ফাতাওয়া প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গণ্য হওয়ায় এ সম্পর্কে জবাবদিহীতার কারণে এবং ইলম ছাড়াই ফাতওয়া দানের আশঙ্কায় সালাফ আলিমগণ কোন বিষয়ে ফাতাওয়া নিয়ে পর্যালোচনা করতেন। কেননা, মুফতি হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রচারক এবং শরী‘আতকে স্পষ্টকারী। এ হিসাবে তিনি যদি না জেনেই কোন কিছু বলেন, হয়তো তা শিরক বলে গণ্য হতে পারে। তারা আল্লাহর তা‘আলার নিম্নোক্তবাণী মনোযোগসহ শুনতেন-বুঝতেন। আল্লাহ বলেন,

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: ٣٣].

বল, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না *(সূরা আল-আরাফ ৭:৩৩)।*

ইলম ছাড়া কথা বলার কারণে তার সাথে কোন কিছু অংশীদার স্থাপন হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٦] .

যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে *(সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৩৬)।*

ফাতওয়া প্রদানে মানুষের ত্বরান্বিত করা উচিত নয়। বরং ভেবে দেখবে, গভীরভাবে চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ করবে। সমাধানে অপারগ হলে তার চেয়ে যে অধিক জানে তার নিকট থেকে জেনে নিবে। যাতে আল্লাহ তা'আলার বিরূদ্ধে ইলম ছাড়াই কথা বলা থেকে বিরত থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তার একনিষ্ঠ নিয়্যাত সম্পর্কে জানেন। তিনি চাইলে তাকে সংশোধন করবেন। ফলে সে সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হবে যা সে চায়। আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাওফীক দান করেন এবং তাকে মর্যাদাবান করে দেন। আর যে ইলম ছাড়াই ফাতওয়া দেয় সে জাহিলের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট। কারণ জাহিলতো শুধু বলে, আমি জানি না। জাহিল নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে জানে এবং সত্যকে সে আবশ্যক মনে করে। অপর দিকে যে নিজেকে সকল আলিমের চেয়ে অধিক জ্ঞাত মনে করে সে কখনো নিজে পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করে। আর জেনে-বুঝে সে মাসআলায় ভুল করে। এমনটা করা ছোট শিক্ষার্থীর জন্য গুরুতর অন্যায় ও মারাত্মক ক্ষতিকর।

৬৭. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, কতিপয় ফিক্বহী মতভেদকে কিছু মতভেদের উপর প্রধান্য দেয়া শিক্ষার্থীর জন্য বৈধ হবে কি? অতঃপর সে ঐ প্রধান্য পাওয়া মতভেদ গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করে। অগ্রগণ্য মতভেদ সম্পর্কে জেনে কিছু ক্ষেত্রে এ মতভেদকে সে গ্রহণ করবে কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শিক্ষার্থীর নিকট কোন বিষয়ের হুকুম যদি পূর্ণরূপে স্পষ্ট না হয় এবং ঐ ক্ষেত্রে সন্দেহ থাকে তাহলে সতর্কতার সাথে অগ্রগণ্য মতকে গ্রহণ করবে। এছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করবে না। কেননা, হারাম অথবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে তার নিকট এমন কোন সুস্পষ্ট দলীল নেই যা সে আল্লাহর কাছে যুক্তি হিসাবে পেশ করবে যা শরীয়তে সাব্যস্ত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু বিষয়ে মুজতাহিদ সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাবোধ করেন। অতঃপর তিনি ঐ ব্যাপারে নিজে সমন্বয় সাধন করতে পছন্দ করেন। আর দুর্বোধ্য বিষয়ের সমাধানে তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। কিন্তু তার এ আশঙ্কাও হয় যে, আল্লাহর বান্দা হয়তো ঐ বিষয়টাকে গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করবে। এ জন্য আমরা বলবো, অগ্রগণ্য মত গ্রহণ করায় কোন বাধা নেই। কিন্তু চিন্তা-ভাবনার পুনরাবৃত্তি ছেড়ে দিবে না যতক্ষণ না বিষয়টি স্পষ্ট হয় এবং মানুষ দলীলের চাহিদা অনুসারে তা গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করে। আর দলীল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিষয়টি সংক্ষিপ্ত হবে না বরং শরী‘আত বর্ণনায় তা সংক্ষেপ হতে পারে। আর অগ্রগণ্য মত স্পষ্ট হলেই তার উপর আমল করা বৈধ নচেৎ বৈধ নয়।

৬৮. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ইলম অনুযায়ী আমল করে ক্ষ্যান্ত থাকার ব্যাপারে মন্তব্য করা হয়, এ ব্যাপারে আপনার উপদেশ কি?

জবাবে শাইখ বলেন, শরী‘আতের কোন বিষয় সঠিক জেনে তা প্রচার করা আবশ্যক। কেননা, মানুষ যা জানে তা আমলের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। এমনটা হলে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য কুরআনের আলো বৃদ্ধি করে দিবেন। ফলে আমলের মাধ্যমে তার জ্ঞানের আলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} [التوبة:١٢٤]

যখনই কোন সূরা নাযিল করা হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এটি তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অতএব যারা মুমিন, নিশ্চয় তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয় *(সূরা আত-তাওবাহ ৯:১২৪)*।

{وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ} [التوبة: ١٢٥]

যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এটি তাদের অপবিত্রতার সাথে অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে এবং তারা কাফির মৃত্যুবরণ করে কাফির অবস্থায় *(সূরা আত-তাওবাহ ৯:১২৫)।*

বলা হয়ে থাকে, আমলের মাধ্যমে ইলম সংরক্ষিত হয় নচেৎ তা চলে যায়। সালাফে ছ্বলিহীনরা কোন মাসআলা জানার পর তদানুযায়ী আমল করতেন। আর তাদের অনেকেই যা কিছু জানতেন দ্রুততার সাথে প্রকাশ্যে তা পালন করতেন। ছাহাবীগণ যা কিছু শিখতেন তা পালন করার ব্যাপারে তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা হতো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে ঈদের দিন ছাদাক্বাহ করা জন্য উৎসাহ দিতেন। দানের উদ্দেশ্যে তাদের কানের অলংঙ্কার তারা বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাপড়ে জমা করতেন। বাড়ীতে পৌঁছার পর তাদেরকে বলতে শুনা যায়নি যে, 'আমরা ছাদাক্বাহ করেছি' বরং তারা বলতেন, আমরা প্রতিযোগিতা করেছি।

অনুরূপভাবে পুরুষ লোকের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার হারাম জানার পর যে লোক তা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পেশ করতেন সেটা আর ফেরত নিতেন না। এমনকি ঐ লোককে বলা হতো, তুমি তোমার আংটি নিয়ে নাও, তা দ্বারা উপকৃত হও। জবাবে সে বলতো, আল্লাহর শপথ! আমি আংটি ফেরত নিবো না যা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পেশ করা হয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বলতেন,

اخرجوا إلى بني قريظة: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"

তোমরা বনী কুরাইযার উদ্দেশ্যে বের হও। বনী কুরাইযার এলাকায় পৌঁছা ব্যতিত কেউ যেন আছরের ছ্বলাত আদায় না করে।[৬৮]

তারা বনী কুরাইযার উদ্দেশ্যে বের হয়ে এলাকার নিকটতম অবস্থানে পৌঁছলে রাস্তায় ছ্বলাতের সময় হলে ছ্বলাতের সময় শেষ হওয়ার আশঙ্কায় তাদের কেউ কেউ ছ্বলাত আদায় করে নিল। তাদের কতিপয় লোক নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিম্নোক্ত বাণীর কারণে ছ্বলাত দেরিতে আদায় করলো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة".

[৬৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৯৪৬, ৪১১৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৭০।

বনী কুরাইযার এলাকায় পৌঁছা ব্যতিত কেউ যেন আছরের ছ্বলাত আদায় না করে।

সুতরাং হে শিক্ষার্থী ভাইয়েরা তোমরা লক্ষ্য করো ছাহাবীদের প্রতি যারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণের পর তা দ্রুত পালন করার জন্য এগিয়ে আসতেন। ইবাদত পালনে বর্তমানে যা কিছু ঘটে তা সামঞ্জস্য বিধান করলে প্রশ্ন জাগে বর্তমানে আমরা কি এ নির্দেশের উপর বহাল আছি? আমি বিশ্বাস করি যে, অনেকেই এ নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয়। আমাদের অধিকাংশরই জানা আছে যে, ছ্বলাত ইসলামের একটি স্তম্ভ যা পরিত্যাগের কারণে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। আমরা এটাও জানি, জামাআ'তের সাথে ছ্বলাত আদায় ফরযে আইনের অন্তর্ভুক্ত এবং তা আবশ্যক। আর অধিকাংশ নিষিদ্ধ বিষয়ও অনেকের জানা আছে। এরপরও দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা ঐ সব নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকে না। অনুরূপভাবে যারা ওয়াজিব পালন ছেড়ে দেয় তারা কোন ভ্রুক্ষেপই করে না। এটাই হলো পূর্ববর্তী ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মাঝে পার্থক্য।

৬৯. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ইলম অর্জনের সঠিক পন্থা কি? শরী'আত বিষয়ক কিতাবের মূলপাঠ আয়ত্ব করবে নাকি তা বুঝে নিবে? এ ব্যাপারে স্পষ্ট ব্যাখ্যা জানতে চাই।

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শিক্ষার্থীর উচিত যথাসাধ্য অল্প করে শিক্ষা অর্জন শুরু করা। উছূল শাস্ত্র, কাওয়ায়েদ ও রীতি-পদ্ধতি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত কিতাব এবং অনুরূপ বিষয়ের মূলপাঠ অধ্যয়ন করতে হবে। কেননা, সংক্ষিপ্ত কিতাবাদী অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যামূলক কিতাব পঠনের উপযোগীতা তৈরি হয়। এ কারণে উছূল শাস্ত্র ও কাওয়ায়েদ জানতে হয়। যে শিক্ষার্থী উছূল শাস্ত্র জানে না, সে মূলত (মৌলিক শিক্ষা থেকে) বঞ্চিত।

অনেক শিক্ষার্থীকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন মাসআলা মুখস্থ করে কিন্তু তাদের কোন উছূলের জ্ঞান নেই। মুখস্থ নেই এমন বিরল কোন মাসআলা তারা দেখলে তা বুঝতে সক্ষম হয় না। কিন্তু আইন শাস্ত্র ও উছূল জানা থাকলে আংশিক মাসআলার উপর হুকুম নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। এ কারণে আমি আমাদের ভাইদেরকে আইন শাস্ত্র, উছূল ও কাওয়ায়েদ শিক্ষা অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করবো। এতে বৃহৎ উপকার লাভ হবে। এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে, আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি যে, উছূল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং সংক্ষিপ্ত পাঠ আয়ত্ব করা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছু মানুষ ষড়যন্ত্র মূলক আমাদেরকে বলে, মুখস্থ

করাতে কোন উপকারীতা নেই বরং অর্থ জেনে রাখাই মূল বিষয়। কিন্তু তাদের এ ধরনের চিন্তা-চেতনা আমরা দূর করেছি। আল্লাহ তা‘আলা যা চেয়েছেন নাহু শাস্ত্র, উছুল ফিক্বহ ও তাওহীদের পাঠ আমরা মুখস্থ করেছি। মুখস্থ বিদ্যাকে অবহেলা করা যাবে না। এটাই মৌলিক বিষয়। হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউ ইবারত উল্লেখ পূর্বক পাঠ করে। কিন্তু শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ মুখস্থ করাই গুরুত্বপূর্ণ যদিও তাতে কিছু জটিলতা রয়েছে। আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যেন তোমরা সালাফে ছ্বলিহীনের পথ খুঁজে পাও। তিনি যেন আমাদেরকে হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনিই দাতা, দয়াময়।

৭০. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হওয়াকে কেন্দ্র করে যে সব শিক্ষার্থী দাওয়াত দান ছেড়ে দেয় তাদের ব্যাপারে আপনার মতামত কি? ইলম অর্জন ও দাওয়াত দান উভয়ের মাঝে তারা সমন্বয় সাধন করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রবল ধারণা রয়েছে যে, দাওয়াত দানে ব্যস্ত থাকলে ইলম অর্জন ছুটে যাবে। তারা মনে করে, ইলম অর্জনেই লিপ্ত থাকতে হবে এমনকি আংশিক ইলম অর্জন হলে দাওয়াত দান ও প্রশিক্ষণের কাজে যোগদান করতে পারবে এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?

জবাবে শাইখ বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান একটি সুউচ্চ মর্যাদাপূর্ণ মহৎ কাজ। কেননা, এটা নাবী রসূলদের কর্ম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}

তার চেয়ে কার কথা উত্তম? যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই ‘আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত *(সূরা হা-মিম-সাজদাহ ৪১:৩৩)*।

আল্লাহ তা‘আলা নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিম্নের বাণী প্রচার করতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন,

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

বল, এটা আমার পথ, আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই *(সূরা ইউসূফ ১২:১০৮)।*

এখানে জ্ঞাতব্য যে, ইলম ছাড়া দাওয়াত দান সম্ভব নয়। যেহেতু আয়াতে বলা হয়েছে {عَلَى بَصِيرَةٍ}। তাই না জেনে ব্যক্তি কিভাবে দাওয়াত দিবে? আর যারা ইলম-বিদ্যা ছাড়া আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয় তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন কথা বলে যা তারা জানে না। কাজেই দাওয়াত দানের জন্য জ্ঞান অর্জনই প্রথম স্তর। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইলম অর্জন ও দাওয়াত দানের মাঝে সমতা বজায় রাখতে হবে। যদি সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয় তাহলে ইলম অর্জনেই লিপ্ত থাকবে। কেননা, ইলম অর্জনকে কেন্দ্রীভূত করে দাওয়াত দেয়া হয়। ‘কিতাবুল ইলম’ পর্বের দশম অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, باب العلم قبل القول والعمل। এ অধ্যায়ের অনুকূলে আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণী দলীল হিসাবে তিনি পেশ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ}

জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নারী–পুরুষদের ত্রুটি–বিচ্যুতির জন্যে। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন *(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯)।*

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমে ইলম অর্জনের কথা বলেন। আর যারা মনে করে যে, ইলম অর্জন ও দাওয়াত দানের মাঝে সমতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাদের এ ধারণা ভুল। ইলম অর্জন ও দাওয়াত দান উভয়ই সম্ভব। শিক্ষার্থী ইলম অর্জন অবস্থায় তার পরিবারবর্গ, প্রতিবেশী, নিজ এলাকা ও দেশবাসীকে দাওয়াত দিবে। বর্তমানে জরুরী হলো সম্ভবপর গভীর জ্ঞানার্জন করা যার ভিত্তি হচ্ছে শারঈ উছুল। আর বস্তুগত জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ কিছু বিষয় বুঝতে পারে যা সে শিখে। উছুল ছাড়াই সে তা সাধারণভাবে শিখে, যার কোন ভিত্তি নেই। এ ইলম হচ্ছে খুবই সীমিত। এ ইলমের মাধ্যমে উপযুক্ত সময়ে মানুষ হক্বের প্রতিবন্ধকতা ও বাতিলপন্থীদের তর্ক-বিতর্ক দূর করতে পারে না। এজন্য মুসলিম যুবক শ্রেণীর প্রতি আমার উপদেশ হচ্ছে তারা যেন আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানে প্রতিষ্ঠিত

থেকে ইলম অর্জনে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায়। কোন প্রতিবন্ধকতাই যেন ইলম অর্জন থেকে তাদেরকে বিরত না রাখে। কেননা, ইলম অর্জন করা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের নামান্তর। এজন্য আলিমগণ বলেন: ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কেউ বেরিয়ে গেলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হিসাবে তাকে যাকাত দেয়া যেতে পারে। এটা ইবাদতে লিপ্ত থাকার বিপরীত বিষয়। কেননা, ইবাদতকারীকে যাকাত দেয়া যায় না। যেহেতু তিনি অর্থ উপার্জনে সক্ষম।

৭১. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ইলমুত তাজভীদ শিক্ষা আবশ্যকতার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি? আর "الصلاة، الزكاة" ইত্যাদি শব্দের শেষে ة বর্ণে ওয়াক্‌ফ করা ছ্বহীহ?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইলমুত তাজভীদের হুকুমসমূহ জানা আমি ওয়াজিব মনে করি না। এটা ক্বিরাত তথা পঠনরীতির সৌন্দর্যতার অন্তর্ভুক্ত। আর সৌন্দর্যতা আবশ্যকতার অন্তর্ভুক্ত নয়। ছ্বহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে আনাস ইবনে মালিক (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্বিরাআত কেমন ছিল? তার কিরাআত ছিল দীর্ঘ। অতঃপর তিনি পাঠ করতেন,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

তিনি বিসমিল্লাহ টেনে পড়তেন। الرحمن ও الرحيم শব্দেও টেনে পড়তেন। এখানে টেনে পড়া স্বভাবগত ব্যাপার; এর উপর নির্ভর করার দরকার নেই। দলীলের মাধ্যমে বুঝা যায়, তা স্বভাবগত বিষয়। যদি বলা হতো, তাজভীদের কিতাব সমূহে তাজভীদের বিস্তারিত হুকুমসমূহ জানা ওয়াজিব। তাহলে অবশ্যই তা আবশ্যক মনে করার কারণে অধিকাংশ মুসলিমের পাপ হতো। আমরা এক্ষেত্রে বলবো, যারা অধিকতর ভাষার বিশুদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করতে চায়, তারা বিদ্বানদের কিতাবে লিখিত ইলমুত তাজভীদের হুকুম-নিয়মাবলী মেনে চলবে। এটা শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণেও প্রযোজ্য হতে পারে। যাতে সকলের জানা থাকে যে, কোন কথা ওয়াজিব হওয়ার জন্য দলীল প্রয়োজন যা পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট এমন বিষয় হতে দায়িত্বমুক্ত থাকা যায় যা বান্দার উপর আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে দলীল নেই। আব্দুর রহমান ইবনে সা‘দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাজভীদের নিয়মাবলী বিস্তারিত (ব্যাকরণগত) নিয়ম কানুনের মতই যা ওয়াজিব নয়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা থেকে জানতে

পেরেছি। ইবনে কাসিম (রহিমাহুল্লাহ) এর মাজমূ'আহ ফাতওয়ার ১৬ তম খন্ড ৫০ পৃষ্ঠায় তাজভীদের হুকুম সম্পর্কে তিনি বলেন, এমন বিষয়ে উৎসাহিত হওয়ার দরকার নেই যা কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান থেকে অধিকাংশ মানুষকে নিবৃত রাখে। হরফসমূহের মাখরাজ, কণ্ঠস্থ করণ, উচ্চারণে জোড় প্রদান, আকৃষ্ট করণ, দীর্ঘ, সংক্ষিপ্ত ও মধ্যম পন্থায় টেনে পড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ওয়াসওসা রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলার কথার উদ্দেশ্যে বুঝা থেকে অন্তরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেমন {أَأَنْذَرْتَهُمْ}

আয়াতাংশের উচ্চারণ এবং "عليهم" শব্দের 'মিম' বর্ণ পেশ পড়া এবং তা 'ওয়াও' বর্ণের সাথে মিলিয়ে পড়া, 'হা' বর্ণে যের অথবা পেশ পড়া অনুরূপ অন্যান্য নিয়মে বিভিন্ন শব্দ পড়া। অনুরূপভাবে কেবল সুর করে সুন্দর আওয়াজে পড়ার উদ্দেশ্যে তাজভীদ শিখলে কুরআনের মর্মার্থ বুঝার অন্তরায় সৃষ্টি হবে। আর "الصلاة، الزكاة" ইত্যাদি শব্দের 'ة' বর্ণে ওয়াক্‌ফ করা হয় বলে যা শুনো তা সঠিক নয়। বরং ه বর্ণে ওয়াক্‌ফ করা হয়।

৭২. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, صلى الله عليه وسلم বাক্যেটির সংক্ষিপ্তরূপ প্রকাশ করণে কিছু মানুষ বন্ধনী ব্যবহার করে "ص" বর্ণ লিখে থাকে। এরূপ সংক্ষিপ্তভাবে লেখা সঠিক বলে গণ্য হবে কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কোন হাদীছ লেখার ব্যাপারে আলিমগণ যে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তা অনুরূপভাবে লিখে প্রকাশ করা শিষ্টাচারিতার অন্তর্ভুক্ত। صلى الله عليه وسلم বাক্যেটির সংক্ষিপ্তরূপ "ص" বর্ণ ব্যবহার করে প্রকাশ করা ঠিক নয়। অনুরূপভাবে "صلعم" লেখাও দরূদ বলে গণ্য হবে না। নিঃসন্দেহে এরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণ প্রতীক ব্যবহারের কারণে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠের ছাওয়াব থেকে ঐ ব্যবহারকারী বঞ্চিত হবে। আর পূর্ণ দরূদ যে লিখবে অতঃপর যে তা পাঠ করবে ঐ প্রথম লেখকের জন্য ছাওয়াব লাভ হবে। আর প্রকাশ থাকে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً".

যে ব্যক্তি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার দয়া বর্ষণ করবেন।[৬৯]

সুতরাং ত্বরান্বিত হয়ে এরূপ প্রতীকি বর্ণ লিখে ছাওয়াব ও প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হওয়া মুমিনের জন্য উচিত নয়।

৭৩. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, কোন সমাবেশে শারঈ প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে জনসাধারণ অধিকাংশ সময় ইলম ছাড়াই ঐ মাসআলায় ফাতওয়া দানে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? এ অবস্থা আল্লাহ ও তার রসূলের সামনে আগ বাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে গণ্য হবে কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জেনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর দীনের ব্যাপারে ইলম ছাড়া কথা বলা কারো জন্য বৈধ নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: ٣٣].

বল, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না *(সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩৩)*।

ইলম ছাড়া আল্লাহর বিরূদ্ধে কোন কিছু বলার ব্যাপারে মানুষের ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা ওয়াজিব-আবশ্যক। এটা পার্থিব বিষয় নয় যে, তাতে বিবেক খাঁটিয়ে কিছু বলার সুযোগ আছে। আর দুনিয়াবী কোন বিষয় হলেও তাতে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা ও ভেবে দেখা উচিত। মানুষকে কোন বিষয়ে যে জবাব দান করা হয় তা জবাব প্রাপ্তদের মাঝে হুকুমের মতই গণ্য হয়। আর ঐ জবাবটিই হয়তো শেষ ফায়ছালা হিসাবে বিবেচিত হয়। দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষ শারঈ মাসআলার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতিরেকে নিজের রায় তথা সিদ্ধান্ত অনুসারে কথা বলে। বিভিন্ন রায়-সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেয়ে সঠিক বিষয়ের সন্ধানে একটু বিলম্ব হলেও মানুষের নিকট ঐ সঠিক পন্থা স্পষ্ট হয় যার উপর সে বহাল ছিল না। এজন্য সকলের প্রতি আমার উপদেশ থাকবে যে, চূড়ান্ত ফায়ছালা খুঁজে পেতে একটু বিলম্ব

[৬৯] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৮৪, আবূ দাউদ হা/ ৫২৩।

করবে। বিভিন্ন রায়-সিদ্ধান্তের মাঝে যেন তা ফায়ছালা হিসাবে গণ্য হয়। নানা রকম রায়-সিদ্ধান্তে এটাও স্পষ্ট হবে যা শুনার পূর্বে প্রকাশ পায়নি। এটা পার্থিব বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিকে কিতাব-সুন্নাহ অথবা বিদ্বানগণের কথা জেনে-বুঝে তার উপর আমল করা ব্যতিরেকে কারো জন্য দীনি ব্যাপারে কথা বলা কখনোই বৈধ নয়।

৭৪. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, بدائع الزهور নামক কিতাব সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ কিতাবে এমন কিছু বিষয় আমি দেখেছি যা ছ্বহীহ নয়। আমি মনে করি না যে, মানুষ এ কিতাবের প্রতি মনোযোগী হবে। এ কিতাবে মুনকার বিষয় নিহিত থাকায় তা অনুসরণযোগ্য নয়।

৭৫. تنبيه الغافلين নামক কিতাব সম্পর্কে কি বলবেন?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি একটি উপদেশ মূলক বই। এতে অধিকাংশ উপদেশ দ্বঈফ-দুর্বল হিসাবে গণ্য। বইটিতে বানোয়াট উপদেশ ও কাহিনী রয়েছে যা ছ্বহীহ নয়। অন্তর বিগলিত করণ এবং অশ্রু ঝড়ানোই এ কিতাবের লেখকের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এটা সঠিক পন্থা নয়। কেননা, আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ নির্ধারিত উপদেশই যথেষ্ট। ছ্বহীহ নয় এমন বিষয়ের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া উচিত হবে না হোক তা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা সৎলোক সম্পর্কিত কোন বিষয়। এমন বিষয়ের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হলে মানুষ কথা-কর্মে ভুল পথ অনুসরণ করবে। তবে কিতাবটিতে কিছু বিষয় আছে যাতে অসুবিধা নেই। এ সত্ত্বেও আমি কিতাবটি পড়ার জন্য উপদেশ দিবো না। যে লেখকের কিতাবে ইলমের কথা ও বুঝ আছে, যাতে রয়েছে ছ্বহীহ, দ্বঈফ ও মাওদ্বুউ-জালের মাঝে পার্থক্য কেবল ঐ কিতাবই পাঠ করবে।

৭৬. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামে আলিমগণের গুরুত্ব ও অবস্থান কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইসলামে আলিমগণের বড় মর্যাদা রয়েছে। কেননা, তারাই নাবীগণের উত্তরাধিকারী। এজন্য ইলম শিক্ষা দেয়া এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া তাদের উপর ওয়াজিব যা অন্যের উপর ওয়াজিব নয়। আকাশে তারকার অবস্থান যেমন পৃথিবীতে তাদের অবস্থান তেমনই। পথভ্রষ্টদেরকে তারা

পথ দেখান। তাদের নিকট হক্বের বর্ণনা করেন এবং মন্দ কর্ম সম্পর্কে তারা সতর্ক করেন। পৃথিবীতে আলিমগণ হলেন বৃষ্টির মত যা বর্ষণ হওয়ায় অনুর্বর ভূমি আল্লাহর হুকুমে সবুজ হয়। আলিমদের ইলম, আমল, চরিত্র ও শিষ্টাচার সবই থাকা ওয়াজিব। কেননা, তারা জাতির জন্য আদর্শ। আর চরিত্র ও শিষ্টাচারের দিক থেকে তারাই উপযুক্ত ও উত্তম।

৭৭. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, কিছু মানুষ মনে করে, মুসলিমদের আলিমগণের ভূমিকা শারঈ বিধি-বিধানের মধ্যেই সীমিত। অন্যান্য জ্ঞান যেমন: রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা নেই এ ধরনের বিশ্বাস সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমরা মনে করি, আলিমদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের এ বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে অজ্ঞতা। সন্দেহ নেই যে, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং শারঈ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এমন প্রয়োজনীয় সব ধরনের জ্ঞানে শারঈ আলিমদের ভূমিকা রয়েছে। আলিমদের সম্পর্কে অহেতুক যা কিছু বলা হচ্ছে তা জানতে চাইলে মুহাম্মাদ রশিদ রেজা সম্পর্কে জানতে হবে। তাফসীরসহ তার বিভিন্ন বিষয়ের কিতাব রয়েছে। তার পূর্ববর্তী শারঈ জ্ঞান সম্পন্ন আলিমদের দিকে খেয়াল করো যারা ছিলেন সবচেয়ে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন। দেখা যায়, শারঈ জ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে তাদের বলিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তাদের ভিত্তি মূলক কায়েদা-কানুনের জ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা শিক্ষার্থী প্রথমেই অর্জন করা শুরু করে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين".

আল্লাহ তা‘আলা যার কল্যাণ চান তাকে দীনের বুঝ দান করেন।[৭০]

৭৮. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, দীনের ব্যাপারে মতভেদ কখন গ্রহণযোগ্য হয়? সব মাসআলা নাকি নির্দিষ্ট মাসআলায় মতভেদ হয়?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, প্রথমেই তুমি জেনে রেখো, মুসলিম উম্মতের আলিমগণের ইজতেহাদে যদি মতভেদ হয় কোন কারণে তা সঠিক বিষয়ের অনুকূলে না হলে তাতে ক্ষতি নেই। কেননা, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

[৭০] ছ্বহীহ বুখারী হা/ ৭১,৩১১৬, ৭৩১২ ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ১০৩৭।

"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد".

কোন বিচারক ইজতেহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। আর বিচারক ইজতেহাদে ভুল করলে তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার।[৭১]

কিন্তু হক্ব সুস্পষ্ট হলে সর্বাবস্থায় ঐ হক্বেরই অনুসরণ করা ওয়াজিব। মুসলিম উম্মাতের আলিমগণের মাঝে যে মতভেদ সৃষ্টি হয় তার কারণে অন্তরে ভিন্নতা তৈরি হওয়া বৈধ নয়। কেননা, অন্তরের ভিন্নতার কারণে মারাত্মক গুরুতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: ٤٦] .

তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন *(সূরা আল-আনফাল ৮:৪৬)।*

আলিমদের যে মতভেদ চিন্তা-ভাবনা করে দলীলসহ প্রচার করা হয় তা হিসাবযোগ্য। অপরদিকে, সাধারণ মতভেদ যা মানুষ বুঝে না, উপলব্ধি করতে পারে না তা বিবেচ্য নয়। এজন্য বিদ্বানগণের শরণাপন্ন হওয়া জনসাধারণের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣] .

জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জেনে থাক *(সূরা আন-নাহাল ১৬:৪৩)*।

অপরদিকে, প্রশ্ন কর্তার কথা হচ্ছে, প্রত্যেক মাসআলায় মতভেদ হয় কি না? এ কথার জবাব হচ্ছে, ইজতেহাদের ভিন্নতায় কিছু মাসআলায় মতভেদ হয় অথবা কিতাব ও সুন্নাহর দলীল অবহিত করার দিক থেকে কতিপয় আলিম অন্যদের

---

[৭১] ছ্বহীহ বুখারী হা/ ৭৩৫২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৬।

চেয়ে বেশি জানেন ফলে মতভেদ হয়। তবে মৌলিক মাসআলায় মতভেদ নেই বললেই চলে।

৭৯. ইসলামে ইজতেহাদের হুকুম কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

الاجتهاد في الإسلام هو: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي من أدلته الشرعية.

ইসলামে ইজতেহাদ হচ্ছে শারঈ দলীল সমূহ হতে শারঈ হুকুম অবগত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করা।

আর ইজতেহাদে সক্ষম ব্যক্তির উপর তা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣] .

জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জেনে থাক *(সূরা আন-নাহাল ১৬:৪৩)*।

ইজতেহাদে সক্ষম এমন ব্যক্তির পক্ষে নিজে হক্ব বুঝা সম্ভব। কিন্তু এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক আর এ ক্ষেত্রে শারঈ নছ (দলীল) কার্যকর উছুল ও আলিমদের কথা উপলব্ধি করতে হয়। যাতে বিরোধীতামূলক কোন কিছু না ঘটে। শিক্ষার্থীদের কতিপয় কেবল সহজ ইলমই অর্জন করেছে। অথচ তারা নিজেকে মুজতাহিদ বলে সম্বোধন করার চেষ্টা করে। খাছ নয় এমন ব্যাপক অর্থবোধক হাদীছ অনুযায়ী তাদেরকে আমল করতে দেখা যায় অথবা মানসূখ-রহিত হাদীছ অনুযায়ী সে আমল করে অথচ ঐ হাদীছের নাসিখ-রহিতকারী হাদীছ তার জানা নেই অথবা এমন হাদীছ অনুযায়ী আমল করে যে ব্যাপারে আলিমদের প্রকাশ্যে মতভেদ রয়েছে। তারা আলিমদের ইজমা সম্পর্কেও অবগত নয়। না জেনে এ ধরনের আমল করায় মারাত্মক ক্ষতি সাধন হয়।

শারঈ দলীল সম্পর্কে মুজতাহিদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উছুলের জ্ঞান অর্জিত হলে এবং আলিমগণ মাসআলা উদ্ঘাটনে যে রীতি অবলম্বন করেন তা জানা থাকলে দলীল থেকে হুকুম সাব্যস্ত করতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে যেন অজ্ঞাতসারে ইজমার বিরোধীতা না হয়। পূর্ণরূপে বাস্তবে এ শর্ত পূরণ হলে ইজতেহাদ হতে পারে। আর জ্ঞান খাটিয়ে যেহেতু কোন মাসআলায় ইজতেহাদ করতে হয় তাই ঐ ইজতেহাদ খন্ডিত হওয়াও সম্ভব। কোন মাসআলা অথবা ইলমের কোন অধ্যায়

যেমন: ‘কিতাবুত তাহারাত’ ইত্যাদি নিয়ে বিশ্লেষণ মুলক আলোচনা করলে হয়তো ইজতেহাদ হতে পারে।

৮০. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করা কি ওয়াজিব নাকি ওয়াজিব নয়?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হ্যাঁ, নির্দিষ্ট মাযহাবের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব-আবশ্যক। কিন্তু যে নির্দিষ্ট মাযহাবের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব তা হলো রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাযহাব। কেননা, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পথ অবলম্বন করেছেন তা অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর ঐ পথে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ-সৌভাগ্য। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: ٣١] .

বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১)*। তিনি আরো বলেন,

{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [آل عمران: ١٣٢]

তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রসুলের, যাতে তোমাদেরকে দয়া করা হয় *(সূরা আলে-ইমরান ৩:১৩২)*।

সুতরাং বুঝা গেল এ মাযহাবেরই অনুসরণ ওয়াজিব। অপরদিকে এ মাযহাব ব্যতিরেকে অন্য মাযহাবের অনুসরণ করলে পথভ্রষ্ট হবে যদি তাতে মতভেদের ব্যাপারে দলীল স্পষ্ট না হয়। যদি মতভেদের বিপরীতে দলীল স্পষ্ট হয় তাহলে ঐ মাযহাবের অনুসরণ হারাম। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন, কেউ যদি বলে থাকে, কোন মানুষ যা কিছু বলে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব তাহলে এরূপ বলার কারণে ঐ ব্যক্তিকে তাওবাহ করতে হবে। যদি সে তাওবাহ করে তাকে ছেড়ে দিতে হবে নচেৎ তাকে হত্যা করাই হবে যথাযথ। কেননা, তার কথা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য বিরোধী। আর শাইখুল ইসলাম ঠিকই বলেছেন, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর কথা ছাড়া কোন মানুষের কথা গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। কেবল তার কথাই গ্রহণযোগ্য। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر".

আমার পরে আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর অনুসরণ করো।[৭২] তিনি আরো বলেন,

"إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا".

যদি তারা আবূ বকব ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর অনুসরণ করে তারা পথ খুঁজে পাবে।[৭৩]

৮১. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামী জাগরণে ইলম অর্জনের প্রতি মনোযোগী হতে হয়। বিশেষত নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ ভিত্তিক ইলম অর্জন করা দরকার। আল্লাহর জন্যই প্রশংসা এবং তার নিকটেই রয়েছে। এ ইলম অর্জন কেন্দ্রীক কিছু মন্তব্য রয়েছে।

১. হাদীছ শাস্ত্রে গভীর ইলম নেই এমন কিছু শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীছ দ্বঈফ ও ছ্বহীহ হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। অথচ তাদের জানা আছে যে, হাদীছের এ মূল কিতাব দু'টি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'তের উম্মাতের নিকট গ্রহণীয়।

২. সংখ্যাগুরু যুবকশ্রেণীর নিকট মাযহাবের বাহ্যিক দিকটাই গ্রহণীয়। তারা উম্মাতের ফক্বীহগণের কিতাব থেকে বিমুখ থাকে।

৪. কতিপয় শিক্ষার্থীকে হাদীছের জ্ঞানার্জনে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়, এমতাবস্থায় আবশ্যকীয় বিষয় যেমনঃ আল-কুরআন, আরবী ভাষা, ফিক্বহ, ফারায়িয... ইত্যাদির জ্ঞানার্জন থেকে বিরত থাকে।

৫. এমন কতিপয় শিক্ষার্থী আছে যারা কোন শাইখের শরণাপন্ন হয়নি এবং শুধু পঠন ও অধ্যয়ন ছাড়া তাদের ইলমের গভীরতাও নেই অথচ বাহ্যিকভাবে তারা জ্ঞানী হওয়ার ভান করে, তাদের পক্ষ থেকে পাঠদান করা হয়, ফাতওয়া দেয়া হয় এসব বিষয়ে আপনার মন্তব্য-দিকনির্দেশনা কি?

---

[৭২] ছ্বহীহঃ তিরমিযী হা/৩৬৬৩, ইবনু মাজাহ হা/৯৮।
[৭৩] ছ্বহীহঃ ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ৬৮১।

শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, প্রথম মন্তব্যের জবাব হলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। সন্দেহ নেই যে, সুন্নাহ অনুসরণের ভালোবাসা এবং এর প্রতি উৎসাহিত হওয়া ইসলামী জাগরণের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তুমি যা উল্লেখ করেছো তাতে দেখা যায়, এমন কিছু শিক্ষার্থী শিক্ষা দেয়ার এ পথ অবলম্বন করেছে, পূর্ববর্তী আলিমদের মত যাদের পর্যবেক্ষণের সক্ষমতা, দূরদর্শিতা, শারঈ বিষয়গুলোর মাঝে পারস্পারিক সম্পর্কীয় জ্ঞান, মুত্বলাক্বকে তাক্বয়িদ করা এবং আমকে খাছ করণের জ্ঞান নেই। শরী'আতের সুপরিচিত সাধারণ কাওয়ায়েদ শিক্ষার দিকে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাহলেই সব ব্যাপারে তারা তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারবে। এমনকি হাদীছ শায হওয়ার কারণে যে দ্বঈফ হাদীছ বিদ্বানদের নিকট আমলযোগ্য নয় এবং উম্মাতের মাঝে নির্ভরযোগ্য কিতাবে বিরোধী হাদীছ থাকলে সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে পারবে। ঐ সব শিক্ষার্থীদেরকে দেখা যায়, তারা হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নেয়, বাড়াবাড়ি মূলক কিছু একটা বলে ফেলে, যে বিষয়ে আলিমগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তারা সেটা অস্বীকার করে। আরো আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, হাদীছের দিক থেকে তারা নির্ভরযোগ্য দু'টি অথবা একটি হাদীছ গ্রন্থের বিরোধিতা করে। আর যে সকল ইমামগণের ইমামত, তাদের সুন্দর নিয়্যাত ও ইলমের ব্যাপারে আলিমগণের ইজমা হয়েছে তারা ঐ সকল ইমামগণকে ফিক্বহের দিক থেকে প্রত্যাখ্যান করে। আরো দেখা যায়, এসব শিক্ষার্থী ইলম ও আমলের দিক থেকে পূর্ববর্তী ইমামগণের মত গভীরে পৌঁছেনি অথচ তারা ঐ সকল ইমামগণের বিরোধীতা করে চলছে। ইমামদেরকে তারা অসম্মান করে। তাদের প্রতি এটাই গুরুতর অমর্যাদা যা ইসলামী জাগরণের অন্তরায়। কোন মাসআলার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে নিতে বিলম্ব করা, বিচক্ষণতার সাথে ঐসকল ইমামের হক্বকে যথাযথ বুঝার চেষ্টা করা, তাদের কৃতিত্ব স্বীকার করা মানুষের উপর ওয়াজিব। আমরা তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হিদায়াত ও তাওফীক কামনা করছি।

আর দ্বিতীয় মন্তব্যের ব্যাপারে আমরা বলবো, **مذهب الظاهرية** 'যাহিরী মাযহাব' একটা সমস্যা। এ মাযহাবপন্থীরা শুধু বাহ্যিক দিক গ্রহণ করে, উপকারী কায়দা-কানুনের প্রয়োজনবোধ করে না। এ মাযহাবের অনুসারীদের সম্পূর্ণ অথবা কতিপয় রীতি-পদ্ধতির যেসব কথার মাধ্যমে কেবল ফাসাদ স্পষ্ট হয় আমরা যদি তা যাচাই করে দেখতাম তাহলে অনেক গোমরাহী খুঁজে পেতাম। কিন্তু আমরা মানুষের গোপন দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করা পছন্দ করি না।

তৃতীয় মন্তব্যের জবাব হচ্ছে, নিঃসন্দেহে প্রথমত আল্লাহর দিয়েই শিক্ষার্থীদের ইলম অর্জন শুরু করতে হবে। ছাহাবীগণ দশটি আয়াত শিক্ষা করতেন বুঝে-শুনে, এখানে ইলম ও আমল দু'টোই নিহিত ছিল। অতঃপর তারা সুন্নাতের দিকে খেয়াল রাখতেন। সনদ, জীবনী ও বিভিন্ন কারণ জেনেই তারা ক্ষ্যান্ত হননি। সুন্নাহ পদ্ধতিতে তারা ফিক্বহী মাসআলা বুঝতে উদ্বুদ্ধ হতেন। কেননা, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"رب مُبلغ أوعى من سامع"

এমন অনেক প্রচারকারী আছে যে শ্রোতার চেয়ে বেশি সংরক্ষণশীল।[৭৪] তিনি আরো বলেন,

"رُبَّ حامل فقهٍ ليس بفقيه".

এমন অনেক লোক আছে যারা নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারে।[৭৫]

সনদ ও তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আবশ্যকীয়ভাবে মানুষের জানা উচিত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে উদ্ভুত সুন্নাহর আলোকে ফিক্বহ সম্পর্কে জানা আবশ্যক। কাওয়ায়েদ ও শারঈ উছুলের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য বিধান জরুরী। যাতে মানুষ নিজে পথভ্রষ্ট না হয় এবং অন্যকেও ভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে না দেয়।

চতুর্থ মন্তব্যের জবাব হলো, মুফতির নিকট থেকে কোন বিষয় জেনে নেয়া মানুষের জন্য আবশ্যক। কেননা, আল্লাহ ও সৃষ্টির মাঝে ফায়ছালার দিক থেকে তিনি মধ্যস্থতাকারী এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়ারিছ হিসাবে গণ্য। সুতরাং তার গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক যাতে তিনি ফাতওয়া দানে সক্ষম হন। সুতরাং ইলম ছাড়া কোন ব্যাপারে ফাতওয়া প্রদান ও পাঠ শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়া ঠিক নয়। কেননা, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে আমাদেরকে অবহিত করেছেন, তিনি বলেন,

---

[৭৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ১৬৭৮।
[৭৫] তিরমিযী হা/২৬৫৬, আবূ দাউদ হা/৩৬৬০।

"إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جُهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلُّوا وأضلُّوا" .

আল্লাহ তার বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম উঠিয়ে নেন না, কিন্তু দীনের আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার ভয় করি। যখন কোন আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মুর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। তাদের নিকট জানতে চাওয়া হলে তারা না জানলেও ফাতওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।[৭৬]

আল-হামদুলিল্লাহ, যে মানুষ কল্যাণ কামনা করে এবং জানার উদ্দেশ্যে ও প্রচারের জন্য আসে পর্যাপ্ত সময় থাকার কারণে তার ইচ্ছানুযায়ী সে জানতে সক্ষম হয়, এটাই তার উদ্দেশ্যে। অপরদিকে, বাড়ি থেকে বের হয়ে ইলম অর্জনের পথে কারো যদি পর্যাপ্ত সময় না থাকে এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে তাহলে সে যেন আল্লাহ ও তার রসূলের পথেই মুহাজির হিসাবে মৃত্যু বরণ করলো। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিদান ধার্য করবেন। অনেকেই পাঠদান ও ফাতওয়া দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে, ফলে এ অবস্থা তার অনুশোচনার কারণ হয়। কেননা, তার পাঠদান ও ফাতওয়ায় যে ভুল রয়েছে তা স্পষ্ট হয়। আর একবার কোন কথা মুখ ফসকে বের হলে ঐ কথা ব্যক্তকারীর দিকেই ন্যস্ত হয়। সুতরাং যারা ইলম অর্জনের পথে আছে তারা যেন ত্বরান্বিত না করে, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকে। কোন ব্যাপারে ফাতওয়ার নির্ভুলতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত যেন বিলম্ব করে। আর ইলম মালের মত নয় যে, মানুষ খরিদ্দার খুঁজবে বরং যে ক্রয় করবে সেই তা পাবে। ইলম হলো নাবীগণের উত্তরাধিকার। এ জন্য ফাতওয়া দেয়ার সময় দু'টি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখা আবশ্যক।

প্রথম: আল্লাহ তা'আলা এবং তার শরী'আত থেকে কথা বলতে হবে।

দ্বিতীয়: আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। এ আদর্শের কারণেই আলিমগণ নাবীগণের উত্তরাধিকারী।

৮২. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, আল-কুরআন ও ছ্বহীহ সুন্নাহর ইলম অর্জনের দিক থেকে মানুষ কয় শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে?

---

[৭৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/১০০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ২৬৭৩, তিরমিযী হা/২৬৫২।

জবাবে শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কিতাব-সুন্নাহর ইলম অর্জনের দিক থেকে মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত ।

প্রথম: কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জন থেকে বিমুখ হয়ে যেসব শিক্ষার্থী মাযহাবী ফিক্বহের ইলম অর্জনের দিকে ধাবিত হয় তারা সাধারণত ঐ ফিক্বহী ধারায় আমল করে থাকে। আর মাযহাবী কিতাবের লেখকগণ যা বলেছেন তারা কেবল সেটারই অনুসরণ করে।

দ্বিতীয়: কুরআন সংশ্লিষ্ট যেসব জ্ঞান অর্জনের প্রতি শিক্ষার্থীরা আগ্রহী তার মধ্যে রয়েছে তাজভীদের ইলম অথবা কুরআনের অর্থ বুঝা অথবা শব্দাবলীর ই‘রাব (কারক চিহ্ন) প্রদান এবং বালাগাত (অলংঙ্কার শাস্ত্র) ইত্যাদির জ্ঞান।

অন্যদিকে, সুন্নাত ও হাদীছের জ্ঞান অর্জনের দিক থেকে শিক্ষার্থী খুব কমই রয়েছে। নিঃনন্দেহে হাদীছের জ্ঞানে তাদের সীমাবদ্ধতা আছে।

তৃতীয়: হাদীছ, সনদ বিশ্লেষণ, রাবীদের দোষ-ক্রটি, হাদীছ গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করা সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনে যারা আগ্রহী; কুরআনের জ্ঞানে তারা খুবই দুর্বল। কোন একটি আয়াতের স্পষ্ট তাফসীর জিজ্ঞেস করা হলে তারা ঐ আয়াতের তাফসীর জানে না বলে অবহিত করে। অনুরূপভাবে তাওহীদ ও আক্বীদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলেও তারা উত্তর দেয় না। নিঃসন্দেহে এটাই হলো তাদের বড় সীমাবদ্ধতা।

চতুর্থ: কিছু শিক্ষার্থী রয়েছে একত্রে কিতাব ও ছ্বহীহ সুন্নাহর জ্ঞানার্জনে উৎসাহী এবং কিতাব-সুন্নাহর জ্ঞান অনুযায়ী সালাফগণ যে রীতির উপর ছিলেন তারা তা অর্জন করে। এ সত্ত্বেও বিদ্বানগণের কিতাব সমূহে যা উল্লেখ আছে তারা তা থেকে বিমুখ হয় না বরং ঐ সব কিতাবাদীকে তারা মানদন্ড হিসাবে ব্যবহার করে এবং আল্লাহর কিতাব ও নাবীর সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে এ কিতাবাদীর সহযোগিতা গ্রহণ করে থাকে। কেননা, আলিমগণ কাওয়ায়েদ, রীতি-পদ্ধতি ও উছুল রেখে গেছেন এসবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হতে থাকবে। এসব কিতাব থেকে তাফসীরের শিক্ষার্থী তাফসীর, হাদীছের শিক্ষার্থী হাদীছের জ্ঞানার্জন করবে অথবা উভয়ের অর্থের ব্যাখ্যা শিখবে। তাই ঐসব কিতাবাদী কুরআন-সুন্নাহ বুঝার কেন্দ্র স্বরূপ এবং আলিমগণ তাদের কিতাবে যা বলেছেন জ্ঞানার্জনে তা সহযোগী হিসাবে গণ্য। এটাই হলো ইলম অর্জনের উত্তম প্রকার।

আমাদের জন্য লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক আমরা যেন জ্ঞানার্জনে সমতা বজায় রাখি। আর জ্ঞানার্জনে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় যে কোন

প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হই। আর সর্বশেষ উত্তম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হতে না পারলে ইলম অর্জনের পদ্ধতি যাচাই করা আমাদের উপর আবশ্যক হবে।

কেননা, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ৫৯]

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের *(সূরা আন-নিসা ৪:৫৯)*।

আলিম ও আমীরগণ أولي الأمر এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ৫৯]

কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকেই প্রত্যার্পণ কর *(সূরা আন-নিসা ৪:৫৯)*।

বিশেষত ছাহাবী ও তাবেঈনদের থেকে সর্বদা কোন কিছু গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ মোতাবেক ফায়ছালা করতেন। এ সত্ত্বেও আমি বলবো না যে, আলিমদের কথা গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। বরং তাদের কথা মূল্যায়নযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ ও বিবেচিত। কিতাব- সুন্নাহ বুঝতে তাদের কথার সহযোগীতার প্রয়োজন হয়।

৮৩. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, কতিপয় শিক্ষার্থী চাকুরী ও বেতন লাভের উদ্দেশ্যে লেখা-পড়া করে অনুরূপভাবে যারা বিনিময় লাভের উদ্দেশ্যে গবেষণার বিষয় লিপিবদ্ধ করে অথবা শিক্ষার্থীদের জন্য বার্তা তৈরি করে অথবা জ্ঞানগত সনদ পাওয়ার জন্য কিছু কিতাব তাহক্বীক-বিশ্লেষণ করে তাদের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলার জন্যই একনিষ্ঠভাবে নিয়্যাত করা শিক্ষার্থীদের উপর ওয়াজিব। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই শারঈ ইলম অর্জনের জন্য কোন হরফ, কালিমা-শব্দ কোন একটি পৃষ্ঠা যা কিছু হোক শিখবে। কিন্তু ইলম অর্জনের মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়্যাত করা সম্ভব? এর জবাব হচ্ছে, তা এভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ তা‘আলা ইলম অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা‘আলা কোন কিছুর নির্দেশ জারি

করলে আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে তা সম্পন্ন করা মানুষের জন্য ফরজ। এটাই আল্লাহর ইবাদত। কেননা, আল্লাহর নির্দেশ পালন করা, তিনি যা নিষেধ করেন তা বর্জন করা, তার সন্তুষ্টি কামনা করা এবং তার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকার নাম ইবাদত।

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ নিয়্যাত হলো নিজের ও অন্যের অজ্ঞতা দূর করা। এর নিদর্শন হলো ইলম অর্জনের পর তার আমলে ইলমের প্রভাব থাকবে, তার রীতি-পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসবে, অন্যের উপকার সাধনে সে হবে উৎসাহী। আর এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইলম অর্জনে তার নিয়্যাত ছিল নিজের ও অন্যের অজ্ঞতা দূর করা। এভাবে তার আদর্শ হয় সৎ কল্যাণকর।

এ রীতির উপরই সালাফে ছ্বলিহীন বহাল ছিলেন। তাদের পরবর্তীদের মধ্যে বর্তমানে এ বিষয়ে অনেক মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংখ্যাগুরু শিক্ষার্থীদের কারো নিয়্যাত এমন যে, তা দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণই সাধন হবে না বরং ক্ষতি হবে। কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে ঐ সব শিক্ষার্থী সনদ অর্জনের নিয়্যাত করে। এ ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করে বলেন,

"من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها".

যে ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা যায়, কোন লোক যদি দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের জন্য তা শিক্ষা করে, তবে সে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।[৭৭]

প্রশ্নকারী উল্লেখ যা করেছে তদানুযায়ী ঐসব শিক্ষার্থীর জন্য দুঃখ হয়, যারা বিনিময় লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্মে লিপ্ত থাকে অথবা বার্তা তৈরি করে অথবা যারা কতিপয় কিতাব তাহক্বীক-বিশ্লেষণ করে কাউকে বলে ঐ সব কিতাবের ব্যাখ্যা হাযির করো দেখি, অমুকের গবেষণা কর্ম মিলিয়ে দেখাওতো। অতঃপর এ বিশ্লেষক সম্মান পাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের সন্দর্ভ-থিসিস অথবা অনুরূপ কিছু পেশ করে যা কিছু শিক্ষকের মাঝে সাড়া পায়-স্বীকৃতি লাভ করে। এটিই মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে ও বাস্তবতার পরিপন্থী বিষয়। আমি মনে করি, এটি আমানতের খেয়ানতের একটি প্রকার। এখানে শুধু সনদ লাভের

[৭৭] আবূ দাউদ হা/৩৬৬৪, ইবনু মাজাহ হা/২৫২।

উদ্দেশ্যেকে আবশ্যক মনে করা হয়েছে, কিছু দিন পর যদি তাকে তার বিষয়-বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় সে উত্তর দিতে সক্ষম হয় না।

এজন্য আমি বদ নিয়্যাতের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করবো ঐসকল ভাইকে যারা কিতাব তাহক্বিক করে অথবা ব্যাখ্যা প্রস্তুত করে। আমি বলবো, তাহক্বিকের ক্ষেত্রে অন্য কিতাবের সাহায্যে নেয়াতে কোন সমস্য নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ গবেষণা কর্মটি যেন হুবহু অন্যের থেকে নকল না হয়। আল্লাহ সকলকে উপকারী ইলম অর্জন ও সৎ আমলের তাওফীক্ব দান করুন। তিনিই সাড়া দানকারী ও সর্বশ্রোতা।

৮৪. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, চিকিৎসা শাস্ত্র ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় কি দীনের বুঝ আছে?

জবাবে শাইখ বলেন, এসব বিষয় দীনি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা মানুষ তাতে কিতাব-সুন্নাহর জ্ঞান শিক্ষা করতে পারে না। কিন্তু মুসলিমরা এসবের মুখাপেক্ষী। এজন্য কতিপয় বিদ্বান বলেন, বিভিন্ন কারিগরি, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, জুওলজি এবং এসবের মত অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। তবে এ সব শারঈ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। শারঈ বিষয় ব্যতিরেকে কেবল এসবের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর পূর্ণ স্বার্থ লাভ হতে পারে না। এজন্য যারা এসব বিষয়-বস্তু নিয়ে পড়া লেখা করে আমি ঐসব শিক্ষার্থী ভাইকে সতর্ক করবো যে, মুসলিম উম্মাহর উপকার সাধন করা এবং তাদের সম্মান বজায় রাখাই যেন এসব বিষয়ে শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়। আজকে লাখ লাখ মুসলিম উম্মাহ যদি এসব বিষয় কাজে লাগাতো যা মুসলিমদের উপকারে আসে তাহলে অনেক কল্যাণ লাভ হতো। আমাদের প্রয়োজন পূরণে কাফিরদের মুখাপেক্ষী হওয়ার দরকার হতো না। কখনো কখনো এসব বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করা দরকার হয়। কিন্তু এসব বিষয়কে দীনের অন্তর্ভুক্ত বলে উদ্দেশ্যে নেয়া যাবে না। কেননা, তা দীনি বিষয় নয়। আর আল্লাহর শরী'আতের বিধি-বিধান, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়ই হলো দীনি বিষয়।

৮৫. ইলম অর্জনে কিভাবে ইখলাছ গঠিত হবে?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে ইখলাছ গঠিত হতে পারে।

প্রথম: আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যই নিয়্যাত করা। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা এটারই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ}

জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই *(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯)*।

আল্লাহ তা‘আলা ইলম অর্জনের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন, তার ভালোবাসাকে আবশ্যক করে, সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এমন বিষয় পালন করার প্রতি তিনি উৎসাহ ও নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয়: আল্লাহর শরী‘আত আয়ত্ব করার নিয়্যাত করতে হবে। কেননা, শিক্ষা করা, মুখস্থ করণ অথবা লিখনীর মাধ্যমে আল্লাহর শরী‘আত আয়ত্ব করা যায়।

তৃতীয়: শরী‘আত রক্ষা করা এবং এর প্রতিবন্ধকতা নিরসন করার নিয়্যাত করতে হবে। কেননা, আলিমদের মাধ্যমে যদি শরী‘আত সংরক্ষণ না হতো কোন প্রতিরক্ষক না থাকতো তাহলে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) সহ অন্যান্য আলিমদেরকে বিদ‘আতীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে দেখা যেত না। আলিমগণ বিদ‘আতীদের বিদ‘আত বাতিলের বর্ণনা দিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই যে, ঐসকল আলিম অনেক কল্যাণ লাভ করেছেন।

চতুর্থ: মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরী‘আত অনুসরণের নিয়্যাত করতে হবে। আর শরী‘আত অনুসরণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না তা জানা যায়।

পঞ্চম: ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে নিজের এবং অন্যের অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করতে হবে।

৮৬. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, কতিপয় মানুষ বলে, ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা একটি জটিল ব্যাপার অথবা পরিস্থিতি অনুসারে কখনো সঠিক নিয়্যাত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে; শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষত যারা চিন্তামূলক বস্তুবাদী ইলম অর্জন করে; সনদ পাওয়াই কি তাদের উদ্দেশ্যে নয়?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমরা বলবো, তুমি দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের জন্য সনদ লাভের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করলে এ ক্ষেত্রে তোমার নিয়্যাত ফাসেদ-ভ্রান্ত বলে গণ্য হবে। অপরদিকে মানুষের উপকার করার জন্য ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে সনদ লাভ হলে তা যথাযথ। কেননা, তুমি জানো যে, আজকাল সনদ ব্যতিরেকে জাতির জন্য বৃহৎ উপকারী পদ-মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়। মানুষের উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে সনদ লাভের নিয়্যাত করলে তা ভাল। এ ধরনের ইচ্ছা বিশুদ্ধ নিয়্যাত বিরোধী নয়।

৮৭. শাইখের কাছে প্রশ্ন হলো, ইলম অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে আপনার উপদেশ কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইলম অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। কেননা, ইলমের ফলাফল হলো আমল। কেননা, ইলম অনুসারে আমল না করলে ক্বিয়ামতের দিন প্রথম কাতারের জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। যেমন বলা হয়ে থাকে,

وعالم بعلمه لم يعمل ... معذب من قبل عبّاد الوثن

ইলম অনুযায়ী আলিমের আমল না হলে মূর্তিপূজকের আগে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

আর ইলম অনুসারে আমল না হলে ইলম হবে অকার্যকর-বরকতহীন এবং তা হবে স্মৃতিভ্রষ্ট। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ [المائدة: ١٣]

তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লা‘নত দিয়েছি এবং তাদের অন্তরসমূহকে করেছি কঠোর। তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে *(সূরা আল-মায়িদা ৫:১৩)*।

এ ভুলে যাওয়ার বিষয়টি স্মৃতিহীন হওয়া অথবা আমল না করা উভয়টির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ব্যক্তি অর্জিত ইলম ভুলে যাবে অথবা আমল করবে না। কেননা, আরবী ভাষায় আভিধানিক অর্থে কোন কিছু ভুলে যাওয়া বলতে তা পরিত্যাগ

করা বুঝায়। অপরদিকে ইলম অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ তা'আলা তা বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى} . [محمد: ١٧] .

যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদের হেদায়াত প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান করেন *(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৭)*।

আর আল্লাহ তা'আলা তাদের তাক্বওয়াও বৃদ্ধি করে দেন। এজন্য তিনি বলেন,

{وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} [محمد: ١٧]

তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান করেন (*সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৭*)।

ইলম অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন ইলমের উত্তরাধিকারী করেন যা সে জানতো না। এ কারণে কতিপয় সালাফ বলেন, আমলের মাধ্যমে ইলম বাড়তে থাকে নচেৎ তা বিনষ্ট হয়।

৮৮. শাইখের নিকট প্রশ্ন হলো, ইলম অর্জনে কোন বিষয়গুলো সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমানতদার একজন বিশ্বস্ত শাইখের নিকট ইলম অর্জন করা আবশ্যক। কেননা, বিশ্বস্ততাই শক্তি আর এ শক্তি বজায় রাখতে আমানত রক্ষা করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: ٢٦] .

নিশ্চয় আপনি যাদেরকে মজুর নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে সে উত্তম, যে শক্তিশালী বিশ্বস্ত *(সূরা আল-ক্বাছাছ ২৮:২৬)।*

কখনো দেখা যে, অনেক আলিম বিভিন্ন বিষয়ের উপর শাখা-প্রশাখাগত গভীর জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু তাদের আমানতদারীতা নেই। তারা তোমাকে এমনভাবে ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাবে তুমি বুঝতেই পারবে না। অপরদিকে একজন নির্ভরযোগ্য শাইখ ছাড়া তুমি নিজে নিজে শুধু কিতাব অধ্যয়ন করে প্রকৃত ইলম অর্জন করতে পারবে না। এজন্য বলা হয়ে থাকে, কেবল কিতাবই যার দলীল সঠিকের চেয়ে তার ভুল বেশি। কারণ সে কিতাব নামক এমন সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় যার কোন উপকূল নেই। আর সে এ সমুদ্রের নির্দিষ্ট গভীরতা নির্ণয়

করতেও সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে যে শিক্ষার্থী কোন বিশ্বস্ত শাইখের নিকট ইলম অর্জন নিয়োজিত থেকে যে সব বৃহৎ উপকার লাভ করে তা হলো:

(১). قصر المدة তথা সময়ের স্বল্পতা (অর্থাৎ ইলম অর্জনে কম সময় ব্যয় হয়।)

(২) قلة التكلفة পরিশ্রমের কমতি (তথা অল্প পরিশ্রমে সহজে ইলম অর্জন করা যায়)।

(৩) শাইখের স্বরনাপন্ন হয়ে ইলম অর্জন করা সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী। কেননা, শাইখ কোন বিষয় নিজে ভালভাবে জেনে-বুঝে শিক্ষার্থীর নিকট বর্ণনা করেন। জ্ঞানগত-ইলমী বিষয় আমানত হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানদানের জন্য তিনি অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করেন।

অপরদিকে, যারা শুধু কিতাবের উপরই নির্ভর করে তাদেরকে রাত-দিন ইলম অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হয়। অতঃপর আলিমদের কথা তুলনা করার জন্য শিক্ষার্থী যেসব কিতাব অধ্যয়ন করে তাতে বিভিন্ন আলিমদের দলীলগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক? এ নিয়ে সে শঙ্কাবোধ করে। অতঃপর সে হয়ে যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমরা দেখতে পাই যে, ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) যখন দু'জন বিদ্বানের কথা বর্ণনা করতেন চাই তা زاد المعاد অথবা إعلام الموقعين থাক তিনি প্রথম কথার দলীল সাব্যস্ত করে ব্যাখা করলে আমরা ঐ কথাটি সঠিক বলে মনে করি আর এটাও মনে করা হয় কোন অবস্থাতেই এ কথা পরিবর্তন করা বৈধ নয়। অতঃপর তিনি যখন ঐ কথা প্রত্যাহার করে এর বিপরীত ব্যাখ্যা করত সিদ্ধান্তে উপনিত হন তখন আমরা পরবর্তী কথাটিই সঠিক বলে ধরে নিই। এভাবে শিক্ষার্থীর মাঝে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়। তাই একজন বিশ্বস্ত শাইখের শরণাপন্ন হয়ে পাঠ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৮৯. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, বিতর্ক চর্চার জন্য কতিপয় প্রাথমিক শিক্ষার্থী ইবনে হাজম (রহিমাহুল্লাহ) এর كتاب المحلى পাঠ করে। আপনি যখন তাদেরকে এ উপদেশ দিবেন যে, এটা পূর্ববর্তীদের পন্থা তখন তারা বলে, আমরা এ কিতাব পাঠ করি চর্চার জন্য। এভাবে কিতাব পাঠ করা কি ছ্বহীহ?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনে হাজম (রহিমাহুল্লাহ) এর মুনাযারা-বিতর্ক পদ্ধতি জটিল। তিনি বিতর্কের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করেন। এ ধরনের বিতর্কের

মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে কখনো গালি দেয়া হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। আমি আশঙ্কা করছি যে, প্রাথমিক ছোট শিক্ষার্থীরা ইবনে হাজমের কিতাব পাঠ করলে তার বিতর্ক পদ্ধতির দিকে তারা ফিরে আসবে। তার বিতর্ক পদ্ধতি সহজ হলে তা অবশ্যই উত্তম হতো। গভীর ইলম অর্জিত হলে ইনশাল্লাহ শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে ইবনে হাজমের বিতর্ক পদ্ধতি থেকে কিভাবে উপকৃত হতে হয়। অতঃপর গভীর ইলম অর্জনের পর সে তার কিতাব অধ্যয়ন করে বুঝবে। একারণে আমি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদেরকে তার কিতাব পাঠ করার উপদেশ দেই না। তবে হক্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য উত্তম পন্থায় বিতর্ক চর্চা করা আবশ্যক। অনেকেই গভীর ইলমের অধিকারী সত্ত্বেও তারা হক্ব প্রতিষ্ঠা করণে উত্তম পন্থায় তর্ক করতে সক্ষম নয়।

৯০. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ফিক্বহ বিষয়ে শিক্ষার্থী ইলম অর্জন করতে চাইলে উছুলে ফিক্বহের উপর নির্ভরশীল না হওয়া কি তার জন্য উচিত হবে?

জবাবে শাইখ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ফিক্বহ বিষয়ে কোন শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জন করতে চাইলে ফিক্বহ এবং উছুলে ফিক্বহ উভয় বিষয়ে একত্রে জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। যাতে সে এ নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন করতে পারে। তবে উছুলের জ্ঞান ছাড়াই ফিক্বহ জানা সম্ভব। কিন্তু ফিক্বহ ছাড়া উছুল জানা সম্ভব নয়। ফিক্বহ ছাড়া ফক্বিহ হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ ফক্বিহের জন্য উছুলে ফিক্বহের উপর নির্ভরশীল না হওয়াও সম্ভব। তবে ফিক্বহ শিক্ষা করতে চাইলে উছুলে ফিক্বহের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এজন্য উছুল বিষয়ের আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন যে, শিক্ষার্থীকে প্রথমে উছুলুল ফিক্বহের জ্ঞানার্জন করতে হবে। যাতে এর উপর ফিক্বহী জ্ঞানের ভিত্তি গঠিত হয়। আর ফিক্বহের সঠিক নিয়ম কানুনের মাধ্যমে মানুষ যেন আমল, ইবাদত ও লেন-দেনে প্রয়োজনীয় সমাধান খুঁজে পায়।

৯১. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, কতিপয় শিক্ষার্থীকে দেখা যায়, জ্ঞানগত কোন মাসআলা নিয়ে তার দলীলের আলোকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করত ঐ মাসআলাকে কেন্দ্র করে আলিমদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। অতঃপর জ্ঞানে অপরিপক্ক ঐ শিক্ষার্থী আলিমের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে আলিমকে বলে, আপনি এরূপ এরূপ যা বলছেন সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দয়া করুন। এটাতো হারাম। অতঃপর আলিম বলে কিভাবে হারাম? প্রতিউত্তরে সে বলে, আপনি কি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার আলোকে জবাব দিচ্ছেন নাকি অমুক অমুক ব্যক্তির কথার উপর ভিত্তি করে জবাব দিচ্ছেন?

অতঃপর শিক্ষার্থী এমন দলীল উপস্থাপন করে যা ঐ আলিম জানে না। কেননা, আলিম হলেও সব বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নন। সর্বোপরি এটা প্রকাশ পায় যে, ঐ শিক্ষার্থী আলিমের চেয়ে অধিক জানেন। এ পরিস্থিতির আলোকে আপনার মতামত কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মাসআলা বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটতে দেখা যায়, মানুষ কোন মাসআলা নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে অতঃপর আলিমদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। যেমনটা উল্লেখ করা হল। নিজের ইলম প্রকাশ করা ও অন্যের ইলম দুর্বল প্রতিপন্ন করার জন্য নয় বরং ইলম অর্জন ও হক্ব জানার উদ্দেশ্যে মানুষের প্রশ্ন করা আবশ্যক। মোদ্দা কথা হলো যে বড় তার প্রতি শ্রদ্ধা-শিষ্টাচার বজায় রাখা উচিত। বড়দের কারো ভুল পরিলক্ষিত হলে তা একান্তে অনুকূল পরিস্থিতে তুলে ধরা আবশ্যক। অথবা ঐ আলিমের সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করা দরকার অথবা শিষ্টাচার বজায় রেখে তার সাথে কথা বলা আবশ্যক। কথা হলো যে আলিম আল্লাহকে ভয় করে তার নিকট হক্ব স্পষ্ট হলে শীঘ্রই তিনি সে দিকেই প্রত্যাবর্তন করবেন। আর নিজের ভুল সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসে তিনি মানুষের মাঝে হক্ব ব্যক্ত করবেন।

৯২. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের সময় নষ্ট করা ও তা অপচয় রোধের ব্যাপারে আপনার দিক-নির্দেশনা কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শিক্ষার্থীরা কয়েকভাবে সময় নষ্ট করে তা হলোঃ

প্রথমঃ যা পড়া হয়েছে তা পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা ছেড়ে দেয়া।

দ্বিতীয়ঃ সহপাঠীদের সাথে এমন আলোচনায় বসা যাতে তাদের জন্য কোন উপকারীতা নেই।

তৃতীয়ঃ শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে মানুষের কথার অনুসরণ করা এবং উপকারহীন কথা যা বলা হয়েছে, বলা হয় এবং উপকার নেই এমন বিষয় যা অর্জিত হয়েছে, অর্জন হয়। সন্দেহাতীত এটি তার ঈমানের দুর্বলতা। কেননা, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যতা হলো তার উপকারহীন বিষয় ছেড়ে দেয়া।[৭৮]

[৭৮] আল-ঈমানু লি-ইবনে তাইমিয়াহ প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৪।

অনর্থক আলাপচারিতায় লিপ্ত থাকা এবং বেশি বেশি অহেতুক প্রশ্ন করার কারণে সময় নষ্ট হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে মানুষের অভ্যাসগত ব্যাধি। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট এ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এটাই বড় শঙ্কার বিষয়। এসব অহেতুক কর্মের কারণে কখনো সে এমন ব্যক্তির শত্রুতা পোষণ করে যার সাথে শত্রুতা করা ঠিক নয় এবং এমন লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে যে বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত নয়। এ ধরনের যে সব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার কারণে ইলম অর্জন হতে বিরত থেকে মনে করা হয় যে, তা হক্বের জন্য সহায়ক স্বরূপ। আসলে এসব কর্ম-কাণ্ড মোটেই হক্বের সহায়ক নয়। বরং এসবের মাধ্যমে নিজেকে অনর্থক কাজে নিয়োজিত রাখা হয় মাত্র। মানুষের নিকট সহজে কোন বিষয়ে সঠিক সংবাদ পৌঁছলে সে তা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সে ঐ সংবাদ নিয়েই ব্যস্ত থাকবে না এবং তা নিয়ে বড় চিন্তা-ভাবনাও করবে না। কেননা, এ কারণে শিক্ষার্থী ইলম অর্জন থেকে অহেতুক বিষয়ে ব্যস্ত থাকবে। আর এটা হবে তার জন্য বিশৃঙ্খলার কারণ। এমনিভাবে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে জাতির মাঝে দেখা দিবে দলবিচ্ছিন্নতা।

৯৩. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, জনসমাবেশে শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষার্থীর মাসআলা জানতে চাওয়া বৈধ হবে কি? যার জবাব দেয়া হলে উপকার লাভ হবে।

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শিক্ষার্থী এবং জনসাধারণ যে বিষয়ে প্রশ্ন করবে তার জবাব দেয়া আলিমের জন্য বৈধ। আর আলিম নিজেকে প্রকাশ করার জন্য কোন বিষয়ে জবাব দিবে না। কেননা, প্রশ্নকারী কখনো বলে যে, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, কিন্তু অমুক কেন উত্তর দেয়। এ ধরনের কথা বলায় নিজের আমিত্ব ও দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় না? আমরা বলবো, ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে এসব উদ্দেশ্যে নয় বরং ইলম ছড়িয়ে দেয়াই উদ্দেশ্যে হতে হবে। আর মানুষ জানে না যে, তার ভাইয়ের অন্তরে কি আছে যতক্ষণ না তা বর্ণনা করে। কোন কাজে মানুষ নিজের বড়ত্ব প্রকাশের ইচ্ছা না করে থাকলে কাজটি সঠিক হলে তা ভুল বলা ঠিক নয়। তাই সর্বোপরি ইলম ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে জবাব দেয়া হলে তাতে কোন সমস্যা নেই।

৯৪. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, মিডিয়া কি ইলম অর্জনের কোন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়? বাস্তবে কিভাবে এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায়?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ মিডিয়া ইলম অর্জনের একটি মাধ্যম এতে কারো সন্দেহ নেই। মিডিয়ার মাধ্যমে ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক উপকার লাভ

করি, এ কারণে আমাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নি‘আমতকে আমরা অস্বীকার করি না। কেননা, আমরা যেখানেই থাকি না কেন এর মাধ্যমে আলিমদের কথা আমাদের নিকট পৌঁছে যায়। আমরা গৃহে অবস্থান করলে সাধারণত আলিম ও আমাদের মাঝে বেশ দুরত্ব বজায় থাকে। আমরা ঘরে বসে সহজেই এ মিডিয়ার মাধ্যমে ঐ আলিমের কথা শুনতে পাই। তাই এটা আল্লাহর নি‘আমতের অন্তর্ভুক্ত। এটা আমাদের জন্য একটা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। এর মাধ্যমে সর্বত্র ইলম ছড়িয়ে দেয়া যায়। এর মাধ্যমে বাস্তবে উপকার লাভের ধরণ হলো মানুষ তার নিজের অবস্থা অনুযায়ী উপকার লাভ করবে। উদাহরণ স্বরূপ যারা গাড়ি চালায় তারা মিডিয়ার মাধ্যমে শুনে শুনে উপকার লাভ করতে সক্ষম। আবার খাদ্য গ্রহণ অথবা চা-কফি পানের সময়েও অনেকে এর মাধ্যমে নসিহত শুনে শুনে উপকৃত হয়। এখানে মূলত উপকার লাভের ধরণই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেকে তার নিজের অনুকূল অবস্থার আলোকে মিডিয়ার মাধ্যমে উপকার লাভ করবে। আমাদের পক্ষে এটা বলা সম্ভব নয় যে, এর মাধ্যমে উপকার লাভের সাধারণ নীতি আছে।

৯৫. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, কোনটি উত্তম রাত জেগে ইবাদত করা নাকি ইলম অন্বেষণে নিয়োজিত থাকা?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রাত জেগে ইবাদত করার চেয়ে ইলম অর্জন করতে থাকা উত্তম। কেননা, ইলম অর্জন সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নিজের এবং অন্যের অজ্ঞতা দূরিভুত করার বিশুদ্ধ নিয়তে ইলম অর্জন করলে তার সাথে কোন জিনিসেরই তুলনা হবে না। আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাতের প্রথমাংশে মানুষকে ইলম শিক্ষা দেয়ায় নিয়োজিত থাকা রাত জেগে ইবাদতের চেয়ে উত্তম। তবে ইলম অন্বেষণ ও ইবাদত উভয়টি একত্রে সম্পন্ন করলে আরো উত্তম। সম্ভব না হলে শারঈ ইলম অর্জনই উত্তম। এজন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর পুর্বে আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বিতর ছ্বলাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন।

আলিমগণ বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত নির্দেশের কারণ হলো আবূ হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ রাতের প্রথমভাগে মুখস্থ করতেন এবং শেষভাগে তিনি ঘুমাতেন। তাই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর পূর্বে তাকে বিতর ছ্বলাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন।

৯৬. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে দাঈ হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন দিক-নির্দেশনা আছে কি? কেবল ইলম অর্জনে নিয়োজিত থাকলে দাওয়াত দান থেকে কি বিরত থাকা হয় না?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইলম অর্জন ছাড়া যে দাওয়াত দেয়া হয় তাতে কল্যাণ নেই। অর্থাৎ ইলম বিহীন দাঈর অনেক কল্যাণই ছুটে যায়। তাই আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের সাথে ইলম অর্জন করা শিক্ষার্থীর উপর ওয়াজিব। মসজিদে কাউকে ইলম অর্জন করতে দেখলে তাকে দাওয়াত দিতে শিক্ষার্থীর জন্য কি কোন প্রতিবন্ধকতা আছে? নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য বাজারের উদ্দেশ্যে বের হলে আল্লাহর দীন বিমুখ ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতে কি তার কোন অসুবিধা আছে? যখন সে মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে দেখতে পায় যে, শিক্ষার্থীরা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান হতে বিমুখ তখন তাদের হাত ধরে দাওয়াতী কাজে নিয়ে যেতে তার কোন প্রতিন্ধকতা আছে কি? তবে পাপাচারীতার সাথে কাউকে বিরোধী মনে হলে, অসৎ কাজ ছেড়ে না দিলে, তার প্রতি অতিষ্ট হলে, তাকে সংশোধন করা সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে বলেন,

{فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ} [الأحقاف: ٣٥] .

তুমি ধৈর্য ধারণ কর, যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না (*সূরা আল-আহক্বাফ ৪৬:৩৫*)।

সুতরাং ধৈর্য ধারণ করা মানুষের উপর ওয়াজিব। নিজের অথবা অন্যের মাঝে কোন সমস্যা দেখতে পেলে তা সমাধানের ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করবে। কোন এক যুদ্ধে রসূল ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হলে তিনি বলেছিলেন, "هل أنت إلا أصبع دَميت ... وفي سبيل الله ما لَقِيت"

তুমি একটি আঙ্গুল ছাড়া আর কিছু নও; তুমি রক্তাক্ত হয়েছো আল্লাহর পথেই।[৭৯]

[৭৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/ ২৮০২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৯৬।

৯৭. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, কোন মাসআলা নিয়ে আলিমের ইজতেহাদের পর ছ্বহীহ বিধান উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হলে তার হুকুম কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কোন মাসআলা নিয়ে ইজতেহাদ করলে আলিম কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হন এবং কখনো তিনি ভুল করেন। যেমন বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীছে এসেছে,

"وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا". رواه مسلم.

তুমি কোন দূর্গ অবরোধ করার পর তারা তোমার নিকট আল্লাহর হুকুমে দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসার আবেদন করলে তুমি তাদেরকে বেরিয়ে আসার অনুমতি দিও না, বরং তাদেরকে তোমার নিজের হুকুমে বেরিয়ে আসার অনুমতি দাও। কারণ তোমার জানা নেই যে, তাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহর হুকুম কার্যকর করতে পারবে কি না।[৮০] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد".

বিচারক ইজতেহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হলে তার জন্য রয়েছে দু'টি প্রতিদান আর ভুল হলে রয়েছে একটি প্রতিদান।[৮১]

আমরা কি একথা বলবো, মুজতাহিদ ভুল করলেও তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে বহাল থাকেন?

জবাবে বলা হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, মুজতাহিদদের প্রত্যেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আবার কেউ বলেন, প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক নন। আরো বলা হয়, উছূল ছাড়াই শাখাগত বিষয়ে মুজতাহিদ সঠিক রায় দেন। আর উছূলের ক্ষেত্রে বিদ'আতপন্থীদেরকে সঠিক বলা থেকে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। যা হোক, বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, ইজতেহাদের দিক থেকে প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক রায় দেন। অপরদিকে, হক্বের অনুকূলতার দিক থেকে তিনি সঠিক রায় দেন অথবা ভুল করেন। এটা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা দ্বারা প্রমাণিত।

---

[৮০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৩১, আবূ দাউদ হা/ ২৮৫৮।
[৮১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৫২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ১৭১৬।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, সঠিক রায় ও ভুল সিদ্ধান্ত উভয়টি মুজতাহিদগণের দ্বারা ঘটে থাকে। হাদীছের ভাষ্য ও দলীল দ্বারা বুঝা যায়, ইজতেহাদের বিষয়টি শাখাগত ও উছুলের অন্তর্ভুক্ত। আর এটাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। কিন্তু সালাফদের ইজমা বিরোধী ইজতেহাদে ভুল সর্বদা ভুল বলেই গণ্য। আর এটা সম্ভব নয় যে, শাখাগত ও উছুলের বিষয়ে মুজতাহিদ সব সময় সঠিক বিবেচিত হবেন আর সালাফগণ সঠিক বলে গণ্য হবেন না। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহিমাহুমাল্লাহ) দীনের শাখা ও উছুল এ ধরনের শ্রেণী বিন্যাসকে অস্বীকার করেন। তারা বলেন, ছাহাবীদের যুগের পর এ শ্রেণী বিন্যাস সৃষ্ট।

আমরা দেখতে পাই যে, কতিপয় আলিম এ শ্রেণী বিন্যাসের মাধ্যমে দীনের উছুলগত গুরুত্বপূর্ণ বিধানকে শাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন অথচ তা শাখা নয়। যেমন: الصلاة । এটি ইসলামের স্তম্ভ বা খুঁটি। তারা আক্বীদাগত ব্যাপারে এমন কিছু বিষয় বের করেন যা নিয়ে সালাফগণ মতানৈক্য করেছেন। ঐ সকল আলিমগণ বলেন, ছ্বলাত হচ্ছে দীনের শাখার অন্তর্ভুক্ত। আর এটা আক্বীদাগত বিষয় নয়। এটা আক্বীদার শাখা মাত্র। এ ধরনের কথার জবাবে আমরা বলবো, যদি আক্বীদাগত বিষয়কে উছুল উদ্দেশ্যে নেয়া হয় তাহলে সম্পূর্ণ দীনই উছুল হিসাবে গণ্য। কেননা, শরী'আতসম্মত আক্বীদা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য অর্থনৈতিক ও শারীরিক ইবাদত পালন করা সম্ভব নয়। এটাই হলো আমলের উপর আক্বীদা। যদি এটাকে আক্বীদা হিসাবে গণ্য করা না হতো তাহলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাতদই বিশুদ্ধ হতো না। যা হোক, সঠিক কথা হলো উছুল ও শাখা যা কিছু নামকরণ করা হোক না কেন উভয় ক্ষেত্রে ইজতেহাদের দরজা উন্মুক্ত। কিন্তু সালাফগণ যেসব পন্থা বের করেননি তা সাধারণত গ্রহণযোগ্য নয়।

৯৮. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, যারা ইজতেহাদ সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করে বলে যে, বর্তমান যুগ মুজতাহিদ মুক্ত; এ ব্যাপারে আপনার ভাষ্য কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সঠিক কথা হলো, সুন্নাহর দলীল অনুসারে ইজতেহাদের দরজা অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন উমার ইবনে আছ এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد".

বিচারক ইজতেহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হলে তার জন্য রয়েছে দু'টি প্রতিদান আর ভুল হলে রয়েছে একটি প্রতিদান।[৮২]

যারা বলে, এখন ইজতেহাদ নেই, বর্তমান যুগ মুজতাহিদ মুক্ত উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় তাদের এ কথাটি দুর্বল। তবে কিতাব-সুন্নাহ হতে বিমুখ হয়ে কেবল মানুষের মতামতের উপর ভিত্তি করে ইজতেহাদ করা ভুল। বরং কিতাব-সুন্নাহ হতে যতটুকু সম্ভব মাসআলা উদ্‌ঘাটন করে তা গ্রহণ ওয়াজিব। সুন্নাহর আধিক্যতা এবং ভিন্নতায় কোন বিষয়ে একটা হাদীছ শুনেই ফায়ছালা গ্রহণ করা উচিত হবে না যতক্ষণ না ঐ ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল সাব্যস্ত হয়। কেননা, কখনো এমনও ঘটে যে, কোন হুকুম সম্পর্কে মানসুখ অথবা মুক্বাইয়াদ কিংবা আম হাদীছ রয়েছে অথচ এ ব্যাপারে ব্যক্তির হয়তো বিপরীত ধারণা রয়েছে। আর যদি এটা বলা হয় যে, তোমরা কুরআন সুন্নাহ দেখে কিছু বুঝতে পারবে না; কারণ তোমরা মুজতাহিদ নও তাহলে এ ধরনের কথা বলাও ঠিক হবে না। সর্বোপরি আমরা বলবো যে, ইজতেহাদের দরজা উম্মুক্ত। এজন্য পূর্ববর্তী আলিমদের কথাকে সব সময় উপেক্ষা করা অথবা তাদের অসম্মান করা বৈধ নয়। কেননা, তারা মাসআলা উদ্ঘাটনে চেষ্টা-সাধনা ও ইজতেহাদ করেছেন। এ ব্যাপারে তারা ত্রুটি মুক্ত নন। তাদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা, তারা যে মাসআলা দিয়েছেন তাতে ত্রুটি বের করে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে তা তুলে ধরা তোমার জন্য বৈধ নয়। কেননা, শত্রুর গিবত করা হারাম হয়ে থাকলে ঐ সব আলিমের গিবত করা কিভাবে সম্ভব যারা দলীল ভিত্তিক মাসআলা উদ্ঘাটনে নিজেদেরকে বিলিন করে দিয়েছেন? অতঃপর কথা হলো, শেষ যুগে কিছু লোক বলতে থাকবে, ঐসব আলিম কিছুই জানে না, তাদের মাসআলায় ত্রুটি রয়েছে। তারা এরূপ আরো অনেক কথাই বলবে। বিরল কিছু মাসআলায় যদিও ত্রুটি হয়ে থাকে কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ মাসআলা উদ্ঘাটন করা তাদের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং তারা চর্চার উদ্দেশ্যে কাওয়ায়েদ ও উছুলের ভিত্তিতে মাসআলায় সমতা বিধান করেছেন।

৯৯. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, ইমাম নববী, ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহিমাহুমাল্লাহ) এর ব্যাপারে কতিপয় লোক বলে যে, তারা বিদ'আতপন্থী। এ শ্রেণীর আলিমদের আক্বীদায় কোন ভুল ছিল কি? যদিও ইজতেহাদ ও তা'বিলে ভুল

[৮২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৫২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ১৭১৬।

থাকার কারণে তাদেরকে বিদ‘আতপন্থী বলা হয়ে থাকে। এখানে ইলম ও আমলগত বিষয়ে ভুলের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাদের বাস্তব অবদান ও বৃহৎ উপকার মুসলিম উম্মাহর জন্য স্বীকৃত। যদিও কতিপয় নছ (দলীলে) উল্লেখিত ছিফাত গুণাবলী সম্পর্কে তাদের ত্রুটি রয়ে গেছে তদুপরি তাদের মর্যাদা ও বৃহৎ উপকারের কারণে তা লজ্জাকর নয়। তাদের ইজতেহাদ ও সুক্ষ্ম তা’বিলে ত্রুটি হয়ে থাকলে তা নিয়ে আমরা বিরূপ মন্তব্য করবো না। আমরা কামনা করি যে, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করবেন। কল্যাণকর,উপকারী ও প্রশংসাযোগ্য অবদান যা কিছু তারা রেখে গেছেন আল্লাহ তা‘আলা এসবের বিণিময় দান করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ١١٤]

নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয় *(সূরা হুদ ১১:১১৪)*।

আমি মনে করি, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ’তের অনুসারী। আর এটাই সাক্ষ্যে বহন করে যে, তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর জন্য খেদমত করেছেন। আর সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত এমন সর্ব প্রকার কলুষতা থেকে সুন্নাহকে রক্ষার জন্য তারা ছিলেন উৎসাহী এবং যা দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয় এমন দলীল বিশ্লেষণে ছিলেন তৎপর। কিন্তু গুণাবলী সম্পর্কি আয়াত ও হাদীছের ব্যাপারে তাদের মতভেদ আছে অথবা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ’তের কতিপয় ইজতেহাদ সম্পর্কে তাদের বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। আমরা কামনা করি, আল্লাহ তা‘আলা যেন তাদের সাথে ক্ষমা সুন্দর আচরণ করেন।

আর আক্বীদার ক্ষেত্রে বলবো, আক্বীদায় সালাফদের রীতি বিরোধী কোন ত্রুটি ঘটলে নিঃসন্দেহে তা ভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে এক্ষেত্রে দলীল প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভ্রষ্ট বলে আখ্যা দেয়া সমীচিন নয়। আক্বীদাগত ভুল-ভ্রান্তির উপর দলীল সাব্যস্ত হলে তা হক্ব বিরোধী বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত হবে যদিও ব্যক্তি সালাফপন্থী হয়ে থাকে। সাধারণত তাদেরকে বিদ‘আতী বলে আখ্যা দেয়া যাবে না এবং সালাফীও বলা যাবে না। বরং সালাফদের যেসব রীতির উপর তারা বহাল ছিলেন তদানুযায়ী সালাফ বলে গণ্য হবেন আর যেসব রীতির বিরোধীতা করা হয়েছে সেক্ষেত্রে বিদ‘আতী বিবেচিত হবেন।

যেমন ফাসিকের ব্যাপারে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআ’তের কথা হলো, যতটুকু ঈমান রয়েছে তার কারণে ব্যক্তি মুমিন আর অবাধ্যতার কারণে তিনি ফাসিক।

সুতরাং সাধারণ কথায় এককভাবে কোনটির দিকেই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে গুণান্বিত করা যায় না। আর এটিই হলো ইনসাফ যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। তবে বিদআ'তের সীমা অতিক্রম করলে ব্যক্তি মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবেন, এক্ষেত্রে তার কোন মূল্যায়ন নেই।

আর আমল ও ইলমগত ভুলের মাঝে পার্থক্যের ব্যাপারে কথা হলো, আমি মূলত এ ধরনের ভুলের মাঝে পার্থক্যকরণ জানি না। তবে অত্যাবশক ইলমগত ঈমান সম্পর্কে আমরা যা জানি যে ব্যাপারে সালাফদের সবাই একমত ছিলেন এবং কিছু বিষয়ে মতভেদ করেছেন তা ছিল শাখাগত বিষয়, মৌলিক নয়। কম সংখ্যকই এ শাখাগত বিষয়ে বিরোধীতা করেছেন। কখনো সালাফগণ শাখাগত ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। যেমন: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তার প্রভুকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলেন। এরূপ কবরে প্রশ্নকারী দু'জন ফিরিস্তা সম্পর্কে তাদের মতভেদ আছে। আরো মতভেদ হলো, বিচারের মাঠে দাড়ি পাল্লায় আমল অথবা আমলনামা নাকি আমলকারী ব্যক্তিকে রাখা হবে। কবরে রূহ ছাড়া শুধু শারীরিক শাস্তি হবে কি না? দায়িত্ব বর্তায়নি এমন নাবালক শিশুদেরকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কি না? পূর্ববর্তী উম্মাতকে কবরে জিজ্ঞেস করা হবে কি না যেমনভাবে এ উম্মাতকে জিজ্ঞেস করা হবে। জাহান্নামের উপর নির্মিত রাস্তার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে? জাহান্নামের আগুন নিভে যাবে নাকি সর্বদা স্থায়ী হবে? এরূপ অন্যান্যে বিষয়ে মতভেদ আছে। এসব মাসআলায় জমহুর আলিমদের সঠিক সমাধান আছে। এ বিষয়ে মতানৈক্য দুর্বল বলে বিবেচিত হবে। অনরূপভাবে আমলগত ব্যাপারেও শক্তিশালী ও দুর্বল মতভেদ রয়েছে। এজন্য আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দু'আ জানতে হবে তা হলো,

"اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم".

হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহের জ্ঞানের অধিকারী। তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করে তুমিই সে গুলোর ফায়ছালা করবে। সত্য ও ন্যায়ের যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করা

হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে পথ দেখাও। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা সরল-সহজ পথ দেখিয়ে থাকে।[৮৩]

১০০. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, একই বিষয়ে ফাতওয়া দানে দু'জন মুফতির মাঝে মতভেদ হয় এর কারণ কি? আর এক্ষেত্রে ফাতওয়া গ্রহণে করণীয় কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথম: কখনো এমন হয় যে, দু'জন মুফতির মধ্যে একজন যা জানেন অপর জনের তা জানা নেই। তাই প্রথম মুফতি তথ্যের দিক থেকে বেশি অগ্রগামী। তাই যে ব্যাপারে তার পর্যবেক্ষণের জ্ঞান রয়েছে তা অপরের নেই।

দ্বিতীয়: কোন বিষয় উপলব্ধি করার ব্যাপারে মানুষের মাঝে অনেক মতানৈক্য আছে। কখনো কখনো মানুষ ইলমের দিক থেকে সমান হয়ে থাকে কিন্তু বুঝার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা কাউকে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুঝ দান করেন। তাই অন্যের চেয়ে তিনি একটু বেশিই জানেন। তার ইলমের আধিক্যতা ও প্রবল বুঝ থাকার কারণে অন্যের চেয়ে তিনি সঠিকতার অধিক নিকটে অবস্থান করেন। অপরদিকে, দু'জন আলিমের মাঝে মতভেদ দেখা দিলে ফাতাওয়া জানতে আগ্রহী ব্যক্তি যাকে ইলম, আল্লাহভীরুতা ও ধার্মিকতার দিক থেকে অধিক সঠিক মনে করবেন তার নিকট থেকেই তিনি ফাতওয়া জেনে নিবেন। যেমন মানুষ অসুস্থ হলে দু'জন চিকিৎসকের মধ্যে রোগী যাকে অধিক অভিজ্ঞ মনে করে সে তার কাছ থেকেই চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে থাকে। তেমনি দু'জন মুফতি যদি যোগ্যতার দিক থেকে সমান হয়ে থাকেন কাউকে প্রধান্য দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন একজনের তার কাছে থেকে ফাতওয়া গ্রহণ করতে হবে।

১০১. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, আলিমদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করে যেসব শিক্ষার্থী তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে ঐসব শিক্ষার্থীর ব্যাপারে আপনার উপদেশ কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নিঃসন্দেহে আলিমগণ ভুল করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হয়। তাদের কেউ ত্রুটি মুক্ত নয়। তাদের ভুল-ত্রুটিকে অপবাদ হিসাবে নির্ধারণ করা উচিত নয়, বৈধ নয়। কারণ সঠিক বিষয়ে উপনিত

---

[৮৩] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/৭৭০, ইবনে মাজাহ হা/১৩০৭, সুনানে নাসাঈ হা/১৬২৫, আবূ দাউদ হা/৭৬৭।

হতে না পারলে বৈশিষ্ট্যগতভাবে মানুষ ভুল করে। কোন আলিম অথবা দাঈ অথবা কোন মাসজিদের ইমামের ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতি এ দোষ আরোপ করা হতে বিরত থাকতে হবে। কেননা, কখনো বর্ণনা করা অথবা বুঝের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি ঘটে থাকে অথবা যার নিকট হতে তিনি শুনেছেন তা শ্রবণের ক্ষেত্রেও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটতে পারে। তাই সর্বাবস্থায় কোন আলিম অথবা দাঈ অথবা কোন মাসজিদের ইমাম অথবা কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ভুল-ত্রুটির কথা শুনেই তা তাদের প্রতি আরোপ করা ঠিক নয়। ঐ ত্রুটি সম্পর্কে জানতে হবে যে, আসলেই তার মাধ্যমে তা ঘটেছে কি না। তাদের কারো ত্রুটি হয়ে থাকলে যা ভুল মনে করা হয়েছে তা স্পষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হবে, ভুল প্রমাণিত হলে তিনি সংশোধন করে নিবেন অথবা যা ভুল মনে করা হতো তা ভুল নয় বরং সঠিক বলে বিবেচিত। অতঃপর ঐ আলিমের কথার তাৎপর্য স্পষ্ট হলে আমরা যা বিশৃঙ্খলা মনে করতাম তা বিশেষত যুব শ্রেণী থেকে দূরিভুত হবে।

আর কোন কথা শুনার পর তা বলার ব্যাপারে সংযত হওয়া, উপদেশ গ্রহণ করা এবং যা বর্ণনা করা হয়েছে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা যুব শ্রেণী এবং অন্যদের উপর ওয়াজীব। কোন সমাবেশ বিশেষত জন সমাবেশে কোন কথা প্রসঙ্গে এভাবে বলা যে, অমুকের ব্যাপারে তুমি কি বলো? যে অন্যেদের কথার বিরোধীতা করে তুমি তার সম্পর্কে কি বলো? এ ধরনের প্রশ্ন তুলে সাধারণত কথা ছড়িয়ে দেয়া ঠিক না। এভাবে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তাই জিহবাকে সংযত করা ওয়াজিব। মুআ'য ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"ألا أخبرك بملاك ذلك كله"؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه، وقال: "كف عليك هذا". قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم".

আমি তোমাকে এসব কাজের নির্যাস সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হাঁ। তিনি তার জিহবা ধরে বলেন, তুমি এটা সংযত রাখো। আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী! আমরা যা কিছু বলি সে জন্য কি পাকড়াও হবো? তিনি বলেন,

হে মুআ'য! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক। মানুষতো তার অসংযত কথাবার্তার কারণে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[৮৪]

শিক্ষার্থীসহ সবাইকে আমি উপদেশ দিবো যে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং আলিম ও আমীরদের বিরোধীতা না করে কারণ তারা জাতিকে পরিচালিত করেন। সাধারণ মানুষের গীবত করা কাবীরাহ গুনাহ আর আলিম-আমীরদের গীবত করা তার চেয়েও মারাত্মক। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে তার ক্রোধ থেকে রক্ষা করুন। আমাদের ভাইদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা দূরিভুত করুন। তিনি অত্যন্ত দয়াশীল।

১০২. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত (التفرق والتحزب) হয় তাদের ব্যাপারে আপনার দিক-নির্দেশনা কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর দীনে বিভক্ত হওয়া নিষিদ্ধ এবং হারাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران:١٠٥] .

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দশনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর আযাব *(সূরা আলে ইমরান ৩:১০৫)*। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [الأنعام:١٥٩] .

নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই। তাদের বিষয়টি তো আল্লাহর নিকট। অতঃপর তারা যা করত, তিনি তাদেরকে সে বিষয়ে অবগত করবেন *(সূরা আল-আনআ'ম ৭:১৫৯)*।

---

[৮৪] তিরমিযী হা/২৬১২, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৭৩।

সুতরাং মুসলিম উম্মাতের জন্য বিভিন্ন দলে বিভক্ত বৈধ নয়। প্রত্যেক দলের রয়েছে ভিন্ন রীতি-পদ্ধতি। সুতরাং একই রীতি-পদ্ধতিতে আল্লাহর দীনের উপর একতাবদ্ধ থাকা ওয়াজিব। আর ঐ মানহাজ-পদ্ধতিই হলো নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ নির্দেশনা, খুলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবীদের পন্থা। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة".

আমার পরে তোমরা আমার সুন্নাত ও হিদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অবশ্যই অবলম্বন করবে, তা দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরবে। অবশ্যই তোমরা বিদআ’ত কাজ পরিহার করবে। কারণ প্রতিটি বিদআ’তই ভ্রষ্টতা।[৮৫]

وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن تتفرق الأمة أحزابًا لكل حزب أمير ومنهج، وأمير الأمة الإسلامية واحد، وأمير كل ناحية واحد، من قِبَل الأمير العام.

বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের পথ নির্দেশ নয়। প্রত্যেক দলের রয়েছে নির্দিষ্ট আমীর ও রীতি-পদ্ধতি। অথচ মুসলিম উম্মাতের আমীর একটাই। সব দিক হতে সাধারণ আমীর-শাসক একজনই।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে আমীর নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, মুসাফিরগণ তাদের গ্রাম ও শহর ছেড়ে প্রবাসী হয়েছেন সেখানেও সাধারণ আমীরের দিক হতে তাদের আমীর রয়েছে। কখনো এমন সমস্যা সৃষ্টি হয় যে, গ্রাম ও শহর পৌঁছতে তাদের দেরী হয়ে যায় অথবা এমন ছোট ছোট সমস্যা যা শহর-গ্রামের আমীরদের নিকট তুলে ধরা সম্ভব নয়। যেমন: কোন জায়গায় বসবাস করা, দূরে গমন করা, ভ্রমণের জন্য অনুমতি প্রদান করা অথবা বিরত থাকা অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। সুতরাং এসব সমস্যা সমাধানের জন্য এক্ষেত্রে মুসাফিরগণ একজন আমীরের শরণাপন্ন হলে তা হবে প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ।

---

[৮৫] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৬৯৭, তিরমিযী হা/২৬৭৬, ইবনে মাজাহ হা/৪২-৪৪, মেশকাত হা/১৬৫।

মূলত উম্মাতের জন্য আমার উপদেশ হচ্ছে তারা দীনের উপর একতাবদ্ধ থাকবে বিচ্ছিন্ন হবে না। কোন ব্যক্তি অথবা দলকে দীন হতে বের হতে দেখলে তারা তাদেরকে নসিহত করবে। তাদের সামনে হক্ব তুলে ধরবে আর দীনের বিরোধীতার ব্যাপারে সতর্ক করবে।

আরো বর্ণনা করবে যে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেয়ে হক্বের উপর একতাবদ্ধ থাকা সঠিক ও কল্যাণের কাছাকাছি পৌঁছা যায়। আর অনুমোদিত ইজতেহাদ সম্পর্কে যখন কোন মতানৈক্য দেখবে তখন ভিন্ন মতের অনুসারীদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখবে এ কারণে মতবিরোধে লিপ্ত হবে না। কেননা, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছাহাবীগণ ও তার পরবর্তীদের মাঝে ইজতেহাদ নিয়ে দ্বন্দ্ব হতো অথচ তাদের মাঝে আন্তরিক মনো মালিন্য ও বিচ্ছিন্নতা ছিল না। আমাদের মাঝে তাদের আদর্শ থাকা উচিত। যে পন্থায় পূর্ববর্তীগণ সংশোধন হয়েছেন ঐ পন্থায় মুসলিম উম্মাতেকে সংশোধন হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা যা পছন্দ করেন এবং যে বিষয়ে সন্তুষ্ট হন তিনি যেন আমাদেরকে তা পালন করার তাওফীক দান করেন।

১০৩. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, জনসাধারণ এবং যারা ইলম অর্জনে সক্ষম নন তাদের উপর করণীয় কি?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যাদের জ্ঞান নেই এবং ইজতেহাদে সক্ষমতাও নেই বিদ্বানদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা তাদের উপর ওয়াজীব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: ٧] .

সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৭)।

বুঝা যায়, আলিমদের কথা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই হলো তাক্বলীদ। কিন্তু তাক্বলিদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ আবশ্যক মনে করে সর্বাবস্থায় ঐ মাযহাবের রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং মাযহাবের রীতি দলীল বিরোধী হলেও এ মাযহাবীয় রীতি আল্লাহরই বিধান বলে বিশ্বাস করা নিষিদ্ধ। অপরপক্ষে, যারা ইজতেহাদে সক্ষম যেমন: ইলমের পূর্ণতা আছে এমন শিক্ষার্থী দলীল নিয়ে ইজতেহাদ করতে পারবে এবং সঠিক অথবা সঠিকের অধিক নিকটবর্তী যা কিছু বুঝতে সক্ষম হবে তা গ্রহণ করবে। আর হক্বের ক্ষেত্রে ইলমের গভীরতা, দীনদারিতা ও ধার্মিকতার দিক হতে

জনসাধারণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা যাকে অধিক সঠিক বলে মনে করবে তারা ঐ আলিমের অনুসরণ করবে।

১০৪. শাইখের নিকট প্রশ্ন হচ্ছে, শারঈ জ্ঞানের শিক্ষার্থীরা ছাহাবীদের কথাকে উছুল মনে করে সে দিকে ধাবিত হয়, এটা দলীল হিসাবে কি আমলযোগ্য?

জবাবে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নিঃসন্দেহে ছাহাবীদের কথা অন্যের চেয়ে সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী। তাদের কথা দু'টি শর্তসাপেক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

প্রথম: তাদের কথা আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ বিরোধী হবে না।

দ্বিতীয়: অন্য ছাহাবীদের কথার বিরোধী হবে না।

যদি তাদের কথা কিতাব-সুন্নাহর বিরোধী হয় তাহলে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহই হবে দলীল। আর ছাহাবীদের ত্রুটি ক্ষমাযোগ্য। অন্যদিকে, কোন ছাহাবীর কথা অন্য ছাহাবীর কথার বিরোধী হলে উভয়ের কথার মাঝে প্রাধাণ্যতা খুঁজতে হবে। যার কথা অগ্রগণ্য বলে মনে হবে তার অনুসরণ হবে যথাযথ। আর কথার প্রাধাণ্যতা বুঝার নিয়ম হলো ছাহাবীদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া অথবা শরী'আতের সাধারণ কাওয়ায়েদ অথবা অনুরূপ নিয়মের সাথে তাদের কথার মিল থাকা। এ হুকুম কি সকল ছাহাবীর জন্য আম-সাধারণ হিসাবে গণ্য নাকি তা খুলাফায়ে রাশেদীনের অথবা আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর সাথে নির্দিষ্ট। নিঃসন্দেহে আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর কথা উক্ত দু'টি শর্তের আলোকে দলীলযোগ্য। অন্যদের চেয়ে তাদের কথা অগ্রগণ্য। আবার উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর চেয়ে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কথা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। হুযাইফা ইবনে ইয়ামান হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر".

আমার পরে আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর অনুসরণ করো।[৮৬]

আবূ ক্বাতাদা হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

[৮৬] হুলইয়াতুল আওলীয়া ও ত্ববাক্বাতুল আছফিয়া পৃ:১০৯।

"فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا".

যদি তোমরা আবূ বকর ও উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর আনুগত্য করো তাহলে তারা পথ দেখাবে।[৮৭]

ছ্বহীহ বুখারীর باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه নামক অধ্যায়ে উমার ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

هما المرءان يُقتدى بهما،

তাদের দু’জনের (রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবূ বকরের) আনুগত্য করতে হবে।[৮৮]

অবশিষ্ট খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, সুনান ও মাসনাদে উল্লেখ করা হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ".

আমার এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা তোমাদের উপর আবশ্যক। মাড়ির দাঁত দিয়ে তোমরা তা কামড়ে ধরো।[৮৯]

গুণাবলীর দিক থেকে চারজন খলীফা উত্তম। তাদের কথা দলীল হিসাবে স্বীকৃত। অন্যদিকে, অবশিষ্ট ছাহাবীগণের মধ্যে যারা ইলমের দিক থেকে সুপ্রসিদ্ধ এবং দীর্ঘকাল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহচর্য লাভ করেছেন তাদের কথা দলীল হিসাবে গণ্য। আর যারা এরূপ নয় তাদের কথা চিন্তা-ভাবনা করে গ্রহণ করতে হবে। ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) তার কিতাবের শুরু "إعلام الموقعين" এ উল্লেখ করেন। ইমামের ফাতওয়া পাঁচটি উছুলের উপর গঠিত।

ছাহাবীদের ফাতওয়া, ভিন্নমতের আলিমগণের ফাতওয়া; কিন্তু এখানে প্রধান্য বিস্তারকারী এবং আবশ্যক বিষয় হলো হয়তো ছাহাবীদের ফাতওয়ার সাথে ঐ

[৮৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৮১।
[৮৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২৭৫।
[৮৯] মুসনাদ আহমাদ হা/১৭১৪৫।

আলিমের কথার প্রধান্য বজায় থাকতে হবে নচেৎ তা দলীল বিরোধী বলে গণ্য হবে। (এভাবে যাচাই পূর্বক) প্রধান্যতা বজায় থাকলে ঐ ফাতওয়াদানকারী আলিমের দলীলের উপর আমল করা যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সকলকে হক্বের দাঈ ও সাহায্যেকারী হিসাবে কবুল করে নেন। আর বিশ্বাস, কথা ও কর্মে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক্ব দান করেন। এখানে তিনটি মাসআলা উল্লেখিত হয়েছে:

প্রথম মাসআলা: তোমার নিকট এমন দু'টি কথার প্রধান্যতা স্পষ্ট হয় যার বিপরীতে তুমি ফাতওয়া দিয়েছো অথবা ফায়ছালা গ্রহণ করেছো। যে ব্যাপারে ফাতওয়া অথবা ফায়ছালা দেয়া হয়েছে তা থেকে তোমার প্রত্যাবর্তন করা বৈধতা আছে কি না।

দ্বিতীয় মাসআলা: তোমার নিকট যে দু'টি কথার প্রধান্যতা স্পষ্ট হয় যার বিপরীতে তুমি ফাতওয়া দিয়েছো অথবা ফায়ছালা গ্রহণ করেছো। যে ব্যাপারে প্রধান্যতা স্পষ্ট হয় ভবিষ্যতে সে বিষয়ে তোমরা ফাতওয়া দেয়া অথবা ফায়ছালা গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না।

তৃতীয় মাসআলা: কোন ব্যক্তির দু'টি কথার একটি দ্বারা এবং অন্য লোকের দ্বিতীয় কথার মাধ্যমে মতভেদপূর্ণ মাসআ'লায় ফাতওয়া দেয়া বৈধ হবে কি।

আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে এবং তার তাওফীক্বে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার জবাব নিম্নে তুলে ধরা হলো, আমরা আল্লাহর নিকট হিদায়াত ও সঠিক ফায়ছালা কামনা করি।

প্রথম মাসআলা: মানুষ যে রায়-সিদ্ধান্তের উপর বহাল ছিল তা দুর্বল বলে স্পষ্ট হলে এবং অন্যের মাঝে হক্ব পাওয়া গেলে দুর্বল রায় বর্জন করত ছ্বহীহ দলীল অনুসারে যা সঠিক মনে হয় তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব। আর আল্লাহর কিতাব, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর অনুসরণ, খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতি, মুসলিমদের ইজমা ও ইমামগণের আমলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব প্রমাণিত। আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে দলীল হলো,

{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}
[الشورى:١٠] .

যে বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর না কেন, তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব; তারই ওপর আমি তাওয়াক্কুল করি এবং তারই অভিমুখী হই (সূরা আশ শূরা ৪২:১০)।

মাসআলায় মতভেদ দেখা দিলে আল্লাহর কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: ٥٩]

কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর *(সূরা আন নিসা ৪:৫৯)*। তিনি আরো বলেন,

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥] .

যে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাবো যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাবো জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ *(সূরা আন-নিসা ৪:১১৫)*।

সুতরাং বুঝা গেল, কিতাব ও সুন্নাহ হতে যা কিছু প্রমাণিত হয় সে দিকেই প্রত্যাবর্তন করা মুমিনদের পন্থা। সুন্নাহ দলীল সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"إنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي".

তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে, তাই আমার পরে আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করা তোমাদের উপর ওয়াজিব।[৯০] এ হাদীছের অর্থ নিয়ে কিছু কথা আছে,

খুলাফায়ে রাশেদীনের কথা: তাদের মধ্যে আমীরুল মুমিনিন উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কথা প্রসিদ্ধ। স্বামী, মাতা ও বৈপিত্রিয় ভাইয়ের জন্য আছাবাহ হিসাবে তিনি মিরাছ নির্ধারণ করেছেন। কখনো রেখে যাওয়া সম্পদে পরিপূর্ণভাবে তাদেরকে মিরাছে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের অংশীদারিত্বের সাথে বৈপিত্রিয় ভাইয়ের অংশ নির্ধারণ করেছেন জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি প্রথম বছরে বৈপিত্রিয়ের মিরাছের ব্যাপারে অন্যরকম ফায়ছালা করেছি, আপনি কিভাবে ফায়ছালা করলেন, তিনি বলেন, আমি বৈপিত্রিয় ভাইয়ের জন্য মিরাছ নির্ধারণ করেছি, অথচ তুমি সহোদর ভাইয়ের জন্য কিছুই নির্ধারণ করোনি। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা এভাবেই ফায়ছালা করে থাকি। ইবনু আবি শাইবা **১১/২৫৩**।

كتاب لأبي موسى في القضاء -এ তিনি বলেন, আজকে তুমি যে ফায়ছালা করবে তাতে যেন কোন কিছু তোমাকে বাধা না দেয়, তোমার রায়-সিদ্ধান্ত নিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে তাহলে ঐ রায় অনুযায়ী হক্বের পথ খুঁজে পাবে। আর বাতিলে পড়ে থাকার চেয়ে হক্ব নিয়ে পর্যালোচনা করা উত্তম।

ইজমা: এ সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুসলিমগণের ইজমা হয়েছে যে, যার নিকট রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ স্পষ্ট হয়েছে কোন মানুষের কথা গ্রহণ করা তার জন্য উচিত নয়।

ইমামদের আমল: ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) কোন বলার পর তার বিপরীতও বলেছেন, এ ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টভাবেই তার কথা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যেমন মদ পানকারী ব্যক্তির তালাক্ব পতিত হওয়ার কথা থেকে তিনি ফিরে এসেছেন। কখনো তার শিষ্যরাও স্পষ্টভাবে তার কথা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যেমন ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) খিলাল করার কথা থেকে স্পষ্টতঃ প্রত্যাবিতন করেছেন। যে লোক মুক্বিম অবস্থায় মোজার উপর মাসাহ করে সফর করলো, তাহলে মুক্বিম অবস্থায় তার মাসাহ পূর্ণ হলে সফর অবস্থায়ও মাসাহ পূর্ণ

[৯০] প্রাগুক্ত।

হবে। আবার কখনো তিনি তার কথা থেকে প্রত্যাবর্তন করেননি। এক্ষেত্রে তার মাসআলায় দু’টি কথা আছে:

এখানে গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হলো প্রথম রায়-সিদ্ধান্ত দুর্বল বলে স্পষ্ট হলে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব। প্রথম হুকুম ভঙ্গ করা তার জন্য বৈধ। তবে যাকে ফাতওয়া দেয়া হয়েছে তার জন্য প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক নয়। উভয় রায়-সিদ্ধান্ত ইজতেহাদ ভিত্তিক। ইজতেহাদ যথাযথ হলে তা ভঙ্গ করার দরকার নেই। আর প্রথম ইজতেহাদে ভুল প্রকাশ হলে দ্বিতীয়টিতে ভুল না থাকার অন্তরায় নেই তথা ভুল থাকা সম্ভব। আবার কখনো এমন হয় যে, বাস্তবে প্রথম ইজতেহাদই সঠিক যদিও তা বাহ্যিকভাবে বিপরীত মনে হয়। তবে প্রথম-দ্বিতীয় কোন ইজতেহাদেই মানুষ ক্রটি মুক্ত নয়।

দ্বিতীয় মাসআলা: প্রথম মাসআলার জবাব থেকেই এর জবাব জেনে নিতে হবে। আর তা হলো হক্ব স্পষ্ট হলে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা মানুষের উপর ওয়াজিব। যদিও পূর্বে ঐ হক্বের বিপরীত ফাতওয়া দেয়া হয়েছে অথবা ফায়ছালা গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয় মাসআলা: যদি মাসআলা সম্পর্কে নছ (দলীল) থাকে। তাহলে তা গ্রহণের ব্যাপারে সবাই সমান, এতে ব্যক্তিভেদে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবে না। অপর দিকে, ইজতেহাদ বিষয়ক মাসআলা ইজতেহাদের উপরই গঠিত। যদিও ইজতেহাদ হয় কোন বিষয়ের হুকুম অথবা অনুরূপ ক্ষেত্র নিয়ে। এজন্য আমীরুল মুমিনিন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন দেখলেন, মানুষের মাঝে মদপান বেড়ে গেছে তখন মদপানের শাস্তিও তিনি বৃদ্ধি করলেন। আর যখন দেখলেন তিন তালাক্বের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখছে না তখন তিনি জনগণের উপর আইন কার্যকর করলেন। যাতে আল্লাহর কালাম ও রসূলের সুন্নাহ শক্তিশালী হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ}

ইয়াহূদীদের উপর আমি নখবিশিষ্ট সব জন্তু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের উপরে হারাম করেছিলাম- তবে যা এগুলোর পিঠে ও ভুঁড়িতে থাকে, কিংবা যা কোন হাড়ের সাথে লেগে থাকে, তা ব্যতীত। এটি

তাদেরকে প্রতিফল দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার কারণে। আর নিশ্চয় আমি সত্যবাদী *(সূরা আল-আনআ’ম ৬:১৪৬)*।

সুতরাং বুঝা গেল, আল্লাহ তা‘আলা তাদের অবস্থার চাহিদা অনুসারে তাদের সাথে আচরণ করেছেন এবং তাদের সীমালঙ্ঘন ও যুলুমের কারণে তিনি পবিত্র জিনিস হারাম করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا}

ইয়াহূদীদের যুলমের কারণে আমি তাদের উপর উত্তম খাবারগুলো হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে অনেককে তাদের বাধা প্রদানের কারণে *(সূরা আন-নিসা ৪:১৬০)*।

মদপানকারীর উপর তিনবার শাস্তি পূনরাবৃত্তি হওয়ার পর চতুর্থবার হত্যা করার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মদপানকারীকে হত্যা করার শাস্তি বাস্তবে ধার্য না হওয়ায় তাদের মূলৎপাটন করা হয়নি। তাই যিনি ফাতওয়া চাইবেন অথবা যার উপর ফায়সালা আরোপ করা হবে তার চাহিদা অনুসারে তার সাথে নির্দিষ্ট আচরণ বজায় রাখতে হবে যাতে তা দলীল বিরোধী না হয়।

অনুরূপভাবে কোন বিষয় আপতিত হলে দু’জনের একজনের কথায় ফাতওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিলে এবং দ্বিতীয় কথার মাধ্যমে ফাতওয়া প্রদান করলে অসুবিধা নেই। এ বিষয়টি হাজ্জ অথবা উমরায় উযূ ছাড়া তাওয়াফ করার মতই। মক্কা থেকে দূরে অথবা অন্য কোন কারণে তাওয়াফ কষ্টকর হয়। এক্ষেত্রে সঠিক মতামতের উপর ভিত্তি করে উযূর শর্ত ছাড়াই তাওয়াফ বিশুদ্ধ হওয়ার ফাতওয়া দিতে হবে। আমাদের শাইখ আব্দুর রহমান সা‘দী (রহিমাহুল্লাহ) মাঝে মধ্যে এমনটা করতেন। তিনি আমাকে বলেন, هناك فرق بين من فعل ومن سيفعل وبين ما وقع وما لم يقع. যারা এ নিয়ম পালন করেন এবং শীঘ্রই করবেন আর যা কিছু ঘটেছে এবং ঘটেনি তার মাঝে পার্থক্য নিহিত আছে।

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) এর মাজমুআ’র মুকাদ্দামায় ছাইমিরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যখন মুফতি দেখবে যে, ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপে কল্যাণ নিহিত আছে এবং যার ব্যাপারে ফাতওয়া দেয়া হবে সে বাহ্যিকভাবে বিশ্বাসী নয় এবং তার বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ এ ক্ষেত্রে মুফতির কঠোরতা আরোপ করা বৈধ।

যেমন ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তাকে হত্যাকারীর তাওবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তার কোন তাওবাহ নেই। অন্যজন তাকে আবার জিজ্ঞেস করে তাওবাহ আছে কি না তিনি বলেন, তার তাওবাহ আছে। অতঃপর তিনি বলেন, আমি প্রথম জনের চোখে হত্যাকান্ড পূনরাবৃত্তির ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম। তার জন্য তাওবাহ নেই একথা বলে তার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করছিলাম। আর দ্বিতীয় জন তাওবার আশাবাদী হয়ে এসেছিলো তাই আমি তাকে নিরাশ করিনি।

আর আমি যা কিছু উল্লেখ করলাম তা সব ক্ষেত্রে নিয়মিত হয় না। রেখে যাওয়া সম্পত্তি বেশি হওয়ায় কোন কাযী অথবা মুফতি যদি উক্ত আছাবাদেরকে অভাবী মনে করে কোন কথার মাধ্যমে দাদার সাথে ভাইয়ের মিরাছ নির্ধারণ করতে চাইতেন অথবা সম্পদ কম থাকায় তারা ধনী হওয়ায় তাদের মিরাছ নির্ধারণ না করার ইচ্ছা করতেন (বাহ্যিকতা ও অনুমানের কারণে) তাহলে উভয় সিদ্ধান্ত বৈধ হতো না। কারণ এখানে অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভবনা আছে। এতে শারঈ অনুমতি নেই। কথা, কর্ম ও বিশ্বাসে আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট হিদায়াত কামনা করি যাতে সঠিক পথ খুঁজে পাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ

ইলম অর্জনে আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী।

প্রথম আনুষঙ্গিক বিষয়:

১. ইলম অর্জনে কতিপয় বিষয় শিক্ষার্থীর খেয়াল রাখা আবশ্যক।

প্রথমঃ ইলমুন নাহু (ব্যাকরণ) বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হলে সংক্ষিপ্ত মূল পাঠ মুখস্থ করতে হবে। আমি মনে করি, এ বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য **متن الآجرومية** সবচেয়ে ভাল। কেননা, এটা স্পষ্ট, পরিপূরক ও সংক্ষিপ্ত পুস্তক। তাতে বরকত রয়েছে। অতঃপর **متن ألفية ابن مالك** নামক ব্যাকরণের পুস্তকটি ভাল। কেননা, এটা ইলমুন নাহুর সারসংক্ষেপ। যেমন তিনি বলেন,

أحصي من الكفاية الخلاصه ... كما اقتضى غنًى بلا خصاصه

ফিক্বহ বিষয়ের কিতাবসমূহের মধ্যে زاد المستنقع ভাল। কেননা, কিতাবটি ব্যাখা, টিকা-টিপ্পনী সম্বলিত ও পাঠদানের জন্য উপযুক্ত। যদিও কিছু কিতাবের মূলপাঠ এর চেয়ে ভাল। তবে এ কিতাবটিতে অনেক মাসআলা সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ জন্য এটিই ভাল কিতাব হিসাবে গণ্য।

অপর দিকে হাদীছের কিতাবের মধ্যে উমদাতুল আহকাম عمدة الأحكام অন্যতম। তারপর এর চেয়ে 'বুলগুল মারাম' **بلوغ المرام** আরো ভাল। দু'টির মধ্যে কোনটি ভাল এ কথার জবাবে বলা হবে, বুলুগুল মারামই উত্তম। কেননা, এখানে অনেক হাদীছের সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ কিতাবে ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছের স্তর বর্ণনা করেছেন।

আর তাওহীদের কিতাবের মধ্যে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব এর **'কিতাবুত তাওহীদ' كتاب التوحيد** নামক বইটি উত্তম যা আমরা পড়ি।

আর তাওহীদ আল-আসমা ওয়াছ ছিফাত সম্পর্কিত বইয়ের মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা রচিত **‘আল-আক্বীদা ওয়াল ওয়াসিত্বীয়া’** العقيدة الواسطية বইটি উত্তম। এটি একটি পরিপূরক, উপকারী বরকতপূর্ণ বই। বইটিতে আক্বীদার প্রত্যেক বিষয় যা গ্রহণীয় তা সংক্ষিপ্ত পাঠে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়: খুব দীর্ঘ আলোচনায় নিমগ্ন না হওয়া।

শিক্ষার্থীর জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই প্রথমত সংক্ষিপ্ত পাঠ গ্রহণ করা শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক। যাতে স্মৃতিপটে তা ধারণ করে রাখতে পারে। তারপর দীর্ঘ আলোচনার দিকে ধাবিত হবে। কিন্তু কতিপয় শিক্ষার্থীকে দেখা যায়, তারা গভীর অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকে। আর কোন সমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে তথ্য সূত্র উপস্থাপন করে তারা বলে: মুগনি প্রণেতা বলেন, মাজমূ‘উ প্রণেতা বলেন, আল-ইনছাফ প্রণেতা বলেন ও আল হাবী-প্রণেতা বলেন ইত্যাদি। এভাবে বলার মাধ্যমে তারা তাদের অধ্যয়নের গভীরতা প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু এটা ভুল। এ ব্যাপারে আমরা শিক্ষার্থীদেরকে বলবো, আগে তোমরা সংক্ষিপ্ত পাঠ শিখো যাতে তা তোমাদের স্মৃতিপটে গেথে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ হলে তোমরা দীর্ঘ আলোচনায় নিমগ্ন হতে পারো। বোধগম্যতার বিষয় হচ্ছে এটাই, যে ব্যক্তি সাঁতার কাটতে জানে না, গভীর সমুদ্রে সাঁতার কাটতে যাওয়া তার উচিত নয়। কেননা, সমুদ্রে ডুবে যাওয়া থেকে তার বিশ্বাস তাকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়।

তৃতীয়: **বিনা কারণে সংক্ষিপ্ত পাঠ গ্রহণ করা ছেড়ে দিয়ে অন্য পাঠের দিকে ধাবিত হওয়াতে বিরক্তিবোধ হতে পারে।**

এটা শিক্ষার্থীর বিদ্যার্জনে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা সৃষ্টি করে এবং একই সাথে সময় বিনষ্ট হয়। তাই প্রত্যেক দিন একটি করে কিতাব পড়া ভুল; যা বিদ্যার্জন পদ্ধতি বিরোধী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কোন বিষয়ের কিতাব পড়লে ঐ বিষয়ে লেগে থাকা ভাল। আর এটা ধারণা করা ঠিক নয় যে, আমি একটা কিতাব পড়ে শেষ করবো অথবা কিতাবের একটা পরিচ্ছেদ পড়বো। অতঃপর দেখা গেল, সে অন্যমনস্ক হয়েছে। এভাবে (এলোমেলো) পাঠ করার কারণেই সময় বিনষ্ট হয়।

চতুর্থ: কোন কিছুর উপকারীতা গ্রহণ করা এবং জ্ঞানগত বিষয় মনে রাখা।

এখানে ঐসব অজ্ঞাত বিষয়ের উপকারীতা সম্পর্কে বলা হচ্ছে যা এমনিতেই স্মৃতিপটে আসে না অথবা যার আলোচনা উপস্থান বিরল অথবা যে বিষয় নিয়ে নতুনভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। এসব বিষয়ে জেনে তার উপকারীতা গ্রহণ

করতে হবে। আর এটা লিখনীর সাথে সম্পর্কিত। তাই এ ব্যাপারে বলা ঠিক নয় যে, এসব আমার জানা আছে। এসবে সীমাবদ্ধ থাকার দরকার নেই। কারণ তা তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর এটাও বলবে না, অনেক মানুষ এসবের উপকারীতা গ্রহণ করে এবং বলে এটাতো সহজ সাধ্য বিষয়; এর আলোচনার দরকার নেই। অতঃপর সে অন্তবর্তীকালীন বা কিছু সময় পর তা আর স্মরণ করতে পারে না।

এ কারণে শিক্ষার্থীকে বলি, দুস্প্রাপ্য কিতাব বা নতুন কোন বিষয়ের উপকারীতা গ্রহণে উৎসাহী হও। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) রচিত بدائع الفوائد নামক কিতাবটি উত্তম। এতে ইলম অর্জনের মৌলিক বিষয়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ কিতাবটির মত আলোচনা অন্য কিতাবে পাওয়া দুস্কর। তাই এটি প্রত্যেক বিষয় সম্বলিত কিতাব। কেননা, যখনই কোন বিষয়ের মাসআলা লেখকের দৃষ্টি গোচর হয়েছে অথবা তিনি কোন উপকারীতার কথা শুনেছেন তখন তা এ কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর এ কিতাবে আছে আক্বীদা, ফিক্বহ, হাদীছ, তাফসীর, ইলমুন নাহু এবং বালাগাত ইত্যাদি বিষয়। আর ইলম অর্জনের নিয়ম-নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করত উৎসাহও দেয়া হয়েছে।

আর আহকাম (বিধানবলী) সম্পর্কে আলিমগণ যেসব ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা হচ্ছে এর নিয়ম-নীতি। কারণ ফিক্বহী বিধি-বিধান সম্পর্কিত সকল ব্যাখ্যাই হচ্ছে নীতিমালা হিসেবে গণ্য। কেননা, এ ব্যাখ্যাই হচ্ছে বিধি-বিধানের ভিত্তি। তাই শিক্ষার্থীকে এসব ব্যাখ্যা আয়ত্ব করতে হবে। আমি শুনেছি কতিপয় ভাই এ নিয়ম-নীতিকে চার মাযহাবের সাথে সমন্বিত করে অনুসরণ করে। আমি বলবো, এভাবে কোন দল প্রতিষ্ঠা করা ভাল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন সঠিক ব্যাখ্যা পেলে তা শর্তযুক্ত করে মূলত সব মাযহাবেরই অনুসরণ করা হয়। কেননা, প্রত্যেক ব্যাখ্যার উপর অনেক মাসআলা ভিত্তি করে। তাই ইলম অর্জনের জন্য রয়েছে নিয়ম-নীতি। আর প্রত্যেক নিয়ম অনেক আংশিক বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ পানির পবিত্র হওয়া অথবা না হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হলে বিষয়টি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। তাই বিষয়ে হুকুম অথবা পদ্ধতিগত কারণ রয়েছে। এব্যাপারে এটাও ব্যাখ্যা করা হয় যে, মূল সব সময় মূলই থাকে। তাই পবিত্রতার মাঝে অপবিত্রতার সন্দেহ সৃষ্টি হলে তা পবিত্র বলেই গণ্য হয় অথবা অপবিত্র কোন জিনিসে পবিত্রতার সন্দেহ হলে তা অপবিত্রই ধরে নেয়া হয়। কেননা, মূল সব সময় একই রকম হয়।

আর শিক্ষার্থী উৎসাহিত হয়ে এ বিষয়ে সকল ব্যাখ্যা সংকলন করত সমন্বয় সাধন করে তা সুবিন্যস্ত করবে। অতঃপর ভবিষ্যতে এর উপর ভিত্তি করে আংশিক মাসআলা বের করার প্রচেষ্টা চালাবে। এতে তার নিজের ও অন্যের জন্য বৃহৎ উপকার লাভ হবে।

পঞ্চম: নিজে নিজেই ইলমের সন্ধান করা।

ইলম অর্জনে ডানে বামে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে না। তুমি নিজেই ইলম অর্জন করবে যতক্ষণ পরিতুষ্ট থাকবে। কেননা, এটাই তোমার জন্য হবে পদ্ধতি ও পন্থা। আর ইলম অর্জনে তুমি অগ্রগতি লাভ করলেও তাতে নিরব থাকবে না। মাসআলা ও দলীলাদীর ব্যাপারে তোমার অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে। যাতে তুমি ধারাবাহিকভাবে আরো অগ্রসর হতে পারো। কোন মাসআলার ব্যাপারে সাহায্যের প্রয়োজন হলে তোমার বন্ধু ও ভাইদের মধ্যে যারা ঐ মাসআলার সমাধানে বিশস্ত তুমি তাদের শরণাপন্ন হবে। আর এ কথা বলতে লজ্জাবোধ করবে না যে, ‘হে অমুক! কিতাব পর্যালোচনা করে এ মাসআলা বিশ্লেষণে তুমি আমাকে সাহায্যে করো’। কেননা, লজ্জাশীলতার কারণে কেউ ইলম অর্জন করতে পারে না। তাই লজ্জাশীল ও অহংকারী ব্যক্তি ইলম অর্জন করতে পারে না।

দ্বিতীয় আনুষঙ্গিক বিষয়।

শাইখদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করা শিক্ষার্থীর লক্ষ্য উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। এতে যেসব উপকার লাভ হবে নিম্নে তা তুলে ধরা হলো।

১. ইলম অর্জনের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি জেনে নেয়া। অনেক কিতাব অধ্যয়ন করে কোন কথাটি অগ্রগণ্য; এর কারণ কি অথবা কোন কথা দুর্বল; এ দুর্বলতার কারণ কি ইত্যাদি বিষয় জানার চেয়ে শিক্ষকের নিকট এ ব্যাপারে সহজ পদ্ধতি জেনে নেয়া ভাল। শিক্ষার্থীর সামনে অগ্রগণ্য বর্ণনাসহ মাসআলার ব্যাপারে (সমাধান মূলক) দু'টি অথবা তিনটি কথার উপর ভিত্তি করে বিদ্বানগণের মতানৈক্য তিনি পেশ করবেন। এতে থাকবে দলীল-প্রমাণ। তাই সন্দেহ নেই যে, এভাবে জেনে নিয়ে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

২. কোন কিছু দ্রুত জেনে নেয়া। নিজে নিজে কিতাব পড়ে বুঝার চেয়ে কোন শিক্ষার্থী শিক্ষকের সামনে কিতাব পাঠ করলে সে বেশি দ্রুত শিখতে সক্ষম হবে। কেননা, শিক্ষার্থী নিজে কিতাব পাঠ করার সময় এমন জটিল ও দুর্বোধ্য পাঠের মুখোমুখী হয় যা বিশ্লেষণ ও পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন। এতে সময় ও প্রচেষ্টা দু'টোরই দরকার হয়। আবার কখনো শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে ভুল বুঝে আমল করে।

৩. শিক্ষার্থী ও আল্লাহভীরু আলিমদের মাঝে সম্পর্ক বজায় রাখা।

নিজে নিজে কিতাব পাঠ করার চেয়ে আলিমদের সামনে কিতাব পাঠ করা অধিকতর উপকারী ও উত্তম।

তৃতীয় আনুষঙ্গিক বিষয়।

প্রশ্ন করার প্রয়োজন হলেই সুন্দরভাবে প্রশ্ন করবে। প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রশ্ন করবে না। কেননা, নিজের অথবা অন্যের প্রয়োজনে মানুষের প্রশ্ন করা উচিত। এ প্রশ্ন কখনো পাঠ বুঝার ক্ষেত্রে হতে পারে। কিন্তু যদি কোন জটিল মাসআলা সংক্রান্ত প্রশ্ন দেখা দেয় যা সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে বর্ণনা করার দরকার তাহলে অন্যের প্রয়োজনেই যেন এমন প্রশ্ন করা হয়। আর অন্যের প্রয়োজনে প্রশ্ন করা শিক্ষকতার মতই। কেননা, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে ঈমান, ইহসান, ইসলাম ও ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم"

তিনিই হলেন জিবরাঈল যিনি তোমাদেরকে দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছেন।[৯১]

বুঝা গেল, প্রশ্নকারীর প্রয়োজনে উদ্দীপক প্রশ্ন উত্থাপন করলে তা উত্তম। অথবা অন্যের প্রয়োজনে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হলে সেটাও উত্তম ও ভাল। অপরদিকে প্রশ্ন করায় যদি মানুষ বলে, মাশা'আল্লাহ অমুক ব্যক্তি বিদ্যার্জনে উৎসাহী। সে বেশি বেশি প্রশ্ন করে। এমনটা ঘটলে তা ভুল বলে গণ্য হবে। আর এ অবস্থার বিপরীতে যে বলে, প্রশ্ন করতে আমি লজ্জা পাই তাহলে এ ব্যক্তি হবে সীমালঙ্ঘনকারী। কেননা, মধ্যম পন্থার কাজই উত্তম। শিক্ষার্থীর উচিত যে, মনোযোগসহকারে আলিমের জবাব শ্রবন করা এবং তা ভালভাবে বুঝে নেয়া। কতিপয় শিক্ষার্থী প্রশ্ন করে এবং জবাবও পায়, তবে এক্ষেত্রে দেখা যায়, 'আমি বুঝিনি' একথা বলতে তারা লজ্জাবোধ করে। অথচ শিক্ষার্থীর উচিত হচ্ছে, শিষ্টাচারের সাথে একথা বলা যে, "আমি বুঝতে পারিনি"।

---

[৯১] মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯-১০।

চতুর্থ আনুষঙ্গিক বিষয়।

পাঠ আয়ত্বকরণ দু'ভাবে হতে পারে:

প্রথম: প্রকৃতিগত (غريزي) । আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে এটা দান করেন। অনেকের মাঝে দেখা যায়, কোন মাসআলা বা আলোচনা আয়ত্ব করে নিতে পারে, তা ভুলে যায় না।

দ্বিতীয়: অর্জনগত (كسبي)। মানুষ নিজে নিজে চর্চার মাধ্যমে আয়ত্ব করে আর যা কিছু মুখস্থ করে তা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে স্বরণ করতে পারে। এভাবে আয়ত্বকরণ তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

পঞ্চম আনুষঙ্গিক বিষয়।

বিতর্ক ও প্রতিযোগিতা দু'প্রকার (المجادلة والمناظرة نوعان):

প্রথম: বিরোধিতামূলক বিতর্ক (مجادلة مماراة)। নির্বোধেরাই এ তর্কে লিপ্ত হয়, আলিমদেরকে গালি-গালাজ করে এবং তারা তর্কে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে। এ ধরনের তর্ক-বিতর্ক ঘৃণিত-গর্হিত।

দ্বিতীয়: হক্বের উপর অটল থেকে তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে বিতর্ক করা (**مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه**)। এধরনের তর্ক-বিতর্ক প্রশংসিত ও নির্দেশিত। এ প্রকারের নিদর্শন হলো হক্ব কেন্দ্রীক বিতর্ক হওয়া। মানুষের নিকট হক্ব স্পষ্ট হলে পরিতুষ্টি লাভ করত সে হক্বের দিকে প্রত্যাবর্তনের ঘোষনা দেয়। অপরদিকে যারা বিতর্কে জড়িয়ে নিজে বিজয়ী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তাদের নিকট প্রতিপক্ষের হক্ব স্পষ্ট হলেও তারা বিভিন্ন রকম আপত্তিকর কথা বলতে থাকে। যেমন: যদি বক্তা এই কথা বলতো, যখন তাদের এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়, তখন তারা আবার বলে, যদি বক্তা এটা উল্লেখ করতো, একইভাবে জবাব দেয়া হলে, তারা বলে, বক্তা যদি এ বিষয়ে বলতো, আবারও জবাব দেয়া হলে তারা ধারাবাহিকভাবে অজুহাত পেশ করে এভাবে বলতে থাকে যা শেষ হয় না। (ঐ সব নির্বোধ) তার্কিকদের জন্য এটাই বিপজ্জনক যে, তারা হক্ব গ্রহণ করে না। অন্যের সাথে তর্কে প্রমাণিত হক্বকে তারা গ্রহণ করে না। বরং তা বর্জন

করে। আর শয়তান তাদের এসব ভ্রান্ত ইচ্ছার উদ্ভাবন করে। ফলে তাদের মাঝে সন্দেহ এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাই অবশিষ্ট থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الأنعام: ١١٠]

আর আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ পালটে দেব। যেমন তারা কুরআনের প্রতি প্রথমবার ঈমান আনেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাকে ছেড়ে দেব (সূরা আল-আন'আম ৬:১১০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} [المائدة: ٤٩]

অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আক্রান্ত করবেন। আর মানুষের অনেকেই ফাসিক (সূরা আল-মায়িদা ৫:৪৯)।

সুতরাং হে ভাই! অন্যের সাথে বির্তকের মাধ্যমে হক্ব প্রমাণিত হোক অথবা তুমি নিজে থেকেই হক্ব জেনে থাকো তাহলে তোমার উচিত ঐ হক্ব গ্রহণ করা। অতঃপর তোমার কাছে হক্ব স্পষ্ট হলে তুমি বলবে, আমরা শুনলাম, ঈমান আনলাম, আনুগত্য করলাম এবং বিশ্বাস করে নিলাম। এজন্য দেখা যায়, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ে ফায়ছালা করেছেন অথবা তিনি সংবাদ দিয়েছেন ছাহাবীগণ কোন প্রকার ওজর-আপত্তি ছাড়াই তা মেনে নিয়েছেন। মোদ্দা কথা হলো, হক্ব প্রমাণ করা ও বাতিল প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে তর্ক-বিতর্ক উত্তম। বিশেষ করে আমাদের এ যুগে (উত্তম পন্থায়) তর্ক-বিতর্ক চর্চা করা ও শিক্ষা দেয়া ভাল। বর্তমানে অনেক ঝগড়াটে ও বিরোধীতাকারী রয়েছে যাদের কাছে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক কোন বিষয় প্রমাণিত ও স্পষ্ট হলেও তারা ঐ বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এখানে একটি সমস্যা রয়েছে তা হচ্ছে, কতিপয় মানুষ তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে একটি হাদীছ পেশ করে জটিলতার সৃষ্টি করে। হাদীছটি হলো,

"وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًّا".

যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ঘরের জিম্মাদার হবো।[৯২]

ঝগড়া পরিহার করা কেমন? উত্তর হচ্ছেঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের জন্য ঝগড়া ত্যাগ করে আদৌ সে হক্কের উপর নয়। কেননা, এটা হক্বকে পরাজিত করে।

কখনো তার্কিক যা নিয়ে তর্ক করে তা মূলত দীনের সাথে সম্পর্কিত নয়। যেমনঃ তার্কিক বলে, আমি তাকে বাজারে দেখেছি। প্রতিপক্ষ বলে, আমি তাকে মসজিদে দেখেছি। এভাবে উভয় তার্কিকের মাঝে কেবল ঝগড়া-বিবাদ লেগে যায়। এটাই উক্ত হাদীছে উল্লেখিত ঝগড়া নির্দেশ করে।

আর হক্বকে সাহায্যে করার উদ্দেশ্যে যারা তর্ক-বিতর্ক ত্যাগ করে আদৌ তারা হক্কের উপর নয়। তারা উক্ত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে না। (সুতরাং প্রয়োজনে ঝগড়া ত্যাগ করা উচিত নয়)

ষষ্ঠ আনুষঙ্গিক বিষয়।

যে সব বিষয়ে পর্যালোচনা করা শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক তা দু'প্রকারঃ

প্রথমঃ নিজের সাথে পর্যালোচনা করা।

নিজে নিজেই বসে কোন মাসআলা অথবা আলোচিত বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করবে। অতঃপর যে সব কথা পেশ করবে তা স্বরণে রাখার চেষ্টা করবে এবং পরস্পরের মাসআলায় যা বলা হয়েছে তা প্রধান্য দেয়ার চেষ্টা করবে। এটাই শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ পন্থা। আর পূর্ববর্তী বিতর্কিত মাসআলার সহযোগিতা নিবে।

দ্বিতীয়ঃ অন্যের সাথে পর্যালোচনা।

যে সব ভাই ইলম অর্জনে উপকার করবে তাদের সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে। সে তাদের সাথে বসবে এবং পরস্পর পর্যালোচনা করবে। যা মুখস্থ আছে তা দু'জনে মিলে একে অপরকে পাঠ করে শুনাবে। এভাবে সবাই অল্প অল্প করে পরস্পর পাঠ করে শুনাবে অথবা কোন মাসআলা নিয়ে দু'জনে পরস্পর পর্যালোচনা করে বুঝে নিবে। যদি এভাবে তারা আলোচনা করতে সক্ষম হয়। তাহলে তাদের

[৯২] হাসানঃ সুনানে আবূ দাউদ হা/৪৮০০, তিরমিযী হা/১৯৯৩, ইবনে মাজাহ হা/৫১, ছ্বহীহাহ আলবানী হা/২৭৩।

ইলম বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ঝগড়া ও অহংকার থেকে বিরত থাকবে। এসবের দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না।

সপ্তম আনুষঙ্গিক বিষয়।

অন্যের কোন বিষয় সঠিক মনে না করা, প্রশংসা না করতে চাওয়া এবং দাম্ভিকতা দেখানো।

কতিপয় মানুষ এসব মন্দ বিষয়ের পরীক্ষায় পড়ে নিজেকে সঠিক বলে। সে মনে করে যে, কেবল তার বিষয়টিই সঠিক এবং কোন কিছু তার বিপরীত বা অনুরূপ কিছু পেলে সে তা ভুল গণ্য করে। অপরদিকে প্রশ্নের জবাব তার পক্ষে হলে সে প্রশংসা করতে পছন্দ করে। দেখা যায়, লোকেরা তার প্রশংসা করলে সে ফুলে উঠে, তার স্ফীত হওয়া বৃদ্ধি পায় সর্বপরি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, প্রশংসায় যেন সে ফেটেই যাবে। এরূপই সৃষ্টি ও কতিপয় মানুষের প্রতি সে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে। এ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্যে প্রার্থনা করছি। আল্লাহ কাউকে জ্ঞান দান করলে সে তা নিয়ে অহংকার করে, ধনী লোকও কখনো কখনো তার ধন-সম্পদ নিয়ে দাম্ভিকতা দেখায়। এজন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

العائل المستكبر من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم.

আলিমের কাছে ধন-সম্পদ না থাকার কারণে তিনি তা নিয়ে অহংকার করতে পারেন না। কিন্ত আলিমের আচরণ ধনী লোকের মত হওয়া উচিত নয়। তার বিদ্যা-বুদ্ধি বেড়ে গেলে অহংকারও বেড়ে যায়। বরং আচরণ এমন হওয়া উচিত যে, তার ইলম বৃদ্ধি পেলে সাথে সাথে তার বিনয়-নম্রতাও বৃদ্ধি পাবে।

জ্ঞাতব্য যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে চরিত্রের কথা আলিম বর্ণনা করে তার পুরোটাই হক্ব ও সৃষ্টির প্রতি বিনম্র হওয়ার জন্যই নির্ধারিত। কিন্তু যেসব অবস্থায় হক্ব ও সৃষ্টির প্রতি বিনম্রতার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় ঐ ক্ষেত্রে কোনটি প্রধান্য পাবে? হা, এক্ষেত্রে হক্বের প্রতি নম্রতা প্রদর্শনই অগ্রগণ্য। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেউ হক্বকে গালি-গালাজ করে এবং যারা হক্বে নিয়ে আমল করে তাদের সাথে শত্রুতা রেখে উল্লাস করে, আমরা তাদের প্রতি বিনয়ী হবো না। হক্বের জন্যই নম্রতা প্রদর্শন করতে হবে। এ লোকের সাথেই উত্তম

পন্থায় তর্ক করতে হবে যদিও সে অপমান করতে চায় অথবা তোমার ব্যাপারে যেসব কথা বলে তা তুমি গুরুত্ব দিবে না। এক্ষেত্রে হক্বকে সাহায্যে করাই আবশ্যক।

অষ্টম আনুষঙ্গিক বিষয়।

কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে ইলমের পবিত্রতা রক্ষা পায়।

প্রথমঃ ইলম ছড়িয়ে দেয়া।

যেমন ধন-সম্পদ থেকে মানুষ ছাদাক্বাহ করে তেমনই ইলম প্রচার করাই তার যাকাত-ছাদাক্বাহ। তাই আলিম তার ইলম প্রচারের মাধ্যমে ছাদাক্বাহ করে। আর ইলমের ছাদাক্বাহ হয় চিরস্থায়ী যা সর্বদাই সঞ্চিত থাকে। কখনো আলিমের কাছ থেকে শুনা যায় যে, সর্বসাধারণ ইলম থেকে উপকৃত হয়। যেমন আমরা এখন আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছ সমূহ থেকে সর্বদাই উপকৃত হই। আর আমরা... অনুরূপভাবে আলিম সমাজ তাদের রেখে যাওয়া কিতাব থেকে উপকৃত হয়। একারণে তাদের সাথে রয়েছে যাকাত আর এটা সেই যাকাত যা প্রদানে ইলমের কমতি হয় না বরং বৃদ্ধি পায়। যেমন বলা হয়,

يزيده بكثرة الإنفاق منه ... وينقص إن به كفًّا شددت

একে বাড়িয়ে দেয় অধিক পরিমাণে এর ব্যয়
আর কমে যায় যদি আমি মজবুত করে একে আকড়ে রাখি।

দ্বিতীয়ঃ ইলম অনুযায়ী আমল করা।

ইলম অনুযায়ী আমল করলে নিঃসন্দেহে তার দিকে দাও'য়াত দেয়া যায়। আলিমের কথার চেয়ে তার চরিত্র ও আমলের দিক থেকে অনেক মানুষ বেশি প্রভাবিত হয়। নিঃসন্দেহে এটাই ইলমের যাকাত।

তৃতীয়ঃ হক্ব প্রচার করা।

এটাও ইলম প্রকাশ করার একটি মাধ্যম। ইলম কখনো অনূকুল পরিবেশ ও নিরাপদ অবস্থায় প্রচার করা হয় এবং কখনো প্রচার হয় ভীতিজনক অবস্থায়। উভয় অবস্থায় হক্বের প্রচার হয়।

চতুর্থ: সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা।

নিঃসন্দেহে একাজ ইলমের যাকাত হিসেবে গণ্য। কেননা, সৎকাজের আদেশদাতা এবং অসৎ কাজের নিষেধকারী এ কাজের কারণে পরিচিতি লাভ করেন। অতঃপর সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের জন্য আবশ্যকীয় ভাবে তিনি এর উপর অটল থাকেন।

নবম আনুষঙ্গিক বিষয়

সন্দেহ ও আলিমগণের ভুলের ব্যাপারে শিক্ষার্থীর অবস্থান।

এখানে রয়েছে দু’টি পদক্ষেপ।

প্রথম: ভুল সংশোধন করে নেয়া।

এটি আবশ্যক যে, কোন বিষয়ে মানুষের সংশয় রয়েছে, এমনটা জানতে পারলে তা সংশোধন করে দেয়া কর্তব্য। যদিও বড় আলিমের মাঝে এ সংশয় সৃষ্টি এবং ভুল পরিলক্ষিত হয় তাকেও এ ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে। কারণ হক্বের বর্ণনা করা ওয়াজীব। আর বাতিল কথাবার্তা যারা বলে নিরব ভূমিকায় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার কারণে হয়তো হক্ব বিনষ্ট হবে। কেননা, হক্বের সম্মান করাই বিবেচ্য। প্রশ্ন হলো অনুমান নির্ভর কথা ও ভুল বিষয় ব্যক্ত কারী অথবা মানুষের ধারণামূলক কথা যে ব্যক্ত করে বলে, তিনি এরূপ এরূপ বলেছেন, ঐ ব্যক্তকারীর জন্য কি কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে?

এর জবাব হলো, এখানে কল্যাণমূলক বিষয়ের চাহিদার দিকে খেয়াল করতে হবে। কখনো কল্যাণমূলক বিষয় যদি ব্যাখ্যা না করা হয়। যেমন সমকালীন যুগে বিশস্ত জনপ্রিয় প্রসিদ্ধ আলিম সম্পর্কে যদি কথা বলা হয় যে, সে বলে, অমুক অমুক লোক একথা বলেছেন, তাহলে এটা ভুল। কেননা, জনসাধারণ তার কথা গ্রহণ করবে না। বরং হেয় প্রতিপন্ন করবে এবং তারা হক্ব গ্রহণ করবে না। তাই এ অবস্থায় বলা উচিত যে, “বক্তার এরূপ এরূপ বলা ভুল”। এক্ষেত্রে নাম উল্লেখ করবে না। যে লোক আন্দাজে কথা বলে, অল্প সংখ্যক মানুষ তার অনুসরণ করে। ফলত সমাজে তার মূল্যায়ন থাকে না। এক্ষেত্রে তার কথাকে স্পষ্ট করতে হবে। মানুষ যেন তার কথায় প্ররোচিত না হয়। এক্ষেত্রে বলবে, অমুক এরূপ এরূপ বলেছে যা ভুল।

দ্বিতীয়: বাতিল হতে হক্ব বর্ণনার জন্য নয় বরং দোষ-ক্রটি বর্ণনার উদ্দেশ্যে ভুল ধরা।

হিংসুক মানুষের মাধ্যমেই এটা হয়। হিংসুক কোন ব্যক্তির দুর্বল কথাবার্তা অথবা ভুল খোঁজ করতে চায়। অতঃপর তা মানুষের মাঝে প্রকাশ করে দেয়। এ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এজন্য বিদ'আত পন্থীরা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে নানা কথা বলে, তারা মনে করে তার মাধ্যমে কোন বিষয়ে তাড়াতাড়ি ফিতনা ছড়ানো সম্ভব (নাউযুবিল্লাহ)। বিদ'আতীরা তার দোষ খুঁজে তা প্রকাশ করতে চায়। যেমনঃ তারা বলে, তিন তালাক্ব দিলে তা এক তালাক্ব বলে গণ্য হবে, এটা ইজমা বিরোধী কথা এবং তা অপ্রচলিত।

আর অপ্রচলিত আমলের মাধ্যমে মানুষ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এরূপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। হক্ব প্রকাশ করার উদ্দেশে সে সম্পর্কে বর্ণনা করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর হক্ব প্রচার করা যার উদ্দেশ্যে হয়, সে তা গ্রহণ করার সুযোগ পায়। অপরদিকে, মানুষের দোষ বর্ণনা করা যার উদ্দেশ্যে হয়, যেন সে তার ভাইয়েরই গোপন দোষ বর্ণনা করে। আর যে তার ভাইয়ের গোপনীয়তা প্রকাশ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার গোপন বিষয় প্রকাশ করে তাকে লাঞ্ছিত করেন যদিও সে ঘরে অবস্থান করে। আলিমের অনুমান ভিত্তিক কথা জানতে পারলে, তার সম্পর্কে উদ্ভুত নিন্দাবাদ তুমি দূরভিত করবে এবং অপসারণ করার চেষ্টা করবে। বিশেষ করে যেসকল আলিমের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতা, কল্যাণমূলক কাজ এবং জাতিকে নছিহত করার সাক্ষ্য রয়েছে তাদের প্রতি আরোপিত নিন্দা দূরভিত করবে।

দশম আনুষঙ্গিক বিষয়।

সৎ উদ্দেশ্যের মাঝেই ইলমের বরকত রয়েছে। বিদ্যার্জনে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করার পূর্বে ইলমের বরকত সম্পর্কে আমাদের জানা আবশ্যক। যেমন: আলিমগণ বলেন,

"الخير الكثير الثابت"

তথা ইলমে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে।

তারা ইলমের বরকত লাভের ব্যাপারে উদাহরণ পেশ করে বলে, ইলম হচ্ছে পানির উৎসের মত। আর প্রশস্ত জায়গায় পানি জমা থাকাই যেন বরকত; যেখানে প্রচুর পরিমাণ পানি রয়েছে। (ইলমের বিষয়টিও তাই)। ধন-সম্পদ, সন্তানাদি এবং বিদ্যা-বুদ্ধিসহ এরূপ প্রত্যেক জিনিস যেখানে অনেক কল্যাণ নিহিত, সেটাই কি ঐ জিনিসের বরকত নয়? প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন, এসবের জন্য তার নিকট বরকত চাইতে হয়। আমাদের প্রতি প্রদত্ত নি'আমতে আল্লাহ তা'আলা বরকত না দিলে আমরা অনেক কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবো। অনেক মানুষের প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে, এসত্ত্বেও তাদের অভাববোধ হয়, কিন্তু কেন? আসলে তাদের ঐ সম্পদের মাধ্যমে তারা উপকৃত হতে পারে না। দেখা যায়, তাদের অগণিত ধন-সম্পদ রয়েছে। এরপরেও তারা নিজের ও পরিবারের জন্য (কারণ ছাড়াই) খরচে কমতি করে। ফলে তারা সম্পদ থেকে উপকৃত হতে পারে না। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তারা প্রয়োজনীয় বিষয়ে কৃপণতা করে। আল্লাহ তা'আলা মালের উপর মানুষকে কর্তৃত্ব দান করেছেন যাতে এর মাধ্যমে জাগতিক সমস্যা দূরভিত হয়। অনেক মানুষের সন্তানাদি আছে কিন্তু তারা কোন কাজে আসে না। এ সন্তানাদির মাধ্যমে পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা ও দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়। সন্তান তার বন্ধুদের সাথে বসে বসে দীর্ঘক্ষণ আলাপচারিতায় লিপ্ত থাকে, তার সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়, আনন্দের বিষয়গুলো তার সাথেই শেয়ার করে। কিন্তু সে যখন তার পিতার কাছে বসে তখন খাঁচায় বন্দী পাখির মত ছটফট করে। তার পিতার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে না, আলাপ-আলোচনা করে না এবং আনন্দের বিষয়গুলো তার সাথে শেয়ার করে না। এসব তার কাছে ভারী মনে হয়, এমনকি পিতার দিকে তাকানোও তার জন্য কষ্টকর। সুতরাং বুঝা যায়, পিতা-মাতার ঐ সব সন্তানের মাঝে কোন বরকত নেই। এসব নেতিবাচক বিষয় থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

অপরদিকে ইলমের বরকত লাভের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা কতিপয় মানুষকে অনেক ইলম দান করেছেন। কিন্তু তার অবস্থান মূর্খের মতই। ইবাদত, আচার-আচরণ চালচলন এবং মানুষের সাথে তার লেন-দেনে তার বিদ্যা-বুদ্ধির কোন নিদর্শন প্রকাশ পায় না। বরং আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দাম্ভিকতা প্রদর্শন এবং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করত নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্যই কখনো সে ইলম অর্জন করে থাকে। আল্লাহ তা'আলাই তাকে জ্ঞান দান করে অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যদি চাইতেন তাহলে সেও ঐসব মূর্খর মত হতে পারতো। আবার কখনো দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু

পাঠদান, উপদেশ এবং লেখনি কোন দিক থেকেই তার জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয় না। বরং নিজেকে সে সীমাবদ্ধ অবস্থায় রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা তার জ্ঞানে বরকত দান করেন না। আর আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্যে যাকে জ্ঞান দান করেছেন তার জ্ঞান প্রচার না করা নিঃসন্দেহে মারাত্মকভাবে নিষিদ্ধ। কারণ কেউ জ্ঞান দান করে জাতির মাঝে তা প্রচার করলে তার জন্য রয়েছে কয়েকটি প্রতিদান।

প্রথম: কেউ আল্লাহ তা'আলার দীনের জন্যই জ্ঞান দান করলে সে মুজাহিদ হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ একেক দেশ-অঞ্চল বিজয় লাভ করে সেখানে দীনের প্রচারণা চালায়। আর জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের অন্তর জয় করা যায়, এমনকি আল্লাহর শরী'আত তার মাঝে প্রচার হয়।

দ্বিতীয়: জ্ঞানের কথা প্রচার করা ও শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে বরকত লাভ হয়। আর দীনের জ্ঞান শিক্ষা দানের ভিতর রয়েছে আল্লাহর শরী'আতের সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষা। কেননা, দীনের জ্ঞান যদি না থাকতো তাহলে শরী'আত সংরক্ষণ করা যেত না। তাই আলিম-ওলামা ছাড়া শরী'আত সংরক্ষণ করা যায় না। আলিমবক্তিবর্গ ছাড়া দীনের পৃষ্ঠপোষকতাও সম্ভব নয়। এজন্য আলিমদের দ্বারা জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিলে মানুষ ঐ জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত হয়। এভাবে শরী'আতের জন্য প্রতিরক্ষা অর্জিত হয় এবং তা সংরক্ষিত থাকে।

তৃতীয়: তুমি যাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে তার প্রতি ইহসান করবে। কেননা, তুমি তাকে আল্লাহ তা'আলার দীনের জ্ঞান দান করছো। তাই সে প্রমাণসহ আল্লাহর ইবাদত করলে তার মতই তোমার জন্য প্রতিদান নির্ধারিত হবে। কারণ তুমি তাকে কল্যাণের পথ দেখিয়েছো। আর কল্যাণের দিক নির্দেশক কল্যাণ মূলক কাজ সম্পাদনকারীর মতই বিনিময় পায়। কাজেই জ্ঞান শিক্ষা দানকারী এবং তা যে অর্জন করে উভয়ের জন্য রয়েছে কল্যাণ ও বরকত।

চতুর্থ: জ্ঞান শিক্ষা দানে তা বৃদ্ধি পায়। আলিমের ইলম বৃদ্ধি পায় যখন সে তা অপরকে শিক্ষা দেয়। কেননা, যা মুখস্থ আছে শিক্ষাদানের সময় তা স্বরণ হয়। যা মুখস্থ নেই তা অর্জন হয়। আর ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষকই বেশি উপকৃত হয়। কখনো শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছে এমন কিছু অর্থ নিয়ে আসে যা তার মনে নেই; তখন তিনি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উপকৃত হন অথচ তিনি তাদেরকে শিক্ষা দেন। এটাই বাস্তব বিষয়। এজন্য শিক্ষকের উচিত যে, যখন তিনি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উপকৃত হবেন, শিক্ষার্থী যদি তার সামনে জ্ঞানগত কোন বিষয় পেশ করে তাহলে শিক্ষকের উচিত হবে ঐ শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেয়া এবং তার প্রতি

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। বিষয়টি কতিপয় মানুষের ধারণায় বিপরীত মনে হতে পারে যে, শিক্ষকের অজানা বিষয় শিক্ষার্থী তার সামনে তুলে ধরে বর্ণনা করলে শিক্ষক নিজেকে ছোট মনে করেন, তিনি বলেন, 'এ ছেলেটি তার শিক্ষককে শিখাচ্ছে' একারণে তিনি সংঙ্কোচবোধ করেন। ছাত্র যেন শিক্ষকের অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করে না দেয় এজন্য তিনি ঐ ছাত্রের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে তাকে এড়িয়ে চলেন। এভাবে তার ইলমের হ্রাসতা ঘটে, সাথে সাথে বিবেক-বুদ্ধিও লোপ পায়।

আল্লাহ তা'আলা ছাত্রদের মাধ্যমে শিক্ষকদের উপর দয়া করেছেন। তা এভাবে যে, শিক্ষকের ভুলে যাওয়া বিষয় ছাত্ররা তাকে স্বরণ করিয়ে দেয় এবং তার অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করে দেয়। এটাইতো শিক্ষকের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ। এ জ্ঞানের কথা ছড়িয়ে দেয়ার মধ্যেও উপকারীতা নিহিত আছে। শিক্ষকের শিক্ষাদানের মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যেমন কবি ধন-সম্পদ ও ইলমের সম্পর্ক বর্ণনা করে বলেন,

يزيد بكثرة الإنفاق منه ... وينقص إن به كفًّا شددت

সম্পদ খরচে বৃদ্ধি পায়, তা কমে যায় যদি না হয় ব্যয়।

কঠোর হয়ে সম্পদ খরচ করা বন্ধ করলে তা কমে যায়। কিন্তু ইলম প্রচার করলে তা বৃদ্ধি পায়। মানুষের উচিত বিজ্ঞতার সাথে জ্ঞানের কথা প্রচার করা, শিক্ষা দেয়া। যাতে শিক্ষার্থীরা মাসআলা সমূহ বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে বুঝতে পারে। শিক্ষক ছাত্রদেরকে কোন প্রকার জটিলতায় ফেলবে না। বরং তাদেরকে তিনি একের পর এক জ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমেই প্রতিপালন করবেন। এ জন্য কতিপয় মানুষ আল্লাহভীরু আলিমের পরিচয় দানে বলেন: আল্লাহভীরু আলিম তারাই যারা জ্ঞানের বড় বিষয় শিক্ষা দেয়ার পূর্বে ছোট ছোট বিষয়গুলো শিক্ষা দেন। আমরা জানি যে, কোন প্রসাদ-অট্টালিকা একবারে নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। প্রথমে জমিনে এর ভিত্তি স্থাপন করতে হয়, তাৎক্ষনিক প্রসাদ নির্মিত হয় না। বরং ইটের পর ইট গেঁথে তা নির্মাণ করা হয়। পরিশেষে পরিপূর্ণ প্রসাদ হয়ে যায়। তাই শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের মেধার দিকে লক্ষ্য রাখা; যাতে মেধা খাটিয়ে বুঝে উঠা তাদের জন্য সম্ভব হয়। একারণে আলিমগণের জন্য পরামর্শ হলো, তারা যা জানেন-বুঝেন ঐ বিষয় নিয়ে মানুষের সামনে আলোচনা করবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

إنك لن تحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.

তুমি মানুষকে যেকোন হাদীছই বর্ণনা করো না কেন এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকবে যাদের আকল পর্য তা পৌছবে না, ফলে এটি তাদের জন্য ফিতনার কারণ হবে।

অনুরূপভাবে উছূল ও কাওয়ায়েদ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখাও শিক্ষকের কর্তব্য। কেননা, এ দু’টি বিষয় জ্ঞানের ভিত্তি। কখনো আলিমগণ বলে থাকেন: যে উছূল হতে বঞ্চিত হলো সে তা থেকে বঞ্চিতই হলো। অর্থাৎ উছূলের জ্ঞান না থাকলে সে চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছতে সক্ষম হবে না। তাই উছূল ও কাওয়ায়েদ সম্পর্কে ছাত্রদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে, এ বিষয়ের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আংশিক মাসআলার শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয়। কেননা, এ জ্ঞান ছাড়া যে আংশিক মাসআলা শিক্ষা করতে চাইবে, সে জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার কারণে তার হুকুম (বিধান) বুঝতে সক্ষম হবে না। কারণ তার নিকট এ বিষয়ের কোন মৌলিক জ্ঞান নেই।

পঞ্চম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে তিনটি রিসালাহ (বার্তা) রয়েছে

প্রথম রিসালাহ (বার্তা): ছাত্রদের উত্তম চরিত্র গঠন ও তার গুরুত্ব।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহী পৌঁছে দিয়েছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন, তার মৃত্যু অবধি আল্লাহর রাস্তায় যথাযথ জিহাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার মধ্যে যাকে চান তার প্রতি অনুগ্রহ করেন, অতঃপর ঐ বান্দা তার দাওয়াতে সাড়া দেয়। তারই দিক নির্দেশনায় হিদায়াত লাভ করে। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তার প্রজ্ঞা অনুযায়ী তাকে ব্যর্থ করে দেন, অতঃপর সে আল্লাহর আনুগত্যে অহংকার করে, তার বাণী মিথ্যা মনে করে এবং তার নির্দেশ অমান্য করে। অতঃপর সে হয় ক্ষতিগ্রস্ত এবং মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট।

হে ভাই সকল! তোমাদের কাছে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা করে আমি আনন্দিত। আলিমগণ বলেন, চরিত্র হলো মানুষের গোপন আকৃতি। কেননা, মানুষের আকৃতি দু'শ্রেণীর:

(ক) প্রকাশ্য আকৃতি: আর তা হচ্ছে শারীরিক গঠন আকৃতি যা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। আমরা সকলে জানি, এ প্রকাশ্য আকৃতি সুন্দর ও বিশ্রী উভয়টি হয়ে থাকে। আবার কখনো এর মাঝামাঝিও হয়।

(খ) গোপন আকৃতি: এটাও প্রথমটির মত সুন্দর ও খারাপ উভয়টি হয় এবং এর মাঝামাঝি হয়ে থাকে। এটাকে চরিত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং চরিত্র হচ্ছে গোপন আকৃতি, যা মানুষের স্বভাব বলে গণ্য হয়। মানুষের চরিত্র যেমন স্বভাবগত হয় তেমনি তা হয় অর্জনগত। অর্থাৎ স্বভাবগতভাবে মানুষ যেমন সুন্দর উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয় তেমনি এ চরিত্র কখনো অর্জন ও বিনয়-নম্রতার মাধ্যমে লাভ হয়। এজন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لأشج عبد القيس: "إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة" قال يا رسول الله أهما خُلُقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: "بل جبلك الله عليهما"

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল কায়েস গোত্রের ক্ষতচিহ্নওয়ালা লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন, অবশ্য তোমার মধ্যে এমন দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। সহিষ্ণুতা ও ধীরতা-নম্রতা।[৯৩]

অতঃপর বুঝা গেল, উত্তম চরিত্র স্বভাব ও অর্জনগত উভয়ভাবে লাভ হয়। কিন্তু স্বভাবগত চরিত্র নিঃসন্দেহে এমন চারিত্রিক গুণাবলী যা অর্জনের চেয়ে উত্তম।

---

[৯৩] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮, বুখারী আল আদাবুল মুফরদ হা/৫৮৬, আবূ দাঊদ হা/৫২২৫, তিরমিযী হা/২০১১,

কেননা, প্রকৃতিগত অর্জিত চরিত্র মানুষের স্বভাব সুলভ বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত। কৃত্রিম চরিত্র অর্জনের জন্য তাকে চর্চা করতে হয় না। তবে এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর কেউ স্বভাবগত চরিত্রবান না হলে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনে তা পাওয়া সম্ভব। বিনয়-নম্রতা ও উত্তম চরিত্র অর্জনের জন্য অভ্যাস গড়ে তোলা সম্পর্কে অচিরেই আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ।

অনেক মানুষ মনে করে, স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ছাড়াই সৃষ্টির সাথে আদান-প্রদানের মাধ্যমেই উত্তম চরিত্র অর্জন সম্ভব। কিন্তু এ ধারণায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উত্তম চরিত্র যেমন সৃষ্টির সাথে আদান-প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তেমনি স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেও অর্জন করা যায়। স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনই হচ্ছে উত্তম চরিত্রের বিষয় এবং সৃষ্টির সাথে সদারচণ করাও এ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে উত্তম চরিত্র কি? স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে উত্তম চরিত্র তিনটি জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে।

১. আল্লাহ তা‘আলার বাণী বিশ্বাস করে মেনে নেয়া।

২. আল্লাহ তা‘আলার বিধান বাস্তবায়ন ও তা চর্চা করা।

৩. ধৈর্য ও সন্তুষ্টি চিত্তে ভাগ্য মেনে নেয়া।

এ তিনটিই হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার উত্তম চরিত্রের মাপকাঠি। এ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রথম: আল্লাহ তা‘আলার বাণী বিশ্বাস করা।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী বিশ্বাসে যেন কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয় না থাকে। কেননা, আল্লাহ তা‘আলার বাণী তার ইলমের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। আর তার কথাই উত্তম। যেমন আল্লাহ তা‘আলা নিজ সত্তা সম্পর্কে বলেন,

{وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} [النساء: ٨٧] .

কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে? (সূরা আন নিসা ৪:৮৭)।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী বিশ্বাস করা মানুষের জন্য ফরয এবং সংশয় নিরসনে প্রচেষ্টা থাকা উচিত। যাতে আল্লাহ ও তার রসূলের বাণী সম্পর্কে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। মানুষ যখন এ উত্তম চরিত্র ধারণ করবে তখন এমন সব সন্দেহ-সংশয় তার থেকে দুরিভূত হবে যা সংশয়বাদীরা রসূল আল্লাহ তা‘আলার

এর বাণী সম্পর্কে উত্থাপন করে থাকে। হোক তারা দীনের মাঝে বিদ‘আত সৃষ্টিকারী মুসলিম কিংবা মুসলিমদের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টিকারী অমুসলিম।

এজন্য আমরা ছ্বহীহ বুখারীতে উল্লেখিত আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছের মাধ্যমে উদাহরণ পেশ করে থাকি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء"

তোমাদের কারো পানীয়তে মাছি পড়লে সে যেন ঐ মাছি তাতে ডুবিয়ে ফেলে দেয়। কেননা, মাছির একটি ডানাতে আছে রোগ-জীবানু অপরটিতে আছে আরোগ্য।[৯৪]

এটা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী যা অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি যা অহী করেন, তিনি শুধু তাই ব্যক্ত করেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ, তাই তিনি অদৃশ্য বিষয় জানেন না। বরং আল্লাহ তা‘আলা তাকে বলেন,

{قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام، الآية: ٥٠]

বল, ‘তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার নিকট আল্লাহর ভারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না এবং তোমাদেরকে বলি না, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়’ (সূরা আল-আন‘আম ৬:৫০)।

এ আয়াতের মাধ্যমে আবশ্যক হয় যে, আমরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উত্তম চরিত্রের সাথে তুলনা করবো। আর এ বাণীর মাধ্যমে উত্তম চরিত্রের যে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, আমরা তা গ্রহণ করবো। আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছে যা বলেছেন, যদিও এ ব্যাপারে কেউ তার বিরোধীতা করে আমরা তা সম্পূর্ন নিশ্চিতরূপে হক্ব ও সত্য বলে জানবো। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বিশুদ্ধরূপে যে নিশ্চিত জ্ঞান প্রমাণিত,

---

[৯৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৩২০, আবূ দাউদ হা/৩৮৪৪, ইবনে মাজাহ হা/ ৩৫০৫।

তার বিরোধী বিষয়কে আমরা বাতিল-পরিত্যাজ্য বলে জানবো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [يونس: ٣٢]

অতএব, তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত রব। অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া কী থাকে? অতএব কোথায় তোমাদেরকে ফেরানো হচ্ছে? (সূরা ইউনূস ১০:৩২)।

আরেকটি উদাহরণ হলো, ক্বিয়ামতের সংবাদ সম্পর্কে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بقدر ميل".

ক্বিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। অবশেষে তা এক মাইল পরিমাণ দুরত্বে অবস্থান করবে।[৯৫]

ক্বিয়ামতের দিন সূর্য সৃষ্টির এক মাইল পরিমাণ দুরত্বে অবস্থান করবে। হোক দুরত্ব সুরমাদানীর সমান অথবা এক মাইল। সূর্যের এ দুরত্ব ও সৃষ্টির মাঝে অল্প সামান্যই ব্যবধান থাকবে। এসত্ত্বেও মানুষ এর তাপে পুড়বে না। কিন্তু দুনিয়াতে যদি সূর্যের এ দুরত্ব কয়েক মাইল ব্যবধান হতো তবু পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

কেউ কেউ বলে, ক্বিয়ামতের দিন সূর্য কিভাবে নিকটবর্তী আর মানুষই বা কিভাবে অবশিষ্ট থাকবে? এ হাদীছের মাঝে উত্তম চরিত্রের কি শিক্ষা আছে? জবাব হচ্ছে, এ হাদীছ গ্রহণ করত সত্য হিসাবে তা মেনে নেয়াই হচ্ছে উত্তম চরিত্র। আর আমাদের অন্তরে এব্যাপারে কোন সন্দেহ, সংশয় ও দ্বিধা থাকবে না। এ সম্পর্কে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে জানবো। আর বিশাল ব্যবধানের কারণে দুনিয়ার অবস্থাকে আখিরাতের অবস্থার উপর অনুমান করা সম্ভব নয়। যদি এটা সম্ভব হতো তাহলে মুমিনগণ আখিরাত সম্পর্কে এরূপ কোন সংবাদ আনন্দ ও আস্থার সাথে গ্রহণ করতেন। ফলে বিস্তারিত জানার সুযোগ সৃষ্টি হতো।

দ্বিতীয়: আল্লাহ তা'আলার বিধান বাস্তবায়ন ও তা চর্চা করা।

[৯৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৬৪, তিরমিযী হা/২৪২৩, ইবনে মাজাহ হা/ ৭৩৩০।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে উত্তম চরিত্র হচ্ছে মানুষ তার বিধানকে গ্রহণের পর তা বাস্তবায়ন করে সমতা বজায় রাখবে। আর আল্লাহ তা'আলার কোন বিধানকেই পরিত্যাগ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলার কোন বিধান অস্বীকার করলে অথবা অহংকারবশত আমল থেকে বিমুখ কিংবা আমলের প্রতি অমনোযোগী হলে সেটিই হবে তার সাথে খারাপ আচরণ। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে এসবই সাংঘর্ষিক বিষয়।

এ জন্য আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, ছিয়াম-সাধনা নিঃসন্দেহে মানুষের জন্য কষ্টকর বিধান। কেননা, মানুষ ছিয়াম পালনের সময় পানাহার ও সহবাস ত্যাগ করে। এটা কষ্টকর বিষয়। এ সত্ত্বেও মুমিন আনন্দ ও আস্থার সাথে এ কষ্ট মেনে নিয়েই তার প্রভূর সাথে উত্তম চরিত্র বজায় রাখে। ছিয়াম পালনকারী নিজের সক্ষমতা তৈরি করে নেয়। তাই দেখা যায়, সন্তুষ্টচিত্তে প্রফুল্লতার সাথে সুদীর্ঘ প্রচন্ড গরমেও সে ছিয়াম পালন করে। কেননা, সে তার রবের সাথে উত্তম আচরণের জন্যই এমনটা করে। অপরপক্ষে আল্লাহর সাথে খারাপ আচরণ হচ্ছে বিরক্তি ও অপছন্দের সাথে তার ইবাদতের বিরোধীতা করা। যদি সীমাহীন শাস্তির ভয় না থাকতো তাহলে ছিয়াম পালন আবশ্যক হতো না। আরো একটি উদাহরণ হচ্ছে, নিঃসন্দেহে ছ্বলাত কতিপয় মানুষের কাছে ভারী মনে হয়। আর তা মুনাফিকদের উপর ভারী। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر".

মুনাফিকদের জন্য ইশা ও ফজরের ছ্বলাত কষ্টকর।[৯৬]

অপর দিকে ছ্বলাতের মাধ্যমে মুমিনের চক্ষু শীতল হয় এবং তা আত্মার প্রশান্তি বয়ে আনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: ٤٥] .

তোমরা ধৈর্য ও ছ্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ব্যতীত অন্যদের উপর কঠিন (সূরা আল-বাক্বারা ২:৪৫)।

---

[৯৬] মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৬৫৭, মুসলিম হা/৬৫১

{الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: ٤٦] .

যারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তারা তাঁর দিকে ফিরে যাবে (সূরা আল-বাক্বারা ২:৪৬)।

আয়াত থেকে বুঝা যায়, মুমিনদের জন্য ছ্বলাত কঠিন নয়, বরং তা সহজ-সাধ্য বিষয়। এজন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"وجُعلت قرة عيني في الصلاة"

ছ্বলাতকে আমার জন্য চক্ষু শীতলকারী নির্ধারণ করা হয়েছে।[৯৭]

এসব প্রমাণাদী থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর সাথে বান্দার উত্তম আচরণ বজায় রাখার বিষয়টি ছ্বলাত আদায়ের সাথে সম্পর্কিত। বান্দা এমন ভাবে ছ্বলাত আদায় করবে যাতে আত্মা প্রফুল্লতা-প্রশান্তি অনুভব করে এবং চক্ষু হয় শীতল। বান্দা ছ্বলাত আদায়ের মাধ্যমে উৎফুল্ল থাকে এবং ছ্বলাতের সময়ের জন্য সে অপেক্ষা করতে থাকে। তথা ফজরের পর যুহরের জন্য অপেক্ষা করে, যুহরের পর আসর এভাবে ইশা পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্ত ছ্বলাত আদায়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। আর এভাবেই বান্দার অন্তর ছ্বলাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

লেনদেন বিষয়ক তৃতীয় উদাহরণ: আল্লাহ তা‘আলা লেনদেনের ক্ষেত্রে আমাদের উপর সূদ হারাম করেছেন। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে তিনি এটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] .

আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল আর সূদকে করেছেন হারাম (সূরা আল-বাক্বারা ২:২৭৫)। তিনি আরো বলেন,

{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: ٢٧٥] .

যার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর

[৯৭] ছ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ হা/৩৮৭৯, ৩৯৪০, ছ্বহীহাহ আলবানী হা/১৮০৯.

যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে (সূরা আল-বাক্বারা ২:২৭৫)।

আয়াত থেকে বুঝা যায়, উপদেশ আসার পরও যারা সুদের সাথে জড়িত থাকে তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। এ নির্দেশকে আনন্দ-সন্তুষ্টচিত্তে এবং তা সমর্থন করে মুমিনগণ মেনে নেয়। অপরপক্ষে যারা মুমিন নয়, তারা এ নির্দেশকে গ্রহণ করে না বরং তারা সংকির্ণতাবোধ করে। এ ব্যাপারে তারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। কেননা, আমরা জানি, সূদে নির্দিষ্ট মুনাফা আছে, ক্ষতি নেই। প্রকৃতপক্ষে সুদ হচ্ছে একজনের উপার্জন এবং অন্যজনের প্রতি অত্যাচার। একারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٩]

যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুল্‌ম করবে না এবং তোমাদের যুল্‌ম করা হবে না (সূরা আল-বাক্বারা ২:২৭৯)।

আল্লাহর সাথে উত্তম চরিত্র বজায় রাখার তৃতীয় বিষয় হচ্ছে ধৈর্য ও সন্তুষ্টিচিত্তে ভাগ্যেকে মেনে নেয়া। আর প্রত্যেকেরই জানা আছে যে, সামঞ্জস্য বজায় থাকা বা না থাকা উভয় অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যে কতিপয় সৃষ্টির মাঝে বিদ্যমান । মানুষের রোগ-বালাই কি সামঞ্জস্যশীল? মানুষতো সর্বদা সুস্থ থাকতে চায়। মানুষের অভাব-অনটন কি সামঞ্জস্যশীল? মানুষ ধনী হতে চায়। মানুষের মূর্খতা কি সামঞ্জস্যশীল? মানুষ জ্ঞানী হতে পছন্দ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কর্তৃত নির্ধারিত ভাগ্যে তার রহস্য-তাৎপর্যের কারণে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভাগ্যে সামঞ্জস্যশীল হলে মানুষ তার স্বভাব অনুযায়ী সাচ্ছন্দবোধ করে। এরূপ না হলে সাচ্ছন্দবোধ করে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী তার সাথে মানুষের সদাচরণের অর্থ কি?

মূলত ভাগ্য অনুযায়ী আল্লাহর সাথে উত্তম আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এবং তা বিশ্বাস করা। আর জানা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যা কিছু নির্ধারণ করেছেন, তা কেবল তাৎপর্য ও প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যের জন্য নির্ধারিত, যা কৃতজ্ঞতার দাবী রাখে। এর উপর ভিত্তি করে ভাগ্য অনুযায়ী আল্লাহর সাথে উত্তম চরিত্র বজায় রাখার অর্থ হচ্ছে,

ভাগ্যে নিয়ে মানুষ সন্তুষ্ট থাকবে, তা মেনে নিবে এবং বিশ্বাস করবে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেন, তিনি বলেন,

{الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون}. [البقرة: ١٥٦]

যাদেরকে বিপদ আক্রান্ত করে, তারা বলে নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী (সূরা আল-বাক্বারা ২:১৫৬)।

{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} . [البقرة: ١٥٥]

আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন (সূরা আল-বাক্বারা ২:১৫৫)।

পূর্ববর্তী আলোচনার সারসংক্ষেপ:

আমরা বলবো, সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক স্থাপনে যেমন উত্তম চরিত্র বজায় রাখতে হয় তেমনই স্রষ্টার সাথেও সম্পর্ক তৈরিতে তা প্রযোজ্য। স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে উত্তম চরিত্র হচ্ছে তার বাণী বিশ্বাস করা, বিধান সমূহকে গ্রহণ করা এবং সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা আর ধৈর্য ও সন্তুষ্ট চিত্তে ভাগ্যকে মেনে নেয়া। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার সদাচরণ। সৃষ্টির সাথে উত্তম আচরণ হচ্ছে পরস্পর পরিচিতি হওয়া। এ মর্মে হাসান বছরী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন যে, কাউকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা, নম্রতা বজায় রাখা এবং হাস্যোজ্জ্বল থাকা উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তিনটি বিষয় নিহিত:

১. কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা।

২. নম্রতা বজায় রাখা।

৩. হাস্যোজ্জ্বল থাকা।

প্রথম: কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা।

এ কথার অর্থ হলো মানুষ অন্যকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকবে। হোক তা অর্থনৈতিক সম্পর্কিত অথবা শারীরিক কিংবা মান-সম্মানগত কষ্ট। তাই যে ব্যক্তি কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকতে পারে না তার উত্তম চরিত্র বলতে কিছুই নেই।

বরং সে খারাপ চরিত্রের অধিকারী। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় সমাবেশে (বিদায় হজ্জের ভাষণে) উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেন,

إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا"

কারো রক্তপাত, সম্পদ হরণ ও সম্মান নষ্ট করা তোমাদের উপর হারাম। যেমন হারাম তোমাদের এ দীন, মাস ও শহর।[৯৮]

কারো আমানতের খিয়ানত অথবা কাউকে প্রহার ও অত্যাচার করা অথবা সম্মান বিনষ্ট করা কিংবা গালি-গালাজ ও গিবতের মাধ্যমের বাড়াবাড়ি করা উত্তম চরিত্র নয়। কেননা, এসবের মাধ্যমে ব্যক্তি কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকেনি। তোমার উপর যার বৃহৎ অধিকার রয়েছে এসবের মাধ্যমে তা ক্ষুন্ন হলে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণ অন্যতম মারাত্মক অন্যায়। দূরবর্তী আত্মীয়ের চেয়ে নিকটবর্তী আত্মীয়ের সাথে খারাপ আচরণ করা মারাত্মক অন্যায়। প্রতিবেশি নয় এমন লোকের সাথে খারাপ আচরণের চেয়ে প্রতিবেশির সাথে অসদাচরণ করা মারাত্মক অপরাধ। এজন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه"

আল্লাহর শপথ! ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর শপথ! ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর শপথ! ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যার অনিষ্ঠ হতে প্রতিবেশি নিরাপদ নয়।[৯৯]

মুসলিমের বর্ণনায় আছে,

"لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه"

যার অনিষ্ঠ হতে প্রতিবেশি নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[১০০]

---

[৯৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২১৮, আবূ দাউদ হা/১০৫।
[৯৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬০১৬

এ হাদীছে بوائق বলতে খারাপকর্ম বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়: নম্রতা বজায় রাখা।

الندى বলতে উদারতা ও বদান্যতা। অর্থাৎ কারো প্রতি উদার হওয়া এবং দান করা হচ্ছে الندى।

কতিপয় মানুষের ধারণায় ধন-সম্পদ ব্যয় করাই হচ্ছে উদারতা। বরং তা হচ্ছে কারো জন্য শারীরিক পরিশ্রম করা, কাউকে সম্মান দেয়া এবং ধন-সম্পদ ব্যয় করা। আমরা কাউকে দেখি যে, সে এমন মানুষের প্রয়োজনাদী পূরণ করে যারা (অভাবীরা) তাদের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম, সে তাদের ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে সাহায্যে-সহযোগীতা করে, তাদের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয় এবং তাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে এমন লোকদেরকেই আমরা উত্তম চরিত্রের সাথে গুণান্বিত করি। কেননা, এসব গুণাবলীই হচ্ছে নম্রতা। নাবী ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن"

তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করো, মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ করো, তাতে মন্দ দূরিভুত হবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো।[১০১]

এর অর্থ হচ্ছে তোমার প্রতি অন্যায় অথবা খারাপ আচরণ করা হলে তুমি ক্ষমা ও মার্জনা করবে। আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমাশীলদের প্রশংসা করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন,

---

[১০০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৬
[১০১] হাসান: তিরমিযী হা/১৯৮৭, মিশকাত হা/৫০৮৩।

{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: ١٣٤]

যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন (সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৪)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: ٢٣٧]

তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী (সূরা বাক্বারা ২:২৩৭)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا}النور، الآية: ٢٢

তারা যেন ক্ষমা করে দেয় ও দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে (সূরা আন-নূর ২৪:২২)।

আয়াত হতে বুঝা যায়, মানুষ মানুষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে। তাই মানুষের মাঝে খারাপ কিছু পরিলক্ষিত হলে তাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। যাতে এ দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয় যে, কাউকে ক্ষমা করে দেয়া, তার দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা এবং উত্তম আচরণের মাধ্যমে অচিরেই দোষী ও তার ভাইয়ের মাঝে বিদ্যমান শত্রুতা বন্ধুত্ব ও ছাদাকায় পরিণত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} [فصلت: ٣٤]

সমান নয় ভাল ও মন্দ। জবাবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু (সূরা হা-মীম সাজদা ৪১:৩৪)।

তাই বলি, কোনটি উত্তম, সদাচরণ নাকি অসদাচরণ? অবশ্যই সদাচরণ ভাল। ভাইয়েরা, আরবী ভাষা যারা বুঝেন, একটু চিন্তা করেন যে, কিভাবে সদাচরণ ফলপ্রসূ হয়, এর মাধ্যমে মন্দ লোকের মাঝে তাড়াতাড়ি পরিবর্তন ঘটে।

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ এ আয়াতাংশই তার প্রমাণ। কিন্তু সকলের দ্বারাই কি এ বন্ধুত্ব সৃষ্টি সম্ভব? জবাব হলো না, সম্ভব নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [فصلت: ٣٥]

এটি তারাই প্রাপ্ত হবে যারা ধৈর্যধারণ করবে, আর যারা মহাভাগ্যবান তারাই কেবল এর অধিকারী হয় (সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪১:৩৫)।

এখানে একটি প্রশ্ন আছে তা হচ্ছে, অপরাধীকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে দেয়া প্রশংসিত হবে, নাকি নির্দেশিত; এর দ্বারা আমরা কি বুঝবো?

জবাবে বলা হবে, এ বিষয়ে আমাদের বুঝতে হবে যে, সাধারণভাবে ক্ষমা করা প্রশংসিত হবে এবং নির্দেশিতও। তবে জ্ঞাতব্য যে, কাউকে ক্ষমা করা অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হলে ঠিক তখনই তা প্রশংসনীয় বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [الشورى: ٤٠]

মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। আর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোস নিস্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেন না (সূরা আশ শূরা ৪২:৪০)।

সংশোধন হওয়ার সাথে ক্ষমা করার বিষয়টি সম্পর্ক যুক্ত। প্রশ্ন হচ্ছে, সংশোধন ছাড়া কি ক্ষমা করা সম্ভব?

জবাবে বলা হবে, হ্যাঁ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নিকৃষ্ট মন্দ প্রকৃতির কোন লোক যখন তোমার উপর স্পর্ধা দেখায় এবং তোমার নিকট অপরাধ করে, তুমি যদি তাকে ক্ষমা করে দাও তাহলে সে খারাপ কাজ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকবে। এ

ক্ষেত্রে কোনটি উত্তম? তাকে ক্ষমা করা নাকি তার থেকে জরিমানা আদায় করা? জবাব হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে জরিমানা আদায় করাই উত্তম। কেননা, এতে তার জন্য সংশোধনের সুযোগ আছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সংশোধন করা ওয়াজীব। আর ক্ষমা হচ্ছে ইচ্ছাধীন বিষয়। ক্ষমার মাধ্যমে সংশোধনের সুযোগ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অর্থাৎ সঙ্গত কারণ ছাড়াই ওয়াজীবের উপর ক্ষমা প্রধান্য দেয়া হলে শরী'আত তা সমর্থিত নয়। শাইখুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ) সত্যই বলেছেন। ইহসানের উদ্দেশ্যে অনেক মানুষ এক্ষেত্রে যা কিছু করে সে ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করতে ইচ্ছা পোষণ করি। তা হচ্ছে কোন ব্যক্তির মাধ্যমে এমন কিছু অপরাধ ঘটে যার কারণে অন্য কেউ ধ্বংস হয়। যেমন বিচারকের কাছে নিহত ব্যক্তির বিচার-ফায়সালার জন্য মানুষ আসে। অতঃপর ঐসব বিচারক হত্যাকারী অপরাধীর মুক্তিপণ বিলোপ করে দেয়। এভাবে মুক্তিপণ বিলোপ করা কি প্রশংসনীয় নাকি উত্তম চরিত্র বলে গণ্য? এ ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা আছে কি? এ অপরাধী সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-গবেষণা করা উচিত। সে কি দায়িত্বজ্ঞানহীন পরিচিত মানুষ? এবং সে বেপরওয়া কি না? সে কি এমন প্রকৃতির মানুষ যে বলে, আমি কাউকে আঘাত করতে পরোয়া করি না। এ কথা বলার কারণ হলো, তার মুক্তিপণ নথিভূক্ত করা হয়েছে অথবা পরিপূর্ণ সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের দ্বারা পূর্ণ নিরাপদে যে অপরাধ সংঘটিত হয় তার বিষয়টি চিন্তনীয় নয় কি?। এ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। কিন্তু কথা হলো আল্লাহ তা'আলা সবকিছুরই পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাহলে এর সমাধান কি?

জবাব হলো দ্বিতীয়বার যদি তার মাঝে আচরণের পরিবর্তন দেখা যায় তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়াই উত্তম। তবে ক্ষমা করার পূর্বে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে, নিহত ব্যক্তির উপর কোন ঋণ আছে কিনা ? যদি ঋণ থাকে তাহলে তাকে ক্ষমা করা সম্ভব নয়। আমরা যদিও তাকে ক্ষমা করে দেই তা ক্ষমা হিসেবে গণ্য হবে না। এ সমস্যাটির ব্যাপারে অনেকেরই গুরুত্ব নেই। মৃতের ঋণ আছে কি নেই তা জানা আবশ্যক, কেন আমরা এটা বলছি? জবাবে বলবো, উত্তরাধিকারীগণ এ নিহত মৃতের পক্ষ থেকে তারা তাদের অধিকার বুঝে নিবেন। আর মৃতের ঋণ ব্যতীত উত্তরাধিকারীর সকল অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা মিরাছ সম্পর্কে বলেন,

{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:١١]

অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর (সূরা আন-নিসা ৪:১১)।

এ বিষয়টি অনেক মানুষেরই অজানা। এ ব্যাপারে আমরা বলবো, যখন কেউ দূর্ঘটনায় মারা যায়, মৃতের ক্ষমার জন্য উত্তরাধিকারীকে পেশ করার আগে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে, কেমন অবস্থায় ঐ মৃত অপরাধের শিকার হয়েছিল। যদি দেখা যায়, মুক্তিপণ ছাড়া তার উপর অপূরণীয় ঋণ আছে, তাহলে তাকে ক্ষমা করা অর্থহীন বলে গণ্য হবে। তাই মিরাছ বন্টনের আগে মৃতের ঋণকে অগ্রাধীকার দিতে হবে। আর যদি তার উপর ঋণ না থাকে তাহলে অপরাধীর অবস্থার দিকে আমাদেরকে নজর দিতে হবে। অপরাধী যদি হঠকারী হয় তাহলে তাকে ক্ষমা না করাই ভাল। যদি সে এরূপ না হয় তাহলে যে অপরাধের শিকার হয়েছে তার উত্তরাধীকারীর অবস্থার দিকে খেয়াল করতে হবে। যদি তারা অমুসলিম হয় তাহলে তাদের কেউ মিরাছ পাবে না। অত্যাচারিত মৃতের মিরাছ তাদের ক্ষেত্রে বিলোপ করা হবে। আর যদি মুসলিম হয় তাহলে এক্ষেত্রে ক্ষমাই উত্তম।

মোদ্দাকথা হলো, মানুষকে ক্ষমা করা উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। আর এটাই নম্রতা। কেননা, নম্রতা হচ্ছে কাউকে কোন কিছু দেয়া অথবা বিলোপ করা। আর ক্ষমা করা বিলোপের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়ঃ হাস্যেজ্জল চেহারা।

হাস্যেজ্জল চেহারা বলতে মানুষের সহাস্যবদন বুঝায়। সহাস্যবদন এর বিপরীত হচ্ছে মলিন চেহারা। এজন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

" لا تحقرنّ من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".

তুমি কোন কল্যাণকর কাজ অবহেলা করবে না যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যেজ্জল চেহারায় সাক্ষাত।[১০২]

কারো সাক্ষাতে এবং যে তোমার অভিমুখী হয় তার সামনে হাস্যেজ্জল চেহারায় তুমি আনন্দ প্রকাশ করবে। হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব সূলভ আচরণ বজায় রাখবে।

[১০২] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬২৮, ইবনে হিব্বান হা/৫২৪।

তোমার সাথে সাক্ষাতকারীর সামনে প্রফুল্ল হওয়া ও তার সঙ্গে আন্তরিকতা বজায় রাখা তোমার উপর আবশ্যক। তুমি কঠোর হলে মানুষ তোমাকে এড়িয়ে চলবে। তোমার সাথে বসতে আনন্দবোধ করবে না এবং তোমার সাথে আলোচনাও করতে চাইবে না। কখনো মানুষের প্রেসার মারাত্মক পর্যায় গেলে তা দূরিভুত করণে ঐ রোগীর সামনে হাস্যেজ্জল চেহারাই হবে উত্তম প্রতিষেধক। এ কারণে এ ধরনের সমস্যা গ্রস্থ রোগীকে যা কিছু প্রভাবিত করে এবং তার সাথে রাগ করা হতে বিরত থাকার জন্য ডাক্তার পরামর্শ দেন। অন্যথায়, তার রোগ বেড়ে যেতে পারে। তাই এ রোগীর সামনে হাস্যেজ্জল চেহারা বজায় রাখা যথাযথ। কেননা, মানুষ সাধারণত সৃষ্টির কাছে প্রিয় হয়ে আনন্দবোধ করে। সুতরাং সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক স্থাপনে এ তিনটি পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে উত্তম চরিত্র বজায় থাকে। আর জানা উচিত যে, যাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে উত্তম চরিত্র বজায় রাখতে হবে তারা হচ্ছে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং পরিবারবর্গ। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঠিক রাখতে যেন সংঙ্কোচবোধ না হয়। শরী'আতের সীমারেখা বজায় রেখে সম্ভবপর তাদের সাথে প্রফুল্ল থাকতে হবে। শরী'আতের সীমা বহাল রেখেই এ আনন্দ প্রকাশের নিয়ম অনুসরণ করা দরকার। কেননা, আল্লাহর অবাধ্যতায় মানুষের আনন্দিত হওয়া ঠিক নয়। এটা শরী'আতের অনূকুলে নয়। আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্যে চাই। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং পরিবারবর্গ যাদের সাথে তোমার সম্পর্ক আছে তাদের সামনে উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করবে। এজন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"إن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"

তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের নিকট উত্তম।[১০৩]

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হলো অনেক মানুষ অপরের সাথে সদাচরণ করলেও সে তার পরিবারের সাথে সদারচণ করে না। এটা ভুল যা বাস্তবতা পরিপন্থী। কোন বিবেচনায় সদাচরণ বজায় রাখবে দূরবর্তী আত্মীয়ের সাথে অথচ নিকটবর্তী আত্মীয়ের সাথে করবে দূর্ব্যবহার? নিকটবর্তী আত্মীয়ের সাথে উত্তম আচরণ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা বেশি অগ্রগণ্য। জনৈক লোক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলো,

---

[১০৩] ছ্বহীহঃ তিরমিযী হা/৩৮৯৫।

يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أبوك". في الثالثة أو الرابعة.

হে আল্লাহর রসূল! আমার সদাচরণ পাওয়ার বেশি হক্বদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা, অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা, তিনি আবারও তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? জবাবে তিনি বললেন, তোমার বাবা। তৃতীয় অথবা চতুর্থবারে বাবার কথা উল্লেখ করেছেন।[১০৪]

মোদ্দা কথা হলো, পরিবার, সঙ্গী-সাথী ও আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। গ্রীষ্ম কালিন কেন্দ্রে যুবক শ্রেণীকে আমরা কাজে নিয়োজিত করে উত্তম চরিত্র গঠনের উপর তাদেরকে পরিচালিত করবো। যাতে এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। কেননা, প্রশিক্ষণ ছাড়া ইলমের মাধ্যমে উপকার লাভের চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। উদ্দিষ্ট ফলাফল লাভের জন্য প্রশিক্ষণের সাথে ইলম অর্জন করতে হয়।

এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} [آل عمران: ٧٩] .

কোন মানুষের জন্য সংগত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমাত ও নবুয়্যত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও। বরং সে বলবে, তোমরা রব্বানী হও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে (সুরা আলে ইমরান ৩:৭৯)।

বুঝা গেল, মানুষ আল্লাহভীতি অর্জন করবে এটাই ইলমের উপকারীতা। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহর শরী‘আতের উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

এ কেন্দ্রকে প্রতিযোগিতা মূলক উত্তম চরিত্র গঠনের ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করার জন্য আমরা চিন্তা-গবেষণা করবো। আর উত্তম চরিত্র কখনো হয় স্বভাবসূলভ আবার কখনো তা হয় অর্জনগত। আর স্বভাবসূলভ চরিত্র অর্জনগত চরিত্রের

---

[১০৪] মুত্তাফাকুন আলাইহি: বুখারী হা/৫৯৭১, মুসলিম হা/২৫৪৮।

চেয়ে বেশি পরিপূর্ণ। আর এ কথার উপর রয়েছে হাদীছের দলীল। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"بل جبلك الله عليهما"

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এ দু'য়ের উপরই আকৃতি দান করেছেন।[১০৫]

অনেক ক্ষেত্রে মানুষের অর্জনগত চরিত্র কখনো নষ্ট হয়ে যায়। কেননা, উত্তম চরিত্র অর্জন করতে অনুশীলন ও সহযোগীতার প্রয়োজন হয় এবং যে সব বিষয় মানুষের উপর প্রভাব ফেলে তা স্বরণ রাখতে হয়।

এক লোক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আপনি উপদেশ দিন। তিনি বললেন,

"**لا تغضب" فردد مرارًا قال: "لا تغضب**".

তুমি রাগ করবে না, লোকটি বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকলে তিনি বললেন, তুমি রাগ করবে না।[১০৬]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"**ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب**".

কুস্তিতে বিজয় লাভ করা ক্ষমতা নয়, বরং নিজের রাগকে সংবরণ করাই হচ্ছে ক্ষমতা।[১০৭]

الصرعة হচ্ছে কুস্তি লড়াইতে যিনি প্রতিযোগীকে পরাজিত করেন। আর রাগের সময় যিনি নিজেকে সংবরণ করেন তিনিই মূলত যোদ্ধা-কুস্তিগির। আর রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করা উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। তাই তুমি রেগে গেলে তোমার রাগ প্রকাশ করবে না। তুমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে সাহায্যে প্রার্থনা করবে। রাগান্বিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলে তুমি বসে যাও আর বসে থাকলে শুয়ে থাকো। রাগ বেড়ে যেতে থাকলে তুমি উযূ করবে যতক্ষণ না

[১০৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮, বুখারী আদাবুল মুফরদ হা/৫৮৬।
[১০৬] ছ্বহীহ: বুখারী হা/ ৬১১৬, তিরমিযী হা/২০২০।
[১০৭] মুত্তাফাক আলাইহি হা/৬১১৪, মুসলিম হা/২৬০৯।

তা দূরভিত হয়। আমাদের এটা বলা উদ্দেশ্যে যে, স্বভাব ও অর্জনগত চরিত্রের মাঝে স্বভাবগত চরিত্রই উত্তম। কেননা, এধরনের চরিত্র মানুষের বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করে এবং সর্বক্ষেত্রে তা সহজ-সাধ্য হিসেবে গণ্য। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অর্জনগত চরিত্র বিনষ্ট হয়ে থাকে। এরূপভাবে আমরা বলবো, মানুষ নিজের ক্ষেত্রে চর্চা বজায় রেখে উত্তম চরিত্র অর্জন করতে পারে।

মানুষ কিভাবে উত্তম চরিত্র অর্জন করবে? এ বিষয়ে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রথম: আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহর দিকে খেয়াল রাখা।

তথা মহান চরিত্রের প্রশংসা বুঝায় এমন দলীলের উপর ভিত্তি করে তা অর্জন করতে হবে। চরিত্রের প্রশংসা মূলক অথবা সৎআমল বিষয়ক কোন দলীল পাওয়া গেলে মুমিন অবশ্যই তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

দ্বিতীয়: ইলম ও আমানতের দিক থেকে বিশ্বস্ত উত্তম ও সৎব্যক্তিবর্গের সাথে উঠাবসা করা।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يَعدمُك من صاحب المسك: إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد: يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحًا خبيثة".

সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে মিসক (সুগন্ধি) বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতাদের থেকে শুন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।[১০৮]

হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের উচিত হবে যে, তোমরা উত্তম চরিত্রবান লোকের সঙ্গী হবে আর খারাপ লোকের সঙ্গ ও মন্দকর্ম হতে বিরত থাকবে। আর চরিত্রবান লোকের সাথে উঠাবসা করাকে প্রতিষ্ঠান মনে করে উত্তম চরিত্র গঠনে তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করবে।

[১০৮] মুত্তাফাক আলাইহি হা/২১০১, মুসলিম হা/২৬২৮।

তৃতীয়: কোন জিনিসের মাধ্যমে খারাপ চরিত্র অর্জিত হয় ঐ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা।

কেননা, খারাপ চরিত্র ঘৃণিত, পরিত্যাজ্য এবং তা নিকৃষ্ট গুণ হিসাবেই পরিচিত। সুতরাং যখন বুঝা গেল যে, মন্দ বিষয় খারাপ চরিত্রের দিকে ধাবিত করে তাই মানুষ এ থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যে, আমরা যেন তার কিতাব ও রসুলের সুন্নাহ প্রকাশ্যে-গোপনে আঁকড়ে ধরতে পারি, এর উপরেই যেন তিনি আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন, দুনিয়ায় পরিচালিত করেন ও আখেরাতে সফলতা দান করেন আর আমাদেরকে হেদায়াত দানের পর তিনি যেন আমাদের অন্তর বাঁকা করে না দেন এবং তিনি যেন আমাদেরকে তার রহমত দান করেন। তিনিই প্রকৃত দাতা।

দ্বিতীয় রিসালাহ (বার্তা)

আলিমগণের মতভেদের কারণ এবং আমাদের অবস্থান।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছেই সাহায্যে প্রার্থনা করি, তার নিকট তাওবা করি, আমাদের আত্মা ও কর্মের খারাপি হতে আল্লাহর কাছে সাহায্যে চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, তার কোন পথভ্রষ্টকারী নেই, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার কোন হিদায়াতকারী নেই। আর আমি সাক্ষ্যে দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই, আর আমি আরো সাক্ষ্যে দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রসূল। তার পরিবারবর্গ, তার ছাহাবী, আর যারা ইহসানের সাথে ক্বিয়ামত অবধি তাদের অনুসরণ করে তাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:١٠٢]

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না (সূরা আলে ইমরান ৩:১০২)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء:١]

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফ্‌স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের নিকট চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক (সূরা আন-নিসা ৪:১)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب: ٧٠, ٧١]

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল (সূরা আল-আহযাব ৩৩:৭০,৭১)।

অনেকের নিকট এ বিষয়ে প্রশ্নের উদ্ভব হয়, কতিপয় লোক প্রশ্ন করেন, এ বিষয় ও উদাহরণের অবতারণা কেন? দীনের মাসআলাসমূহ এর চেয়ে এসব এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

এ বিষয়ে অনেক মানুষ নিমগ্ন, বিশেষত বর্তমান যুগে। আমি বলবো না যে, শুধু জনসাধারণই এ বিষয়ে নিমগ্ন; বরং শিক্ষার্থীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিধানাবলী প্রকাশ করে জানিয়ে দেয়ার অনেক মাধ্যম সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্নভাবে তা মানুষের মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। আর বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের কথায় গোলযোগপূর্ণ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অনেক মানুষ বিশেষত জনসাধারণের মধ্যে যারা মতানৈক্যের মৌলিকত্ব সম্পর্কে অবগত নয় তাদের নিকট এ মতভেদের কারণে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। আমার দৃষ্টিতে মুসলিমদের নিকট এ বিষয়ের বড় গুরুত্ব রয়েছে তাই এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্যে প্রার্থনা করছি। এ উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলার নি'আমত রয়েছে যে, মতভেদপূর্ণ বিষয় দীনের কোন উছুল ও মৌলিক উৎস নয়। প্রকৃত মুসলিমরা বিভিন্ন মতভেদপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে যায়। আর এ বিষয়ের সারকথা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা করছি।

প্রথমতঃ সকল মুসলিমের জন্য জ্ঞাতব্য যে, আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ হতে তারা যা কিছু জেনেছে তা হলো আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দীনের পরিপূর্ণ যথাযথ বর্ণনা করেছেন যা পুনরায় বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কেননা, অন্তরায় সৃষ্টিকারী প্রত্যেক ভ্রষ্টতা হিদায়াত ও সত্য দীনের মাধ্যমে দূরভিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বাতিল-পরিত্যাজ্য, দীন যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জিত হয় না তা সত্য দীনের মাধ্যমে নাকোচ হয়।

আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরিত হয়েছেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে লোকেদের মাঝে দ্বন্দ্ব হলে তারা তার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতো। অতঃপর তিনি তাদের মাঝে ফায়ছালা করে দিতেন এবং হক্বের বর্ণনা করতেন হোক তা আল্লাহর কালাম নিয়ে তাদের মাঝে মতভেদপূর্ণ কোন বিষয় অথবা আল্লাহর এমন বিধানাবলী যার হুকুম ঐ সময় তৎক্ষণাৎ নাযিল হয়নি। অতঃপর ঐ হুকুম সম্পর্কে কুরআন নাযিল হওয়ার পর তা স্পষ্ট হয়। আর তুমি কুরআনের যে আয়াতটি অধিক পাঠ করে থাকো তা হচ্ছে **{يَسْأَلُونَكَ عَنِ}** 'তারা তোমাকে প্রশ্ন করে' অতঃপর এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে নিম্নের আয়াতের মাধ্যমে পূর্ণ জবাব দেন। এবং তা মানুষের মাঝে প্রচার করার নির্দেশ দেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [المائدة:٤]

তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী বৈধ করা হয়েছে? বল, তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সব ভাল বস্তু এবং শিকারী পশু-পাখী, যাদেরকে তোমরা শিকার প্রশিক্ষণ দিয়েছ; সেগুলোকে তোমরা শেখাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তা থেকে খাও, যা তোমাদের জন্য ধরে এনেছে এবং তাতে তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ কর এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত (সূরা আল-মায়েদা ৫:৪)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} [البقرة: ٢١٩]

তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তাতে রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকারিতা। আর তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড় এবং তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ব্যয় করবে। বল, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর (সূরা আল-বাক্বারা ২:২১৯)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأنفال: ١]

লোকেরা তোমাকে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, গনীমতের মাল আল্লাহ ও রসূলের জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরের মধ্যকার অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হও (সূরা আল-আনফাল ৮:১)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [البقرة: ١٨٩]

তারা তোমাকে নব চাঁদসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা মানুষের ও হজের জন্য সময় নির্ধারক। আর ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা পেছন দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে। কিন্তু ভাল কাজ হল যে তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা গৃহসমূহে তার দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও (সূরা আল-বাক্বারা ২:১৮৯)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة:٢١٧]

তারা তোমাকে হারাম মাস এতে লড়াই করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তাতে লড়াই করা বড় পাপ। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা প্রদান, তাঁর সাথে কুফরি করা, মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট অধিক বড় পাপ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়। আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে। আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তার দীন থেকে ফিরে যাবে অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী (সূরা আল-বাক্বারা ২:২১৭)।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর শরী‘আতের বিধানাবলী সম্পর্কে উম্মতের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যা শরী‘আতের উছুল এবং এর উৎসের উছুলের চাহিদা বহির্ভূত। মতভেদ সংঘটিত হওয়ার কতিপয় কারণ শীঘ্রই বর্ণনা করবো ইনশাল্লাহ।

আমরা দৃঢ়তার সাথে সকলেই জানি যে, বিশ্বস্ত, আমানত রক্ষাকারী ও দীনদার বিদ্বানদের এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যারা ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহর দলীলের বিরোধীতা করেন। কেননা, যারা বিদ্যা ও ধার্মিকতার সাথে গুণান্বিত অবশ্যই তাদের আদর্শ হচ্ছে হক্ব। আর হক্বই যার আদর্শ হয়, অচিরেই আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য পথ সহজ করে দেবেন। তোমরা নিম্নের আয়াতটি শুনে থাকো। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر:١٧]

আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (সূরা আল-ক্বামার ৫৪:১৭)। তিনি আরো বলেন,

{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} [الليل: ٥, ٧]

যে দান করেছে এবং তাকওয়াহ অবলম্বন করেছে এবং উত্তম কে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করেছে (সূরা আল-লাইল ৯২:৫,৭)।

আল্লাহ বিধানাবলীর ব্যাপারে ঐ সকল ইমামগণের মতভেদে ভুল আলোচনা থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে ইতিপূর্বে বর্ণিত উছুলে ভুল থাকার সম্ভাবনা নেই। এ মতভেদের ভুল অবশ্যই দুর্বল বলেই গণ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুর্বল বলে গুণান্বিত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً}

মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে (সূরা আন-নিসা ৪:২৮)।

মূলত বিদ্যা-বুদ্ধি ও বোধগম্যতায় মানুষ দুর্বলই বটে। তাই জ্ঞানের পরিধি ও সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু বিষয়ে মানুষের ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিদ্বানগণের মাঝে ভুল সংঘটিত হওয়ার ছয়টি কারণ সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে আলোচনা করছি। যদিও বাস্তবে ভুল হওয়ার অনেক কারণ আছে।

প্রথম: মতভেদকারী যে (হুকুম) রায়ে ভুল করেছেন, ঐ ব্যাপারে তার নিকট কোন দলীলই পৌঁছেনি।

তবে এ বিষয়টি কেবল ছাহাবীগণের পরবর্তী যুগের বিদ্বানদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং ছাহাবীগণের মাঝেও এমনটা ঘটেছিল এবং তাদের পরবর্তীদের মাঝেও এটা ঘটেছে। এ প্রথম কারণ সংক্রান্ত ছাহাবীদের মাঝে ঘটে যাওয়া দু'টি বিষয় উদাহরণ হিসাবে আমরা নিম্নে পেশ করছি।

প্রথম উদাহরণ: ছ্বহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ থেকে আমরা জেনেছি যে, আমীরুল মুমিনিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন সিরিয়ায় ভ্রমণ করেন, তখন কতিপয় রাস্তায় মানুষের মাঝে মহামারি তথা প্লেগ রোগ শুরু হয়, তিনি থেমে গেলেন এবং মুহাজির ও আনছারদের ছাহাবীগণের সাথে তিনি পরামর্শ করতে

চাইলেন। এ বিষয়ে দু’টি রায়-সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের মাঝে মতভেদ শুরু হয়। তার মধ্যে অধিক অগ্রগণ্য মত ছিল যে, এ অবস্থায় ফিরে যাওয়াই ভাল হবে। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি এ মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে বললেন: আমার একটি বিষয় জানা আছে। আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

"إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه".

যদি এলাকায় মহামারীর কথা তোমরা শুনতে পাও, তবে তোমরা সামনে এগিয়ে যাবে না। আর যদি এলাকায় অবস্থানকালে মহামারী শুরু হয়েছে জানতে পারো তাহলে সেখান থেকে পলায়ন করো না।[১০৯]

ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, এ বিষয়ের হুকুম মুহাজির ও আনছার ছাহাবাগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। অতঃপর আব্দুর রহমান ইবনে আওফ এসে এ হাদীছ সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ: আলী ইবনে আবি ত্বালিব ও ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মনে করতেন যে, গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেলে ঐ মহিলা চারমাস দশদিন ইদ্দত অথবা বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত পালন করবে। আর চারমাস দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বাচ্চা প্রসব করলে ইদ্দতের সময় কম হবে না। আর অবশিষ্ট সময় ইদ্দত পালন করবে যতক্ষণ না চারমাস দশ দিন অতিবাহত হয়। আর বাচ্চা প্রসবের পূর্বে যদি চারমাস দশ দিন শেষ হয়ে যায়, তাহলে অবশিষ্ট ইদ্দত পালন করবে যতক্ষণ না সে বাচ্চা প্রসব করে।[১১০] কেননা, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] .

গর্ভধারীনীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত (সূরা আত-ত্বালাক্ব ৬৫:৪)।

তিনি আরো বলেন,

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] .

[১০৯] মুত্তাফাক আলাইহি হা/৫৭২৯, মুসলিম হা/২২১৯।
[১১০] মুত্তাফাক আলাইহি হা/৪৯০৯, মুসলিম হা/১৪৮৫।

আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যু বরণ করবে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে (সূরা আল-বাক্বারা ২: ২৩৪)।

আয়াতদ্বয়ের মাঝে আম (ব্যাপকতা) ও কোন এক দিক হতে খাছ (নির্দিষ্টতা) উভয়ের অর্থ নিহিত আছে। উভয়ের মাঝে সমতা মুলক পন্থা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে ঐ পদ্ধতি গ্রহণ করা যা উভয়কে একত্রিত করে। কেবল আলী ও ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য নয়। কেননা, এর উপর সুন্নাতের অগ্রাধিকার রয়েছে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, সুবাইয়াতা আসলামীয়ার স্বামীর মৃত্যুর পর তার কয়েক রাত নেফায হয়। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দেন।[১১১] এর অর্থ হচ্ছে যে, আমরা সূরা ত্বালাকের আয়াত গ্রহণ করবো, এ সূরাটি আন-নিসা আছ-ছুগরা নামে পরিচিত। আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণীতে ব্যাপকতার অর্থ নিহিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . [الطلاق: ٤]

গর্ভধারীনিদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত (সূরা আত-ত্বালাক্ব ৬৫:৪)।

আমি দৃঢ়ভাবে জানি যে, যদি এ হাদীছ আলী ও ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর কাছে পৌঁছতো, তাহলে তারা এ হাদীছটিকে অকাট্যভাবে গ্রহণ করতেন। আর তারা নিজেদের মতামত পেশ করতেন না।

দ্বিতীয় কারণঃ কোন রাবীর নিকট হাদীছ পৌঁছেছে কিন্তু তা বর্ণনা করার ব্যাপারে তিনি আস্থাবান ছিলেন না। আর তিনি মনে করতেন যে, এ হাদীছটি এর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য শক্তিশালী হাদীছের বিরোধী। তাই এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী হাদীছটিকে তিনি গ্রহণ করতেন।

এ ব্যাপারে আমরা আরো উদাহরণ পেশ করতে পারি যে, এ বিষয়টি কেবল ছাহাবীগণের পরবর্তীদের মাঝেই ঘটেনি। বরং ছাহাবীগণের নিজেদের মাঝেও এমনটা ঘটেছে। ফাতিমা বিনতে কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে তার স্বামী তিন ত্বালাক

[১১১] মুত্তাফাক আলাইহি: বুখারী হা/৪৯০৯, মুসলিম হা/১৪৮৫।

দেয়ার পর ইদ্দত পালন করা পর্যন্ত তার স্ত্রীর ভরণ পোষণ হিসেবে তার নিকট তার প্রতিনিধিকে যব দিয়ে পাঠালেন। কিন্তু তার স্ত্রী যব দেখে রাগান্বিত হলেন এবং তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তারা দু’জন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলো এবং ঐ মহিলা সম্পর্কে তার স্বামী নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অবগত করলে তিনি বলেন,

"لا نفقة لها ولا سكنى".

তোমার উপর তার কোন ভরণ পোষণ ও বাসস্থানের দায়িত্ব নেই।[১১২]

কেননা, সে তার স্ত্রীকে বাইন (চূড়ান্ত) তালাক্ব দিয়েছে। আর এ তালাক্বের কারণে তার স্বামীর উপর ভরণ পোষণ ও বাসস্থানের দায়িত্ব অর্পিত হবে না। তবে গর্ভবতী হলে ব্যয়-ভার বহন করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦] .

তারা গর্ভবতী হলে তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য তোমরা ব্যয় কর (সূরা আত-ত্বালাক্ব ৬৫:৬)।

বুঝা গেল, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) গুণাবলী ও ইলমের দিক থেকে কতই না উত্তম! এরপরও এ সুন্নাতটি তার নিকট অজ্ঞাত ছিল। এজন্য তিনি মনে করতেন যে, (বাইন ত্বালাক্ব প্রাপ্তা) স্ত্রীর ব্যয়-ভার স্বামীকেই বহন করতে হবে। আর ফাতিমা বর্ণিত হাদীছটি সন্দেহযুক্ত হওয়ায় তা বর্জন করা হয়েছে, তিনি হয়তো ভুলে গেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, কোন এক মহিলার কথায় কি আমরা আমাদের রবের কথা পরিত্যাগ করতে পারি? আমরা জানি না, তার কি স্বরণ আছে নাকি তিনি ভুলে গেছেন? এর অর্থ হচ্ছে, আমীরুল মুমিনিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ দলীলের উপর নির্ভর করতে পারেন নি। কথা হচ্ছে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ক্ষেত্রে এরূপ বিষয়ে যা ঘটেছিল তেমনই অন্যান্য ছাহাবীগণ এবং তাবেঈদের মাঝেও ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল। আর তাদের পরবর্তী তাবে-তাবেঈদের মাঝেও এরূপ বিষয়ের সূত্রপাত হয়। আমাদের যুগেও এমনটা ঘটে চলেছে, ক্বিয়ামত অবধি তা ঘটতে থাকবে। কারণ মানুষ সঠিক দলীল-প্রমাণের উপর আস্থাশীল নয়। আমরা বিদ্বানদের নিকট অনেক হাদীছের কথা শুনেছি, কতিপয় আলিম ঐ সব হাদীছ ছ্বহীহ বলে গ্রহণ করেন। আবার অন্যরা তা দ্বঈফ হিসেবে গ্রহণ করেন। রসূল

[১১২] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/১৪৮০, তিরমিযী হা/১১৩৫, ইবনে মাজাহ হা/২০৩৫।

ছা, হতে হাদীছ বর্ণিত হওয়ায় ঐ সব হাদীছের উপর নির্ভর যোগ্যতার ব্যাপারে তারা কোন পর্যালোচনা করে না।

তৃতীয় কারণঃ রাবীর নিকট হাদীছ পৌঁছেছে, কিন্তু তিনি তা ভুলে গেছেন। হাদীছটি যার স্বরণ ছিল তা বর্ণনা করতে তিনি শঙ্কাবোধ করেছেন। অনেকেই হাদীছ ভুলে যায়। এমনকি কুরআনের আয়াতও স্বরণ থাকে না।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একদিন তার ছাহাবীগণকে নিয়ে ছ্বলাত আদায় করছিলেন। একটি আয়াত তার স্বরণই হলো না। তার সাথে ছিলেন উবাই ইবনে কা‘ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। ছ্বলাত শেষে তিনি তাকে বললেন,

"هلا كنت ذكرتنيها".

তুমি ঐ আয়াতটি আমাকে স্বরণ করিয়ে দিতে পারলে না![১১৩]

অহী অবতীর্ণকারী এক সত্তা আল্লাহ তা‘আলা তাকে বলেন,

{سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى} [الأعلى:٦، ٧] .

আমি তোমাকে পড়িয়ে দেব তারপর তুমি ভুলবে না। আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন থাকে (সূরা আল আলা ৮৭:৬-৭)।

বুঝা গেল, এভাবে যে কোন কথা-ঘটনা জানার পর মানুষ তা ভুলে যায়। উমার ইবনে খাত্তাব ও আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর ঘটনা থেকে জানা যায়, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের দু’জনকে প্রয়োজনে কোন এক জায়গায় পাঠালেন, তখন তারা উভয়ে অপবিত্র হলেন। আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইজতেহাদ করে সিদ্ধান্তে উপনিত হলেন যে, মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের মতই। তিনি পবিত্র মাটিতে গড়াগড়ি করলেন যেমন জন্তু-জানোয়ার গড়াগড়ি করে। যাতে পানির মতই তার শরীরে মাটি লেগে যায়। তারপর তিনি ছ্বলাত আদায় করলেন। কিন্তু অপবিত্র অবস্থায় উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছ্বলাত আদায় করলেন না। তারপর তারা উভয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলেন। তিনি তাদেরকে এ সম্পর্কে সঠিক পন্থা বলে দেন। অতঃপর তিনি আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন,

[১১৩] ছ্বহীহঃ আবূ দাউদ হা/৯০৭।

"إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا"

তোমার জন্য দু’হাত দিয়ে এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল।[১১৪]

এ বলে তিনি তার দু’হাত একবার মাটিতে মারলেন এবং তার মুখ মন্ডল মাসাহ করলেন।

উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে এ হাদীছটি আম্মার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন। পূর্বের কাহিনী সূত্র উল্লেখ করে তিনি উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন, প্রয়োজনে আমরা কোন এক জায়গায় গিয়েছিলাম। অতঃপর আমরা উভয়ে অপবিত্র হই। কিন্তু (পানি না পাওয়ায়) আপনি ছ্বলাত আদায় করেননি। আমি পবিত্র মাটিতে গড়াগড়ি করে পবিত্র হই। এ ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"إنما كان يكفيك أن تقول كذا وكذا".

তোমার জন্য এরূপ এরূপভাবে (হাত মাটিতে মারা) যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ঐ ঘটনা স্বরণ করতে পারলেন না। তাই আম্মার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে তিনি বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করো। প্রতি উত্তরে আম্মার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন, আল্লাহ তা‘আলা আপনার প্রতি আমার যে আনুগত্য নির্ধারণ করেছেন আপনি চাইলে ঐ আনুগত্যর খাতিরে এ বিষয়ের হাদীছটি আমি বর্ণনা করবো না। অতঃপর উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তুমি যে দিকে প্রত্যাবর্তন করেছো আমি সে দিকেই প্রত্যাবর্তন করলাম। অর্থাৎ এ হাদীছটি তুমি মানুষের কাছে বর্ণনা করো। আসলে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ভুলে গিয়েছিলেন যে, (পানি না পাওয়া গেলে) অপবিত্র অবস্থায় তায়াম্মুম করার বিধান নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারিণ করেছেন। যেমনভাবে ছোট অপবিত্রতার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে হয়। এ বিষয়ে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর অনুসরণ করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবূ মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা এর মাঝে এ বিষয়ে বিতর্ক হয় উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রতি আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর কথা তুলে ধরে ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আপনি কি জানেন না যে, উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

---

[১১৪] মুত্তাফাক আলাইহিঃ বুখারী হা/৩৩৯, মুসলিম হা/৩৬৮।

আম্মার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কথায় সন্দেহ মুক্ত হতে পারেন নি। অতঃপর আবূ মূসা বললেন, আম্মারের কথা ছাড়েন। সূরা মায়িদার এ আয়াত সম্পর্কে আপনি কি বলেন। জবাবে ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কিছুই বললেন না। সন্দেহ নেই যে, যারা বলেন, (পানি না পাওয়া গেলে) তায়াম্মুম করতে হবে, তাদের কথাই সঠিক। যেমনভাবে ছোট অপবিত্রতার তায়াম্মুম করতে হয়। আর এখান থেকে উদ্দেশ্যে হচ্ছে যে, মানুষ কোন বিষয় কখনো ভুলে যায়, ফলে ঐ বিষয়ে শারঈ হুকুম (শরী‘আতের বিধান) তার অজানা থাকে। তাই সে এ অজ্ঞতার কারণে এমন কথা বলে যা আপত্তিকর। অথচ দলীলসহ জ্ঞানের কথায় কোন আপত্তি নেই।

চতুর্থ কারণ: কুরআন-সুন্নাহর উদ্দিষ্ট অর্থের বিপরীত বুঝা।

এ ক্ষেত্রে যথাক্রমে কুরআন ও সুন্নাহ হতে দু’টি উদাহরণ পেশ করছি। প্রথমটি কুরআন হতে, আর দ্বিতীয়টি সুন্নাহ হতে।

ক। কুরআন হতে উদাহরণ: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُمْ مِنَ الْغَائطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [النساء: ٤٣] .

যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব–পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম কর (সূরা আন-নিসা ৪:৪৩)।

{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} এ আয়াতাংশের অর্থ নিয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। তাদের কারো মত হলো এখানে সাধারণ স্পর্শ উদ্দেশ্যে। কারো মতে, কামোত্তজনাসহ স্পর্শ করা উদ্দেশ্যে। তাদের কারো মতে, স্ত্রীর সাথে মিলন করা উদ্দেশ্যে। এটি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মত। তবে আয়াতটি নিয়ে তুমি চিন্তা-গবেষণা করলে দেখতে পাবে যে, স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া এ অর্থটিই সঠিক-যথাযথ। কেননা, পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন এবং ছোট-বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা দু’টি শাখাগত প্রকার উল্লেখ করেছেন।

তাই ছোট অবিত্রতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] .

তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর) (সূরা আল-মায়িদা ৫:৬)।

বড় অপবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]

যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও (সূরা আল-মায়িদা ৫:৬)।

অলঙ্কারপূর্ণ কথা ও বর্ণনার চাহিদা অনুযায়ী তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে দু’ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক হয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}

তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে আসে।

এ আয়াতাংশ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ছোট অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জন আবশ্যক। অপরদিকে

{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করো।

এ আয়াতাংশের মাধ্যমে বড় অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

স্পর্শ করা বলতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া এ অর্থ নির্ধারণ করলে ছোট অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জন আবশ্যক-ওয়াজীব হতো। অথচ বড় অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জনের কথা উক্ত আয়াতে উল্লেখ নেই। আর (স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া) অর্থ গ্রহণ করলে তা হতো কুরআনের অলংঙ্কারপূর্ণ ভাষার বিপরীত। যারা মনে করেন, আয়াত উক্ত আয়াত দ্বারা সাধারণ স্পর্শ উদ্দেশ্যে তারা বলেন, স্বামী তার স্ত্রীর ত্বকে গোপ্তাঙ্গ স্পর্শ করালে অথবা কামোত্তজনাসহ স্পর্শ করলে উযূ নষ্ট হবে। আর কামনা-বাসনা না থাকলে উযূ নষ্ট হবে না। সঠিক কথা হলো দু’অবস্থায় অযূ নষ্ট হবে না

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّل إحدى نسائه، ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (উযূ অবস্থায়) তার কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন করার পর ছ্বলাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু তিনি পুনরায় উযূ করার প্রয়োজনবোধ করেননি।[১১৫]

খ। **সুন্নাহ হতে আরো উদাহরণ হচ্ছেঃ** নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আহযাবের যুদ্ধ হতে ফিরলেন এবং যুদ্ধের অস্ত্র রেখে দিলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এসে তাকে বললেন, আমরা অস্ত্র সমর্পণ করবো না। তারপর তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বনী কুরাইযার উদ্দেশ্যে বের হতে বললেন। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবীগণকে বের হওয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি বলেন,

"لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة".

বনী কুরাইযাহ এলাকায় পৌঁছার পূর্বে কেউ যেন আছর ছ্বলাত আদায় না করে।[১১৬]

এ হাদীছের অর্থ নিয়ে ছাহাবাগণের মাঝে মতোবিরোধ হয়েছে। তাদের কেউ মনে করেন যে, এখানে তাড়াতাড়ি বের হওয়াই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যে। যাতে বনী কুরাইযাহ এলাকায় পৌঁছেই আছরের ছ্বলাতের সময় হয়। অতঃপর রাস্তায় আছরের ছ্বলাতের সময় হলে তারা সেখানেই ছ্বলাত আদায় করে নিল। তারা ঐ এলাকায় পৌঁছার জন্য দেরিতে ছ্বলাত আদায় করেনি। ছাহাবীদের কেউ মনে করেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যে হলো বনী কুরাইযাহ এলাকায় পৌঁছার পর তারা ছ্বলাত আদায় করবে। যতক্ষণ না ঐ এলাকায় পৌঁছে ততক্ষণ ছ্বলাতে আদায়ের জন্য দেরি করবে।

এ দু'টি মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যারা ঠিক সময়ে আছরের ছ্বলাত আদায় করেছিলেন নিঃসন্দেহে তাদের মতই সঠিক বলে গণ্য। কেননা, বিধান হচ্ছে ঠিক সময়ে ছ্বলাত আদায় করা ফরয যা নছ (দলীল) দ্বারা প্রমাণিত। এটাই সাদৃশ্যপূর্ণ নছ। আর সাদৃশ্যপূর্ণ বিধান গ্রহণ করা ইলমের পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। মূলত আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যের বিপরীতে দলীল বুঝা মতভেদের কারণ। এটি হলো চতুর্থ কারণ।

---

[১১৫] ছ্বহীহঃ আবূ দাউদ হা/১৭৯, তিরমিযী হা/৮৬, ইবনে মাজাহ হা/৫০২

[১১৬] ছ্বহীহঃ বুখারী হা/৯৪৬, মুসলিম হা/১৭৭০।

পঞ্চম কারণ: রাবীর নিকট যে হাদীছ পৌঁছেছে তা মানসূখ (রহিত)। আর নাসিখ (রহিতকারী) বিধান সম্পর্কে তিনি জানতেন না।

দেখা যায়, হাদীছ ছ্বহীহ এবং হাদীছের উদ্দিষ্ট অর্থ বোধগম্য। কিন্তু তা মানসূখ (রহিত)। আলিম যদি ঐ হাদীছের নসখ (রহিতকরণ) সম্পর্কে না জেনে থাকেন তাহলে এ অবস্থা তার জন্য আপত্তিকর বলে গণ্য হবে। আর মৌলিক বিষয় হচ্ছে যে, নাসিখ (রহিতকারী) বিধান সম্পর্কে না জেনে নসখ বুঝা যায় না।

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর একটি মত হচ্ছে, রুকু করা অবস্থায় ছ্বলাত আদায়কারী তার দু'হাত কি করবে তথা কোথায় রাখবে? এ ব্যাপারে জানা যায়, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে রুকু করা অবস্থায় দু'হাতের মাঝে সমন্বয় সাধন করা এবং দু'হাত হাঁটুর উপর রাখা শরী'আত সম্মত ছিল। অতঃপর এ বিধান মানসূখ হওয়ার পর কেবল হাঁটুর উপর হাত রাখাই শরী'আত সম্মত বলে গণ্য হয়। এ মানসূখ হওয়ার বিষয়টি ছ্বহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে প্রমাণিত। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ নসখ (রহিত হওয়া) সম্পর্কে জানতেন না। তাই দু'হাতের মাঝে তিনি সমন্বয় সাধন করতেন। আলক্বামা ও আসওয়াদ (রাহিমাহুমাল্লাহ) উভয়ে তার সাথে ছ্বলাত আদায় করেন। তারা তাদের হাত হাঁটুর উপর রাখেন। কিন্তু ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে এভাবে হাত রাখতে নিষেধ করেন। আর তিনি দু'হাতের মাঝে সমন্বয় করে রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু কেন? কারণ তিনি এ বিষয়ে নসখ সম্পর্কে জানতেন না। আর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার সাধ্যতীত দায়িত্ব দেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: ٢٨٦] .

আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের

রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন (সূরা আল-বাক্বারা ২:২৮৬)।

ষষ্ঠ কারণ: এটা বিশ্বাস করা যে, এটি অধিক শক্তিশালী নছ (দলীল) অথবা ইজমা বিরোধী দলীল।

প্রকৃত অর্থে দলীলটি কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্য প্রযোজ্য হবে। কিন্তু মনে করা হয় যে, ঐ দলীলটি অধিক শক্তিশালী নছ (দলীল) অথবা ইজমা বিরোধী বলে গণ্য। ইমামদের মতভেদে অনেকাংশে এটাই ঘটে। আমরা অধিকাংশই শুনে থাকি যে, যারা ইজমার বর্ণনা করে তাদের চিন্তা-গবেষণায় তা ইজমা বলে গণ্য হয় না। ইজমা সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে ঐ ব্যাপারে যারা উৎসাহ দেয় তাদের কতিপয় বলেন, দাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ছাহাবীদের ইজমা হয়েছে। আবার কতিপয় বলেন, দাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। এটাই বর্ণনার দুর্বোধ্যতার অন্তর্ভূক্ত বিষয়। ঐ সকল উৎসাহদানকারীদের পাশে লোকজন সমবেত হলে তারা রায় (সিদ্ধান্তের) উপর ঐকমত্য পোষণ করে। আর এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তাদের বিরোধীতা করা যাবে না। কারণ এক্ষেত্রে বিশ্বাস থাকে যে, ঐ বর্ণনা নছ (দলীলেরই) অনূকুলে হয়েছে। অতঃপর ঐ উৎসাহদানকারী একত্রে দু’টি দলীল ধারণায় বদ্ধমূল করে নেয় তা হচ্ছে ইজমা ও নছ (দলীল)। কখনো সে মনে করে, ঐ বর্ণনা ছ্বহীহ ক্বিয়াসের অনূকুলে হয়েছে। তাই এ ধরনের ছ্বহীহর দৃষ্টিকোণ থেকে সে ফায়ছালা দেয় যে, এ বর্ণনার বিরোধীতা করা যাবে না। তার নিকটে ছ্বহীহ ক্বিয়াসের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিষ্ঠিত নছের (দলীলের) কোন বৈপরীত্য নেই। অথচ বিষয়টি এর বিপরীত।

রিবাল ফাযলের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর রায় (সিদ্ধান্ত) সম্পর্কিত আমরা একটি উদাহরণ পেশ করছি, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত। তিনি বলেন,

"إنما الربا في النسيئة".

ধার-কর্জের ক্ষেত্রেই কেবল (কম-বেশি করলে) সুদ হয়।[১১৭]

উবাদাহ ইবনে ছামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত,

"أن الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة ".

ধার-কর্জের ক্ষেত্রেই কেবল (কম-বেশি) এবয় কোন কিছুতে অতিরিক্ত করলে সুদ হয়।[১১৮]

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর পর আলিমগণের ইজমা হয়েছে যে, সুদ দু'প্রকার : ربا فضل (অতিরিক্ত সুদ) ও ربا نسيئة

(কর্জগত সুদ)। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কেবল কর্জগত সুদ ছাড়া ربا فضل (অতিরিক্ত সুদ) এর প্রকারকে অস্বীকার করেন। উদাহরণ স্বরূপ যদি এক ছা‘আ গম দু'ছা‘আ গমের বিনিময়ে নগদে বিক্রয় করো তাহলে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, তিনি মনে করতেন, কেবল ধার-কর্জেই (কম-বেশিতে) সুদ হয়। অনুরূপভাবে তার মতে, যদি এক মিছকাল স্বর্ণ দু' মিছকালের বিনিময়ে নগদে বিক্রয় করো তাহলে এতেও কোন সুদ নেই। যদি তুমি সময় নির্ধারণ করো তাহলে আমাকে এক মিছক্বাল স্বর্ণই দিবে এর বিনিময়ে আমি তোমাকে কোন কিছু দিবো না। এ পরিমাণের মাঝে কম-বেশি করলে তা হবে সুদ। কেননা, ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) মনে করতেন, কোন কিছু আদান-প্রদানের ব্যাপারে সময় নির্ধারণ করলে তা সুদ ধার্য হওয়ার অন্তরায় বলে গণ্য। আর জ্ঞাতব্য যে, "إنما"

পদটি সীমাবদ্ধতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই বুঝা যায় যে, সময় নির্ধারণ সুদ হয় না। কিন্তু উবাদা ইবনে ছামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছ হতে প্রমাণিত হয় যে, আদান-প্রদানে অতিরিক্ততা সুদের অন্তর্ভুক্ত। এ মর্মে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

[১১৭] মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৭৮, মুসলিম হা/১৫৯৬
[১১৮] মুসলিম হা/১৫৮৭, আবূ দাউদ হা/ ৩৩৪৯, তিরমিযী হা/১২৪০।

"من زاد أو استزاد فقد أربى".

যে অতিরিক্ত দিলো অথবা চাইলো সে সুদের আদান-প্রদান করলো।[১১৯]

ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীছ হতে যা প্রমাণিত হয় সে ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কেমন হবে? জবাব হচ্ছে অন্য হাদীছ হতে প্রমাণিত হয় যে, আদান-প্রদানে অতিরিক্ততা সুদ। এ হাদীছের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে তা গ্রহণ করাই হবে আমাদের অবস্থান। আমরা এভাবে বলতে পারি যে, প্রকৃত সুদ সেটাই যার উপর জাহেলী যুগের লোকেরা নির্ভর করতো। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٣٠].

হে মুমিনগণ, তোমরা সূদ খাবে না বহুগুণ বৃদ্ধি করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও (সূরা আলে ইমরান ৩:১৩০)।

বুঝা গেল এটা কর্জগত সুদ।

সপ্তম কারণ: আলিমের দ্বঈফ হাদীছ গ্রহণ করা অথবা দ্বঈফ হাদীছের মাধ্যমে দলীল পেশ করা।

এ কারণটিই খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়। দ্বঈফ হাদীছের মাধ্যমে দলীল পেশ করার অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন কতিপয় আলিম ছ্বলাতুত তাসবিহ আদায় করা ভাল মনে করে মতামত পেশ করেছন।

সংক্ষিপ্ত কথায় ছ্বলাতুত তাসবিহ হচ্ছে দু'রাক'আত ছ্বলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করত রুকু-সিজদায় পণেরবার করে তাসবিহ পাঠ করা। এ ধরনের ছ্বলাত আদায় করা আমি ঠিক মনে করি না। কেননা, শরী'আতের দৃষ্টিকোন থেকে তা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য আমল নয়। আবার কেউ মনে করেন, ছ্বলাতুত তাসবিহ হলো গর্হিত বিদ'আত। এ ব্যাপারে ছ্বহীহ হাদীছের বর্ণনা নেই। ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) মনে করেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এ ব্যাপারে ছ্বহীহ সূত্রে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছটির মাধ্যমে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

[১১৯] ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ।

উপর মিথ্যারোপ প্রমাণিত হয়। বাস্তবে হাদীছটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে তা شاذ (বিরল-অপ্রচলিত) হিসাবে প্রমাণিত হবে। শরী'আতের দিকে ঐ আমলের সম্বন্ধ এভাবে করা হয় যে, ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক উপকার সাধন হয়। আর এ ধরনের আমলের মাধ্যমে অন্তরের পরিশুদ্ধতা অর্জন আবশ্যক হয়। তাই সর্বদা ঐ আমল শরী'আত সম্মত। অপর দিকে কোন আমলের মাধ্যমে উপকৃত না হলে তা শরী'আত সম্মত নয়। এ কারণে ছ্বলাতুত তাসবিহ সম্পর্কিত হাদীছের বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ প্রতিদিন অথবা প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতি মাসে অথবা জীবনে একবার এ ছ্বলাত আদায়ে অভ্যস্ত। অথচ শরী'আতে এ ধরনের আমলের কোন দৃষ্টান্তই নেই।

সুতরাং সনদ ও মতনের দিক হতে হাদীছটি شاذ (বিরল-অপ্রচলিত) হিসাবে প্রমাণিত। যারা হাদীছটিকে জাল-মিথ্যা বলেন, তাদের মধ্যে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) অন্যতম। তিনি বলেন, ইমামদের কেউ এ ছ্বলাত সম্পর্কিত হাদীছের উপর আমল করা পছন্দ করেননি। এ ছ্বলাত আদায়ের ব্যাপারে অনেক নারী-পুরুষের প্রশ্নের জবাবে (এর বৈধতা সম্পর্কে) উক্ত দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়। তাই এ বিদ'আতী আমল শরী'আতের নামে প্রচলনের আশঙ্কা থাকে। যদিও কতিপয় মানুষের নিকট বিষয়টি অসহনীয় তবুও আমি বলি, এটা বিদ'আত। কেননা, প্রত্যেক এমন বিষয় যা আমরা বিশ্বাস করি অথচ তা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে নেই সেটাই হলো বিদ'আত। অনুরূপভাবে দ্বঈফ দলীলকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করলে সেটাও হবে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দলীল শক্তিশালী কিন্তু এর মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করা দ্বঈফ। যেমন কতিপয় আলিম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণিত নিম্নের হাদীছটি দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"ذكاة الجنين ذكاة أمه"

পশুকে যাবাহ করাই তার পেটের বাচ্চার যাবাহের জন্য যথেষ্ট।[১২০]

বিদ্বানদের নিকট হাদীছের জ্ঞাতব্য অর্থ হচ্ছে, পশুকে যাবাহ করা হলে ঐ যাবাহ তার বাচ্চার যাবাহের জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ পশু যাবাহের পর পেট হতে বাচ্চা বের

---

[১২০] ছ্বহীহঃ আবূ দাঊদ হা/২৮২৭, তিরমিযী হা/১৪৭৬, ইবনে মাজাহ হা/৩১৯৯।

হলে পুনরায় বাচ্চা যাবাহের প্রয়োজন নেই। কেননা, বাচ্চা কখনো মৃত অবস্থায় বের হয়, তাই ঐ বাচ্চা যাবাহ করাতে কোন উপকারীতা নেই।

আলিমদের কতিপয়ের মতামত হলো এ হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে বাচ্চার যাবাহ তার মায়ের যাবাহের মতই। আর দু’টি শাহরগ ও রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে যাবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে এটি অবাস্তব। মৃত্যুর পর রক্ত প্রবাহিত করা অসম্ভব। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل".

যে (হালাল প্রাণীর) রক্ত প্রবাহিত হয়েছে এবং যাবাহের সময় ঐ প্রাণীর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা ভক্ষণ করো।[১২১]

জ্ঞাতব্য যে, প্রাণীর মৃত্যুর পর রক্ত প্রবাহিত করা সম্ভব নয়। এ ধরনের অনেক কারণ রয়েছে যে ব্যাপারে সতর্ক করতে আমি পছন্দ করেছি। এ বিষয়ে ব্যাপকতর আলোচনা রয়েছে যা বিস্তারিত বর্ণনা অসম্ভব। কিন্তু এসব বিষয়ে আমাদের অবস্থান কি? প্রথম বিষয়ে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে শুনে, পড়ে এবং দেখে মানুষ সর্বশেষ পর্যায় এসে থেমেছে। এসব ব্যবস্থাপনায় আলিম অথবা কালাম শাস্ত্র বিদদের মতভেদের কারণে মানুষ সন্দেহের জালে আবদ্ধ হয়েছে। একারণে তারা বলে, আমরা কার অনুসরণ করবো?

কথায় বলে, বনে-জঙ্গলে অনেক হরিণ রয়েছে, কে জানে, কোনটি শিকার করতে হবে। আসলে এ দোদুল্যমান অবস্থায় আমাদের অবস্থান সম্পর্কে আমরা বলবো যে, আমরা জানি যে, যেসকল আলিমের মাঝে মতভেদে রয়েছে, তারা ইলম ও আল্লাহভীরুতার দিক থেকে বিশ্বস্ত। তাদের বিদ্যা-বুদ্ধির উপর ভিত্তি করা যাবে না এবং তারা আহলে ইলমের (বিদ্বানদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে আমরা ঐ সকল আলিমের উপদেশ গ্রহণ করবো না এবং আহলে ইলমদের (বিদ্বানদের) কথা বাদ দিয়ে তাদের কথাকে গুরুত্ব দিবো না। কিন্তু যে সকল আলিম জাতি, ইসলাম এবং বিদ্যার আলো ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে হিতাকাঙ্খী বলে পরিচিত, তাদের ব্যাপারে দু’টি দিক থেকে আমাদের অবস্থান নির্ধারিত হবে।

(ক) কিভাবে ঐ সকল ইমাম-আলিম আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহর বিপরীতে মতভেদ করলেন?

---

[১২১] মুত্তাফাকুন আলাইহিঃ বুখারী হা/৫৪৯৮, মুসলিম হা/ ১৯৬৮।

মতভেদের কারণ সমূহের আলোচনায় আমরা যা উল্লেখ করেছি, সেখান থেকে এ প্রশ্নের জবাব জেনে নেয়া সম্ভব। আর যা উল্লেখ করা হয় নি তা অনেক শিক্ষার্থীই জানে, যদিও শিক্ষার্থী গভীর জ্ঞানী নয়।

(খ) তাদের অনুসরণের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কি? ঐ সকল আলিমের মধ্যে আমরা কার অনুসরণ করবো ? মানুষ কি কোন একজন ইমামের অনুসরণ করবে যে তার কথার বিরোধীতা করবে না; যদিও তার কথার চেয়ে অন্যের কথার সঠিক হয়। যেমন মাযহাবের পক্ষপাতিত্বকারীদের অভ্যাস। সঠিক দলীল পেলে মানুষ কি তার অনুসরণ করবে যদিও তা ঐ সকল মাযহাবী ইমামগণের মতের বিরোধী হয়?

এ দ্বিতীয় বিষয়ের জবাব হচ্ছে, যে দলীল জানবে সে ঐ দলীলেরই অনুসরণ করবে। যদিও তা ইমামগণের মত বিরোধী হয় এবং উম্মতের ইজমা বিরোধী না হয়। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ ছাড়া কোন আদর্শই নেই, সর্বক্ষেত্রে সর্বদা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কর্মগত আদর্শ গ্রহণ এবং তার নিষেধ বর্জন করা তার উপর ওয়াজীব-আবশ্যক। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য রসূলগনের সাক্ষ্য দিয়েছেন, যা তার রিসালাতের বৈশিষ্ট্য। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফায়ছালা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেককেই তার আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। তাই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ ব্যতীত সব কিছুই বর্জনীয়।

অনুসরণের ক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণার বিষয় আছে, দলীল-প্রমাণ হতে যারা বিধান সাব্যস্ত করতে সক্ষম আমরা কি সদা তাদের থেকে দূরে থাকবো? এটি একটি জটিল বিষয়। কেননা, প্রত্যেকেরই দাবী আমরা সঠিক। প্রকৃতপক্ষে এটা ভাল নয়। তবে হ্যাঁ উদ্দেশ্যে ও মৌলিকত্বের দিক হতে উত্তম পন্থা হচ্ছে, মানুষ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহরই অনুসরণ করবে।

যারা দলীল নিয়ে কথা বলতে জানে আমরাই তাদের পথ সুগম করে দিয়েছি, যদিও তারা বাস্তবে ঐ দলীলের অর্থ ও উদ্দেশ্যে সম্পর্কে অবগত নয়। আমরা তাদেরকে বলি, যা কিছু বলেন সে ব্যাপারে আপনারা মুজতাহিদ। এভাবেই মূলত শরী'আত, সৃষ্টি ও সমাজের মাঝে ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

এ বিষয়ের দিক থেকে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(ক) এমন আলিম আল্লাহ তা‘আলা যাকে ইলম-বিদ্যা ও বুঝ দান করেছেন।

(খ) এমন শিক্ষার্থী যে জ্ঞানী তবে জ্ঞানের পরিপক্বতা তার অর্জন হয়নি।

(গ) জনসাধারণ যারা কিছুই জানে না।

প্রথম শ্রেণীর আলোচনা: গভীর জ্ঞানী আলিমদের উচিত যে, কোন বিষয়ে ইজতেহাদ করে কথা বলা। মানুষ তার মতের বিরোধীতা করলেও দলীল অনুযায়ী কথা বলা ওয়াজীব-আবশ্যক। আর এটাই নির্দেশিত বিষয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء، الآية: ٨٣]

তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা তা উদ্ভাবন করে তারা তা জানত (সূরা নিসা ৪:৮৩)।

এ আয়াত হতে মাসআলা উদ্ভাবনকারী আলিম সম্পর্কে জানা যায়। আল্লাহ ও তার রসূলের সুন্নাহ হতে যা প্রমাণিত হয় তারা ঐ ব্যাপারে অবগত।

দ্বিতীয় শ্রেণী: আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞান দান করেছেন। তবে জ্ঞানের প্রথম স্তরে (পরিপক্বতায়) তারা পৌঁছেনি। সাধারণ বিষয় এবং যা সে জানে ঐ ব্যাপারে কথা বলা তার জন্য সমস্যা নেই। তবে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা তার উপর আবশ্যক। তার উপরের স্তরের বিদ্বানদের প্রশ্নকে সে কাট-ছাট করবে না। কেননা, সে এতে ভুল করবে এবং তার বিদ্যার সল্পতার কারণে হয়তো এমন বিষয়কে নির্দিষ্ট করবে যা ছিল আম (সাধারণ) অথবা সাধারণ বিষয়কে সীমাবদ্ধ করবে কিংবা যা বিধান মনে করা হয় তা রহিত করবে। অথচ এসব বিষয়ে সে জানেই না।

তৃতীয় শ্রেণী: তারা এমন মানুষ যাদের কোন জ্ঞানই নেই। এসব লোক জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: ٧]

তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৭)।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} [النحل: ٤٣، ٤٤]

যদি তোমরা না জান (যা তাদের নিকট প্রেরণ করেছি) স্পষ্ট প্রমাণাদি ও কিতাবসমূহ (সূরা আন-নাহল ১৬:৪৩-৪৪)।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যারা জানে না জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়াই তাদের দায়িত্ব। কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করা হবে? দেশে অধিক সংখ্যক আলিম আছেন। প্রত্যেকেই নিজেকে আলিম দাবি করে অথবা প্রত্যেকেই আলিম বলে পরিচিত। তাহলে কাকে জিজ্ঞেস করা হবে? এ অবস্থায় আমরা কি বলবো যে, যারা সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী তাদের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক; যাতে তার কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া যায়? নাকি বলবো, বিদ্বানদের মধ্যে যাকে ভাল মনে করো তার নিকট জেনে নাও। কখনো নির্দিষ্ট মাসআলায় আমলের ক্ষেত্রে (আলিমকে) যথাযোগ্য উত্তম-মর্যাদাবান মনে করা হয়। আর তার চেয়ে কেউ উত্তম অথবা অধিক জ্ঞানী আছে কি না তা বিবেচনা করা হয় না, এ বিষয়েও বিদ্বানদের মাঝে মতভেদ নেই কি?

আলিমদের কেউ মনে করেন, দেশে যে আলিম আমলের দিক হতে বিশ্বস্ত তার কাছ থেকেই জেনে নেয়া জনসাধারণের উপর ওয়াজীব-আবশ্যক। যেমন রোগ হলে চিকিৎসা শাস্ত্রে যে অধিক জ্ঞাত মানুষ আরোগ্য লাভের জন্য ঐ চিকিৎসকেরই শরণাপন্ন হয়। অনুরূপভাবে এখানে ইলম-বিদ্যা হচ্ছে মানুষের অন্তরের রোগ-ব্যধির ঔষধ স্বরূপ। তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য যেমন তুমি অধিকজ্ঞাত-শক্তিশালী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হও তেমনই আলিমদের মাঝে যে ইলমের দিক হতে অধিক বিশ্বস্ত তারই নিকট জেনে নেয়া তোমার উপর ওয়াজীব-আবশ্যক। এতে কোন পার্থক্য থাকবে না।

আবার তাদের কেউ মনে করেন, এটা ওয়াজীব নয়। কেননা, কেউ ইলমের দিক হতে শক্তিশালী বটে তবে কখনো তিনি বাস্তবে সব মাসআলায় অধিকজ্ঞাত নন। উত্তম ব্যক্তি বর্গ থাকা সত্ত্বেও ছাহাবীদের যুগে লোকেরা মাফযূল (অধিক মর্যাদাবান) ব্যক্তিদের নিকট থেকে জেনে নিতো।

এ বিষয়ে যারা মনে করেন যে, দীনদারি ও ইলমের দিক থেকে যাকে উত্তম মনে করা হয় তার নিকট থেকেই জেনে নিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কোন আবশ্যকীয়তা নেই। কেননা, যিনি উত্তম তিনি কোন নির্দিষ্ট মাসআলায় কখনো ভুল করতে পারেন। আর যিনি জ্ঞানে মর্যাবান তিনি কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন।

তৃতীয় রিসালাহ (বার্তা):

দলবদ্ধ হয়ে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব এবং তদনুযায়ী আমলের ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহয় দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} [فاطر: ٢٩]

নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, ছ্বলাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযিক দিয়েছেন তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না *(সূরা ফাতির ৩৫:২৯)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ} [فاطر: ٣٠]

যাতে তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, মহান গুণগ্রাহী *(সূরা ফাতির ৩৫:৩০)*।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"خيركم من تعلم القرآن وعلمه"

তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।[১২২]

আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران".

কুরআনের পাঠক লিপিকর সম্মানিত মালাকের মত। খুব কষ্টদায়ক হওয়া সত্ত্বেও যে বারবার কুরআন পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।[১২৩]

আবূ মূসা আশআ‘রী হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন,

"مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب، وريحها طيب، ومثل الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب، ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب، ولا طعم لها ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها".

কুরআন পাঠকারী মুমিনের দৃষ্টান্ত কমলার মত, যার ঘ্রাণও চমৎকার স্বাদও মজাদার। যে মুমিন কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের মত যার কোন সুঘ্রাণ নেই তবে এর স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে এর তার উদাহরণ রায়হানার মত, যার সুঘাণ আছে তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না, তার উদাহরণ হনযালা ফলের ন্যায়, যার সুঘ্রাণও নেই স্বাদ তিক্ত।[১২৪]

আবূ উমামাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

---

[১২২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০২৭, ৫০২৮, আবূ দাউদ হা/১৪৫২, তিরমীযি হা/ ২৯০৭।
[১২৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৯৩৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৯৮।
[১২৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৪২৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৯৮।

"اقرءوا القرآن، فإنه يأتي شافعًا لأصحابه، اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما".

তোমরা কুরআন পাঠ করো। কারণ ক্বিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফাআ‘তকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দু’টি উজ্জ্বল সূরা অর্থাৎ আল-বাক্বারাহ ও আলে ইমরান পড়। ক্বিয়ামতের দিন এ দু’টি সূরা এমনভাবে আসবে যেন তা দু’খন্ড মেঘ অথবা দু’টি ছায়াদানকারী অথবা দু’ঝাক উড়ন্ত পাখি যা তার পাঠকারীর পক্ষ হয়ে কথা বলবে।[১২৫]

কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ক্ষেত্র থাকলে আমাদের দেশসহ অন্য দেশের অনেক যুবকই কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে ইসলামী ওয়াকফ দাওয়াত ও ইরশাদ মন্ত্রনালয়ের তত্ত্বাবধানে সম্মানের সাথে আমাদের দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে ‘জামাআ‘তু তাহফিযিল কুরআন’ দল ছড়িয়ে পড়বে। আল-হামদুলিল্লাহ যুব সম্প্রদায় একাজে এগিয়ে এসেছে। আর শুধু পুরুষদের ক্ষেত্রেই এ তৎপরতা সীমাবদ্ধ নয় বরং নারীও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে অনেক কল্যাণ লাভ করে চলেছে। তারা ঐ যুব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কুরআন হিফয করছে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। আমি ঐ সব ভাইদের উৎসাহিত করবো যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা সন্তানাদী দান করেছেন। তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে এ দলের সাথে সম্পৃক্ত করেন। আর তাদের এ দলের সাথে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করবেন। এব্যাপারে তাদের অবস্থা তদারকি করবেন, এ দলের অনুসরণের জন্য তাদের দায়িত্বশীলদের সাথে মিলিত করণে সহযোগিতা করবেন। আল্লাহর কিতাব কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুদ্ধতা লাভ হয়। আর দুনিয়ায় সন্তানের সংশোধন হওয়া পিতার জন্য উভয়েকালে কল্যাণকর। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

[১২৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ৮০৪, আবূ দাউদ হা/ ২৮৮২।

মানুষ মারা গেলে সব আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি আমল ব্যতিত। ছাদাক্বাহ জারিয়াহ অথবা উপকারী ইলম-বিদ্যা অথবা এমন সৎ সন্তান যে তার পিতা-মাতার জন্য দু‘আ করে।[১২৬]

সন্দেহ নেই যে, ‘জামাআ‘তু তাহফিযিল কুরআন’ দলের সাথে সম্পৃক্ত হলে কল্যাণ লাভ হবে এবং বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা নিরসন হবে। এ দলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে কুরআন মুখস্থ করণ লাভ এবং এর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এর কারণে আল্লাহর ঘর মসজিদের সাথে তিলাওয়াতকারীর সম্পর্ক তৈরি হয়। এ মহৎ উদ্দেশ্যের মাধ্যমে সময় ব্যয়ের ফললাভ হয়। পিতা-মাতা অথবা অন্যান্য অভিবাবক আত্মীয় স্বজন তিলাওয়াতকারী শিক্ষার্থীকে তত্ত্বাবধানের কারণে পূণ্যতা লাভ করে।

আল্লাহর কিতাব তার ঘরে তিলাওয়াতের কারণে ঐ ঘরে সমবেত সকলের ছাওয়াব অর্জন হয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা নিয়ে আলোচনা করে, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, তাদেরকে রহমত ঢেকে নেয়, ফিরিস্তাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তার নিকটবর্তী ফিরিস্তাদের কাছে তাদের প্রশংসা করেন।[১২৭] যেমনভাবে এর মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন হয় তেমনি বিশৃঙ্খলাও দূরভিত হয়। এর মাধ্যমে সময়ের অপচয় রোধ হয় যা সম্পদ অপচয়ের চেয়ে বেশি মারাত্মক। কেননা, সম্পদ বিনষ্ট হলে তা অর্জন করা যায় কিন্তু সময় নষ্ট হলে তা ফিরে পাওয়া যায় না। কারণ সময় প্রবাহমান যা ফিরে আসে না। যেমনঃ বলা হয়,

أمس الدابر لا يعود.

গতকল্য ফিরবার নয়।

এর মাধ্যমে সব ধরনের অবসরতা দূর হয় ও বিশৃঙ্খলা নিরসন হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে: যৌবন কাল, অবসর সময় ও বৃদ্ধ বয়স ব্যক্তির জন্য ফাসাদ স্বরূপ। অবসরের ফাসাদ হচ্ছে যৌবন কাল ক্ষতির মধ্যে দিয়ে হারিয়ে অথচ তার গুরুত্ব দেয়া হয় না। আর এ অবসর কখনো ধ্বংসের কারণ হয়। হাট-বাজারে অহেতুক

---

[১২৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৯৯, তিরমিযী হা/২৯৪৫।
[১২৭] আবূ দাউদ হা/১৪৫৫।

ঘোরাফেরা করে অবসর সময় নষ্ট হয় এটাও অবসরের ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা। কখনো এ কারণে চরিত্রও নষ্ট হয়।

আর অবসরে অহেতুক শারীরিক অবসন্নতার কারণে আত্মিক ক্ষতি সাধন হয়। ফলে অন্তর হয় নির্বোধ। ফলে যুবকরা হয় উশৃঙ্খল তাদের কোন গভীর চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন থাকে না। তাদের অন্তরে নরম মেজাজে থাকে না। আমি ঐসব ভাইদেরকে উৎসাহিত করবো যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন। তারা যেন তাদের সম্পদ ব্যয় করে বদান্যতা বজায় রাখেন যা আল্লাহ তা'আলা তাদের দিয়েছেন তা হতে। কেননা, এ দলের পিছনে সম্পদ ব্যয় করা উত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত। ব্যয়ে অংশ গ্রহণের কারণে এ দানকারী আমলদার ব্যক্তির জন্য প্রতিদান নিহিত আছে। কেননা, জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহকারীর ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا".

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর আসবাব পত্র সরবরাহ করলো সে যেন জিহাদ করলো।[১২৮]

এমনিভাবে আমি সকল মুসলিম ভাইকে এ দলের প্রতি অর্থগত ও সম্পদ ব্যয়ের দিক হতে সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিবো। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢] .

সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করো *(সূরা আল-মায়িদা ৫:২)।*

আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি, কথা ও কর্মে আমাদের সকলকে যেন তিনি এ কাজে কবুল করে নেন। তিনি যেন আমাদেরকে তার রহমত দান করেন। তিনিই প্রকৃত দাতা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৎকাজে তার নিআ'মতের পূর্ণতা দান করেছেন। আর দরূদ বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার পরিবারবর্গের উপর, তার ছাহাবীগণের উপর এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত যারা উত্তমরূপে তার অনুসরণ করে তাদের উপর।

---

[১২৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৪৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ১৮৯০।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৫. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৬. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৭. কিতাবুল ঈমান

- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৮. কিতাবুত তাওহীদ

- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৯. কিতাবুত তাওহীদ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১০. আক্বীদাতুত তাওহীদ

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১১. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১২. আল ওয়াছ্বিইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১৩. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

১৪. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১৫. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৬. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা‘ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৭. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৮. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৯. নাবী-রসূলগণের দা‘ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২০. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২১. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২২. খিলাফাত ও বায়‘আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৪. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ ‘ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২৫. ‘আল ওয়ালা’ ওয়াল ‘বারা’ [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৬. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ্ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৭. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৮. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ্ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩০. মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩১. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৩২. যাকাত ও দান খয়রাত

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩৩. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবয়্যিাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩৪. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

৩৫. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

৩৬. আস-সিয়াসাহ আশ-শার‘ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

-সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৭. এক নজরে ছ্বলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩৮. ছিয়াম ও রমাদ্বান- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩৯. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকাহ

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪০. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৪১. নতুন চাঁদের বিতর্ক সমাধান

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৪২. উসূলুস সুন্নাহ -

-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪৩. লুম'আতুল ই'তিক্বদ

-ইবনে ক্বুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৪৪. 'ইতিক্বদ আইয়াম্মাতিল হাদীছ- আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৪৫. শারহুস সুন্নাহ

-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]